অঘটন আজো ঘটে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সুরকাব্য সংসদ
১৯, জওহরলাল নেহেরু রোড
কলিকাতা-১৩

প্রকাশক :
শ্রীমিলন সেন
স্বরকাব্য সংসদ
১৯, জওহরলাল নেহেরু রোড,
কলিকাতা-৭০০০১৩

শ্রাবণ, ১৩৭০

পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ সিংহ
পাবলিসিটি প্রিণ্টার্স
৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীকালিপদ গুহরায

প্রেমিক যোগিবরেষু

সাধনায় কেউ পায় জ্ঞান, কেউ প্রতিষ্ঠা, কেউ ভক্তি,
আরো কত কী—যা অপরে পাবে না জানতে।
আমরা কিন্তু জেনেছি যে, তুমি পেয়েছ প্রেমের শক্তি,
পরকে আপন ক'রে নিয়ে কাছে টানতে।

দিয়েছ শান্তি হে গুপ্তযোগী, কত অশান্ত পান্থে
মুক্তির দিশা-দেখায়ে তোমার জীবনের দৃষ্টান্তে

হরিকৃষ্ণ মন্দির
ইন্দিরানিলয
পুনা-৫

স্নেহ-ঋণী
দিলীপ
১৪ই জুলাই ১৯৫৫

অঘটন

আজো ঘটে

ভূমিকা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: সাধনা সম্বন্ধে তিনি শুনেছিলেন একরকম, করতে গিয়ে দেখলেন অন্যরকম। শোনা-কথা ও চোখে-দেখার মধ্যে এই চিরন্তন প্রভেদকে উপজীব্য ক'রে আমার ক্ষুদ্র গ্রন্থে সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি সাধনা সম্বন্ধে কিছু অন্তরঙ্গ কাহিনী যথাসম্ভব সরল ভাষায়—গুরুগম্ভীর গমকে নয়।

কোনো কোনো সাধক বলেন—গুহ্য কথা গুহ্য রাখাই ভালো, অসাধকদের কাছে এসব কথা পেশ করতে গেলে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি, যেহেতু, যাঁরা সাধনা সম্বন্ধে নানা কথা শুধু শুনেই এসেছেন, হাতেকলমে কিছু করেন নি, তাঁরা এ-সব সাধনার কাহিনীকে তাঁদের কল্পনা দিয়ে উল্টো বুঝবেনই বুঝবেন। যুক্তিটি জোরালো বৈ কি।

এ-প্রসঙ্গে পরমহংসদেবের আর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন: দুরকম প্রকৃতির লোক আছে: এক, যারা কোনো গাছে মিষ্টি আমের সন্ধান পেলে আম পেড়ে খেয়ে, মুখ মুছে চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আর একরকম আছে যারা সবাইকে ডেকে ডেকে বলে—"ওরে, যা যা যা—অমুক গাছের আম—মিষ্টি যেন গুড়।" আমার দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক্ বা ভাগ্যবশেই হোক্, আমি এই দ্বিতীয় থাকের স্বভাব নিয়েই জন্মেছিলাম। তাই উজিয়ে উঠার মতন কিছু দেখলে কিছুতেই উজিয়ে না উঠে পারি না।

ফলে আমাকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে খেদ থাকলেও ক্ষোভ নেই আজ কারুরি বিরুদ্ধে। কারণ আমি বুঝতে পারছি এ-দুঃখ পাওয়া শুধু যে আমার দরকার ছিল তাই নয়, আমি যাকে সত্য ব'লে জেনেছি তাকে প্রকাশ না ক'রে আমার উপায় ছিল না যেহেতু "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?" ঠাকুর এর ভাষ্য করতেন এই ব'লে যে, কারুর ভাব নষ্ট করতে নেই—প্রত্যেককে তার-স্বভাব অনুসারে চলতে দেওয়াই ভালো।

কিন্তু শুধু এই সাফাই গাইতেই এ-ভূমিকা নয়। এরো পরে একটু পুনশ্চ আছে এই যে, যেসব কথা এ-বইটিতে আমি লিখেছি সে-সব অনেকে অবিশ্বাস করলেও কেউ কেউ অন্তত বিশ্বাস করবেন—যাঁরা সত্যকে খানিকটা কষতে পারেন তাঁদের সহজবোধের—ইনটুইশনের—নিকষে। তাই বলা যে, এই

তাদের জিজ্ঞাসুদের জন্যেই এ-বইটি লেখা। The cap is for him whom it fits—প্রবচনটি গভীর। কারণ বস্তুত আমরা যা-ই কিছু পরিবেশন করি না কেন, করি দরদীর জন্যেই। কবি তাঁর কাব্যরস নিবেদন করেন অরসিকের জন্যে নয়, গায়ক গান করেন গীতিবিমুখ শ্রোতার জন্যে নয়, দার্শনিক ভাব নিয়ে মাথা বকান অভাবুকদের জন্যে নয়। তাই ভাগবতকার এ-ভূমিকা করেছিলেন, ভাগবতের গোড়াতেই যে, "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" ভাগবতের রসধারা নিরন্তর পান ক'রে তৃপ্ত হ'তে আসুন তাঁরা যাঁরা রসিক তথা ভাবুক। তেমনি, এ-বইটি লেখা শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা জানতে চান ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় কি না, ভক্ত কাতর হ'য়ে তাঁকে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কিনা—এককথায়, ভাগবত করুণা ভাববিলাসী কল্পনা মাত্র, না পরীক্ষাসহ অনুভবগম্য সত্য। এঁদের মধ্যে দুচারজনেরো যদি মনে হয় যে, এ-বইটি আর যাই হোক না কেন, শুধু জন-শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের প্রতিধ্বনি নয়—এতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির রং লেগেছে—যদি এর সাক্ষ্য থেকে অন্তরের মরিয়া-না-মরে-রাম বিশ্বাসের স্বপক্ষে একটুও জোর পান যে, সর্বান্তঃকরণে ভগবানকে ডাকলে তাঁর কৃপা এ-যুগেও পাওয়া যায়, তিনি ইচ্ছা করলে এ-বিংশ শতাব্দীতেও অঘটন ঘটাতে পারেন এবং দরকার হ'লে ঘটিয়েও থাকেন—তা'হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

শেষে মাত্র আর একটি কথা বলব।

কিছুদিন আগে সমর্সেট মম-এরএ কটি বিখ্যাত উপন্যাস 'Razor's Edge পড়েছিলাম। তাতে শেষের দিকে নায়ক বলছেন:

It is a mistake to think that those holy men of India lead useless lives. They are a shining light in the darkness. They represent an ideal that is a refreshment to their fellows ; the common run may never attain it, but they respect it and it affect their lives for good. When a man becomes pure and perfect the influence of his character spreads so that they who seek truth are naturally drawn to him.

প'ড়ে চম্‌কে উঠেছিলাম, কারণ সমর্সেট মম বুদ্ধি ও প্রতিভায় অসামান্য হ'লেও স্বভাবে সংশয়ী—যাকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না তার কাছে কোনোদিনো মাথা নিচু করেন নি। কয়েক বৎসর আগে তিনি ভারতবর্ষে বেড়াতে এসে অরুণাচলে ভগবান রমণ মহর্ষির আশ্রমে কয়েকদিন ছিলেন—যাঁর কথা

আমি লিখেছি আমার Kumbha—India's Ageless Festival গ্রন্থে।' তাঁকে দেখে মম কতখানি অভিভূত হয়েছিলেন পড়তে পড়তে আনন্দ হয়েছিল আরো এই ভেবে যে, এ-যুগে যাঁরা এ-জাতীয় অচঞ্চল মহাধ্যানীদের নিষ্কর্মা ব'লে অবজ্ঞা ক'রে থাকেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিভাবান নাস্তিকেরাও কখনো কখনো সেইসব আস্তিকদের দলে নাম লেখান যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ভারত আজো বেঁচে আছে শুধু যে তার যোগী ঋষি ও অবতারকল্প মহাপুরুষদের তপোবলে তাই নয়, বেঁচে আছে তাঁদের এই শাশ্বত মহাবাণী অজ্ঞানের অন্ধকারে ঘোষণা করতে যে, শুধু ভাগবত উপলব্ধির পূর্ণতম অরুণোদয়েই কাটতে পারে দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের দুঃখনিশা—জগৎজোড়া হিংসা ভয় মোহ অশান্তির আসুরিক বিভীষিকা ইতি।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অসিত তখনো কাশ্মীরের ডুমেল আশ্রমে। হঠাৎ আমেরিকা থেকে নিমন্ত্রণ। ওর শিষ্যা তপতী বলল: "দাদা, যেতে হবেই হবে তোমাকে, আমি যে স্পষ্ট দেখলাম আমেরিকায় তুমি বক্তৃতা দিচ্ছ—সুতরাং—"

অসিত বলল: "দূর্!" কিন্তু সে শুধু মনকে চোখ ঠারা, কারণ গুরু জানত যে শিষ্যা বড় সহজ মানুষ নয়—মাঝে মাঝেই দু-একজন ওকে ঠাট্টা ক'রে এমনও বলত: "কৃপাসিদ্ধির পরেও বাক্‌সিদ্ধা—এমনটি ক'জন গুরু পেয়েছে!"

উপাধি অপ্রযুক্ত হয় নি। অসিতের যেতেই হ'ল। বিত্তহীনেরো জুটে গেল বিত্ত—সরকারের কল্যাণে। কালাপানি পেরুলো উভয়ে: আশ্রম থেকে ওদের মন কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি চাইছিল—এজন্যে ও বটে—বিশেষ ক'রে গুরুদেব স্বামী স্বয়মানন্দের মহাপ্রয়াণের পর থেকে। ওর কেবলই মনে পড়ত—গুরুদেবের সঙ্গে দিনের পর দিন একত্র ভাগবত পাঠ, তাঁর ভক্তি গদগদ বৈষ্ণব কণ্ঠের সেই অপূর্ব আবৃত্তি—কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অর্জুনের শোক যুধিষ্ঠিরের কাছে:

"রয়েছে সবি—সেই রথ, ধনুর্বাণ, অশ্ব, গজ, ধন—শুধু সে বিনা
ভস্মে আহুতির সম যে সব রতি আজিকে মনে হয় অর্থহীনা।"

আমেরিকার নানা সভায় অসিত কৃষ্ণকীর্তন করল তপতীর ভক্তিনৃত্য সঙ্গতে। ফলে অনেক দরদী ভক্তবন্ধু লাভ হ'ল। মনটা একটু হাল্কা হ'ল বৈকি—আমেরিকা-যে-আমেরিকা, সেখানেও ভগবৎ-ভজনার্থী আছে জেনে। একদিকে বিলাসের চরম—তবু ওরা চায় শুনতে, মানতে হ'ল।

কিন্তু আমেরিকার আজব মনিষ্যি বক্তৃতাও শুনতে চায়—শুধু গানে পুরোপুরি তৃপ্তি পায় না। অগত্যা দশচক্রে প'ড়ে নানা সভায় অসিত ও তপতী উভয়কেই বলতেও হ'ল কিছু।

এমনি এক সভায় নিউয়র্কে অসিত ঘণ্টাখানেক বলল কৃষ্ণকথা ভাগবত থেকে। পরে তপতী উঠল মীরার সম্বন্ধে কিছু বলতে। বলল:

"আমার গুরু আপনাদের বললেন কৃষ্ণের কথা, ভারতবর্ষের আত্মার কথা, জ্ঞানের কথা। আমি ওদিকে না ঝুঁকে বলব যা আমার খানিকটা জানা—প্রেমের কথা।

করি, তাদের কাছে ডাকি, তাদের আশ্রয় দিই বা আশ্রয় চাই। কিন্তু এ হ'ল আমাদের চলতি পথের পাথেয়। আমি প্রেম বলতে আজ বুঝছি ভগবৎ প্রেমকে যাকে আপনারা বলেন God-love. মানুষ ভগবানকে ভালোবাসতে না শিখলে পুরোপুরি বুঝতে পারে না—কাকে বলে প্রেম। আমরা ভালোবাসি না এমন কথা বলব না, কিন্তু বলবই যে, আমাদের ভালবাসার মধ্যে মিশেল আছে। কারণ আমরা সচরাচর ভালোবাসি না শুধু দিতে—যেটা হ'ল বিশুদ্ধ ভালোবাসার ধর্ম। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে থাকেই থাকে কিছু-না-কিছু স্বার্থ—মানে আমরা ভালোবাসি কিছু দিতে বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি চাই কিছু ফিরে পেতে। এইখানেই আসে মিশেল—কেননা যে-মুহূর্তে আমরা কিছু চাই সে-মুহূর্তে আমরা নিঃস্ব হয়ে দেওয়ার আনন্দ থেকে খানিকটা চ্যুত না হ'য়েই পারি না। পারি না—কেননা আমরা এখানে থাকি মানবিক প্রেমের স্তরে। কিন্তু ভগবৎ-প্রেমিক এ-স্তরে দাঁড়িয়ে থাকেন না, তিনি ওঠেন দিব্য জীবনের স্তরে—যেখানে প্রেম চলে তার স্বভাবে—শর্ত না ক'রে শুধু দিতে চেয়ে। এ-প্রেম কিছু চায় না নিজের জন্যে—চায় শুধু একটি জিনিস—নিজেকে দিতে, প্রতিদান না চেয়ে।

"মীরার মধ্যে নেমেছিল এই পরম প্রেমের আলো। তিনি ছিলেন এক মস্ত রাজ্যের মহারানী। তাঁর পরিচারিকা ছিল তিনশোর উপর। ছিল—স্বামী, আত্মীয়, পরিজন, প্রাসাদ, বিলাস। সব তিনি ছাড়লেন। কেন? না, না-ছেড়ে তাঁর উপায় ছিল না। তিনি যে ভালোবেসেছিলেন কৃষ্ণকে—যিনি সর্বহারা না ক'রে কাউকে প্রাপ্তিবর দেন না। কৃষ্ণ এসেছিলেন তাঁর কাছে প্রথমে বন্ধুরূপে, খেলার সাথী হ'য়ে। তখন মীরা বালিকা—পেয়েছিলেন এক সন্ন্যাসীর কাছে একটি কৃষ্ণবিগ্রহ। এই বিগ্রহ দিনের পর দিন জীবন্ত হ'য়ে উঠত, তার সঙ্গে চলত মীরার আনন্দলীলা—সরল, স্নিগ্ধ প্রেমের লেনদেন। ভারতবর্ষের প্রেমিক সাধকেরা বরাবরই ভগবানকে এই ভাবেই কাছে পেয়েছেন, করেছেন, তাঁকে নিজের সবকিছু নিবেদন! একথা হয়ত এযুগে অনেকেরি কাছে রূপকথা মনে হবে, কিন্তু কৃষ্ণকে যাঁরা ভালোবেসেছেন তাঁদের কাছে এ প্রত্যক্ষ সত্য, কল্পনা কি ভাববিলাস নয়।

"কিন্তু এ-ভাবে ঠাকুরকে পাওয়াই সবচেয়ে বড় পাওয়া নয়। তাঁর সত্তায় আমাদের 'আমি ও আমার' যখন বিলীন হ'তে যায় তখনই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় সর্বজীবে, জলে স্থলে আকাশে। কিন্তু এই পরম পাওয়ার জন্যে সব না ছাড়লে চলে না। তাই মীরারো ডাক এল সব-ছাড়ার। একবার এ-

ডাক যার আসে—আমরা একে বলি কৃষ্ণের ঘরছাড়া বাঁশির ডাক—তার কিছুই হাতে রাখা চলে না নিজের ব'লে। মীরারো চলল না। তাই তাঁকে ছাড়তে হ'ল—যা কিছু মানুষের প্রিয়, কাম্য—যা কিছুর জন্যে সে জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে—যা কিছু তাকে ধারণ ক'রে থাকে দিনের পর দিন।

"ছাড়লেন তিনি সর্বস্ব—প্রিয় পরিজন, রাজ্য, গৃহ, দেহসুখ—সব। বেরুলেন একাকিনী কৃষ্ণের নামে ভিখারিণী—পথে পথে কৃষ্ণের নামে গান বেঁধে মন্দিরে মন্দিরে গেয়ে সাধুসন্তদের দুয়ারে। তাঁর অখ্যাতি রটল রাজকুলে, খ্যাতি বেড়ে চলল সাধুদের সংসদে। কুলে রটল নাম—কলঙ্কিনী, ভাগবত সমাজে—প্রেমের পাগলিনী 'প্রেমদিবানী'।

'কিন্তু ক্ষতিপূরণ তো এখানে নয়, ক্ষতিপূরণ বল্লভের সঙ্গে পরম মিলনে। মিলনোচ্ছ্বাসিনী তাই চললেন পদব্রজে বৃন্দাবনে। কেন? না, কৃষ্ণ বলেছিলেন—তাঁকে গুরুবরণ করতে হবে—গুরুর মধ্যে দেখতে হবে ইষ্টকে। কবীর বলেছেন: সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু দেখে সবাই, কিন্তু বিন্দুর মাঝে সিন্ধু দেখতে পায় ক'জন?—কেবল প্রেমিক যিনি দেখতে চান সান্তের মধ্যে অনন্তকে। প্রেমের সাধনায় সসীম দেহধারী মানব-গুরুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে হবে অসীম ইষ্টকে, ভগবানকে—মীরা পেলেন এই আদেশ। তথাস্তু ব'লে এক কাপড়েই তিনি বেরুলেন অচিনের অভিসারে: রাজরানী হ'লেন ভিখারিণী—অনশনে অনিদ্রায় চীরধারিণী মীরা দ্বারে দ্বারে দৈনিক আহার্য ভিক্ষা ক'রে চললেন পরিব্রাজিকা হ'য়ে। কেন?—না, তাঁর ইষ্ট তথা বল্লভ কৃষ্ণের আদেশ।

"এবার এলো তার জীবনে আর এক পরীক্ষা। ভগবানের যে যত প্রিয় হয়, আধার যার যত বড়, তার পরীক্ষাও তেমনি কঠিন: এযাবৎ মীরা কৃষ্ণের দর্শন পেতেন, তাঁর সঙ্গে চলত মিলনালাপ, কলহবিলাপ, মান-অভিমান। কিন্তু রাজ্য ছেড়ে পথচারিণী হ'তে না হ'তে নিত্যসাথী হ'লেন অদৃশ্য। এমন কি স্বপ্নেও মীরা পেতেন না কৃষ্ণের দেখা। বিরহ-বেদনায় উন্মাদিনী শুধু তাঁর গান ও অভীপ্সাকে পাথেয় ক'রে চললেন পথে পথে—

'কুঞ্জ গলী বন প্রেমদিবানী গোবিন্দ গোবিন্দ গাউ'
পথে পথে হরিনাম তব মরি গাহি' প্রেম পাগলিনী!'

"অনুযোগ না, অভিযোগ না, শুধু এক প্রার্থনা—যেন আমার বলতে যা কিছু আছে সব পারি তোমার চরণে নিবেদন করতে: 'চাকর রাখো জী'—এই ছিল মীরার জপমন্ত্র।

"এ-প্রেমের কতটুকু বুঝি আমরা? মীরার প্রার্থনায় আমাদের অন্তর উদ্বেল হ'য়ে ওঠে, মীরার কান্নায় আমাদের চোখে জল আসে—মানি। কিন্তু সর্বহারা হ'য়ে যে প্রেমকে বরণ না করেছে সে কি সত্যি জানতে পারে প্রেমের মর্ম? সে বড়জোর কল্পনা করতে পারে প্রেমের হর্ষবিষাদকে, ওঠাপড়াকে, আলোছায়াকে। কিন্তু মীরার কাছে এ-প্রেম জল্পনাকল্পনার বস্তু ছিল না—তিনি যে পেয়েছিলেন তাকে প্রতি রক্তবিন্দুর প্রবাহে, প্রতি বিশ্বাসের আহরণে, প্রতি হৃৎস্পন্দনের আনন্দে। তাই না তিনি গাইতে পেরেছিনে সর্বান্তঃকরণে:

'ন দুখ জানূঁ, ন সুখ জানূঁ, মরণ জীবন ন জানূঁ ময়,
ন গুণ অওগুণ পিয়া, মানূ, হরষ বেদন ন মানূ ময়:
বনূঁ ময় প্রেমদিবানী—হরীকে গীত গাউঁ ময়,
বনূঁ ময় নামকী যাচক নগর মোহনকে জাউ ময়।
জানি না দুখ সুখ, জানি না কারে বলে
মরণ-অবসান কি বা জীবন,
মানি না বন্ধু হে, গুণাগুণের ভেদ,
মানি না হরষ কি তাপ বেদন:
প্রেমের পাগলিনী আমারে করো, দাও
দীক্ষা হরি, সব ছাড়ার আজ,
নামের ভিখারিণী হ'য়ে তোমার গান
গাহিব ব্রজে তব, হে ব্রজরাজ!'

তপতীর বক্তৃতার পরে কত লোকেরি যে চোখে জল! হয়ত অনেকেই ভাবলেন রূপকথা। কিন্তু তাঁদেরও হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে উঠল ওর সরল ভাবণে। কথার পিছনে যখন হৃদয় যোগান দেয় তখন বুঝি অনেক অবিশ্বাসীরো মনে হয়—তাই তো!

কিন্তু তবু অসিত বা তপতী কেউই আন্দাজ করতে পারেনি—কত লোক সাড়া দিয়েছিল, আর কতটা। তাই একটু অবাক্ হ'তে হ'ল বৈ কি যখন পরদিন সকাল থেকে ওদের হোটেলে আসতে লাগল টেলিফোনের পর টেলিফোন, কত নাম-না জানা শ্রোতার অভিনন্দন, অস্বাক্ষরিত দাতার উপহার। একজন পাঠালেন একটি সুন্দর কিমোনো। মন খুশি হয় বৈ কি—কেবল মুস্কিল এই যে, প্রাপ্তির ওজন বেশি হ'লে তার চাপও হয় বেশি: ফলে তপতী শেষটায় প্রায় কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বলল: "দাদা, কত লোকই যে দেখা করতে চান—"অসিত বলল সকুণ্ঠে: "সময় নেই যে।" অনেককেই না বলতে হ'ল, কিন্তু শেষে এক-

জনকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ল না। তপতী বলল: "দাদা, এক ভদ্রমহিলা কিছুতেই ছাড়ছেন না, তাঁর দু'চার দিনের মধ্যেই চ'লে যেতে হবে ইতালি। তাই ধরেছেন অন্তত আধঘণ্টা সময়ও যদি—"

অসিত অগত্যা বলল: "আচ্ছা ব'লে দাও—আজ বিকেলে।" তপতী টেলিফোন ধরল ফের।

অতিথির নাম মিস্ বার্বারা ব্রাউন। তরুণী সুদর্শনা—মুখে সরলতার ছাপ, মন টানে। কথাবার্তায় আশ্চয পবিত্র ভাব—ঘরের হাওয়াই যায় বদ্‌লে! তপতী সাদরে বসায়—চা ঢেলে দেয়।

চা পর্বের অন্তে তপতীকে কুমারী বললেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে: আপনার মুখে মীরার কাহিনী শুনে অবধি কেন জানি না মন আমার দুলে উঠেছে। কেবল সঙ্গে সঙ্গে—কিছু মনে করবেন না—সংশয়ও জাগে—কেন, ঠাহর পাই না। বালগোপালের বিগ্রহ তাঁর সামনে দিনের পর দিন জীবন্ত হ'য়ে উঠত—ভগবান স্বয়ং তাঁর সঙ্গে এসে আলাপ করতেন—এ সব একদিক দিয়ে শুনতে যেমন ভালোও লাগে—অন্যদিকে বিশ্বাস করতেও যে ঠিক তেমনি বাধে!" ব'লেই একটু থেমে অসিতকে: "আচ্ছা, একটি কথা বলবেন খোলাখুলি?"

অসিত হেসে বলল: "কী এমন কথা যে এত আটঘাট বেঁধে তবে জিজ্ঞাসা করতে হয়?"

বার্বারা একটু লাল হ'য়ে উঠল: "এমন কিছু নয়—তবু পার্সনাল প্রশ্ন কি না, মানে আমার হয়ত এ অন্যায় কৌতূহল—তবু জানতে ইচ্ছা হয়—আপনার বিশ্বাস হয় এ-ধরণের অঘটনে?"

অসিত গম্ভীর হয়ে গেল, বলল: "উত্তরে আমিও যদিও পাল্টা প্রশ্ন করি—আপনার বিশ্বাস হয় কি না যে খৃষ্টদেব একটা রুটি থেকে বহু লোককে ভূরি-ভোজন করিয়েছিলেন, কি জলের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন?"

সরলা বালা বিস্ফারিত নেত্রে জবাব দিল: "হবে না? ও যে বাইবেলের এজাহার! তা ছাড়া খৃষ্টদেব নিজেই বলেন নি যে কি চাইলে মিলবেই, খুঁজলে পাবেই? তাই যারাই তাঁর কাছ থেকে যা চেয়েছিল—পেয়েছিল। এ তো রূপকথা নয়—সাক্ষাৎ ইতিহাস যে! তবে কি না"—ব'লে একটু থেমে সকুণ্ঠে: "এ সব হ'ত কেবল সে যুগেই—যখন অঘটন ঘটতে পারত সহজেই।"

অসিত ওর সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ হ'ল—যে বিশ্বাসের আলো এ-যুগের অবিশ্বাসের আঁধিতেও বিলুপ্ত হয় নি। বলল: "যদি বলি—মীরার কাহিনীও ইতিহাস?

শুনুন বলি। অঘটন এ-যুগে আর ঘটে না বা ঘটতে পারে না এ কথা সর্বৈব মিথ্যা। এ আমার শোনা কথা নয়—চোখে দেখা। তবে এ কথা মানব যে, আপনাদের দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের আবহাওয়ার একটু তফাৎ আছে। তাই হয়ত"—মৃদু হেসে "আমাদের ঠাকুরটির মেজাজও খানিক বদলে গেছে। কারণ আমাদের ইনি চাইলে যে সব সময়ে দেখা দেন এ-ও নয় —আবার না চাইতে বর দেন—এও হয়!"

বার্বারা একটু চুপ করে থেকে বলল ফের সেই সরল ভঙ্গিতে: "দেন সত্যি? —আচ্ছা, আপনাকে দেখা দিয়েছেন?"

অসিত মুখ নিচু করে বলল মৃদু স্বরে: "না—তবে—"

"তবে কী?"

"ব'লে হয়ত বোঝাতে পারব না। মানে, দেখা পাইনি, তবে বর পেয়েছি যার নাম কৃপা। তাই ভরসা হয়—একদিন হয়তো দেখাও পাব। তবে সবই তাঁর ইচ্ছা।"

বার্বারা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে: "দেখা পান নি, তবু ভরসা রাখেন কেমন ক'রে—বলবেন?—কৃপা পেয়েছেন ব'লেই কি?"

"শুধু তাই নয়, এমন দু'চারটি ভাগ্যবানের দেখা পেয়েছি যাঁরা ঠাকুরের দেখা পেয়েছেন ও শুধু দেখা পাওয়া নয়—দেখা পাওয়ার ফলে তাঁদের জীবনে বিপ্লব ঘটে গেছে।"

বার্বারা সরল মিনতির সুর ধরে: "বলুন না এমন একজন ভাগ্যবানের কথা অন্তত।"

অসিত সকুণ্ঠে বলে: "বলতে পারি আমি—কিন্তু আপনি কি পারবেন বিশ্বাস করতে?"

"পারব—বিশ্বাস করুন। আর কেন জানেন? কারণ আপনার কালকের কথা শুনে মন নিয়েছে যে আপনি শুধু অভিজ্ঞই নন—স্বভাবে সত্যনিষ্ঠ।"

অসিত তপতীর দিকে তাকায় সপ্রশ্ন নেত্রে তপতী বলে: "বলো দাদা, ইনি সত্যিই খুঁজছেন—মনটিও সাদা।"

অসিতের মুখের মেঘ কেটে যায়, বলে: "শুনুন তবে।" অসিত যতদূর দেখতে পেত মানুষ সম্বন্ধে তপতীর দৃষ্টি ছিল তার চেয়ে বেশি অন্তর্ভেদী—এর যে ও বহু প্রমাণ পেয়েছিল—অকাট্য।

অসিত বলে: "সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা। তখনো আমার ভাগ্যে

গুরুলাভ ঘটেনি—যদিও যত্রতত্র গুরু খুঁজে বেড়াই। কিন্তু গুরু মিলবে কোত্থেকে?—তখনও যে আমি মুনির চেয়ে গুণীকেই বেশি ক'রে চাই। সারা ভারত টহল মেরে বেড়াই বড় বড় গাইয়ের খোঁজে, সেরা বাইজির খোঁজে।

"এমন সময় নিমন্ত্রণ এল গুজরাত থেকে—সুরট শহরে গানের সভায় গাইতে হবে। সোৎসাহে সেখানে হাজির। ঠাঁই পেলাম সেখানকার এক বর্ধিষ্ণু ক্রোরপতি শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে, নাম—বুলাভাই পারেখ। শুনতাম তাঁর নাকি আশ্চর্য বিশ্বাস—তিনি সন্ধ্যাবন্দনা করেন তাঁর সুরম্য মর্মর মন্দিরে—বালগোপালের একটি অপরূপ মণিমালী-মূর্তিকে।

"বুলাভাইয়ের স্ত্রীর হঠাৎ খুব অসুখ করল। ডাক্তার বলল: 'অবস্থা সঙিন!' শেঠজি জাঁক ক'রে বললেন: 'আমি চিরজীবন বাল-গোপালের স্তব ক'রে এসেছি—প্রার্থনায় বিশ্বাস করি, ঠাকুর কখনই আমার বুকে শেল হানবেন না'। রোজ তিনি দু'বেলা তিনচার ঘণ্টা ক'রে মন্দিরে প্রার্থনা করতেন।

"কিন্তু স্ত্রীর অবস্থা ক্রমশ আরো খারাপ হ'ল।

"শেঠজির একটি ছেলে ছিল আট বৎসরের! তার জন্য তিনি একটি শিক্ষক রেখেছিলেন—বাঙালী। যুবকের নাম অমল। অনিন্দ্য কমনীয় মুখশ্রী। সরল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, বিনয়ী। নামের সঙ্গে স্বভাবের সঙ্গতি ছিল বৈ কি।

"শেঠজি একদিন অমলকে বললেন—ওঁর স্ত্রীর জন্যে ঠাকুরঘরে প্রার্থনা করতে। অমল সোজাসুজি জবাব দিল—ভগবান আছেন কি না এ-সংশয় ওর কাটেনি। তা ছাড়া রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করা—ওর মন নেয় না। শেঠজি খুবই বিরক্ত হ'লেন। আমি তাঁকে বললাম অমলের উপর এজন্যে রাগ করা অনুচিত। নৈলে হয়ত তিনি অমলকে তখনি বরখাস্ত করতেন।

"ডাক্তার শেষে একদিন বলল—আর আশা নেই। শেঠজি তখনও হাঁকলেন সগর্বে: 'অসম্ভব। সারবেই—আমি এতদিন ধ'রে ঠাকুরের পূজারী—' ইত্যাদি। সেদিন সারারাত তিনি প্রার্থনা করলেন। পরদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হ'ল। তিনি গুম্ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ, তারপরে হঠাৎ মন্দিরে গেলেন হনহন ক'রে—পরে ফিরে এসে আমাকে বললেন: 'ঠাকুরকে ফেলে দিয়েছি—আঁস্তাকুড়ে।'

অসিত ব'লে চলে: "পরদিন সকালবেলা আমি শেঠজিকে বললাম—এবার বিদায় দিতে হবে।

"শেঠজি বললে: 'বেশ। মোটর রইল। হ্যাঁ, অমলকে নিয়ে যাবেন।'

'কেন ?'

'তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। সে ঐ অলুক্ষণে ঠাকুরকে আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনেছে। আপনি ওকে কোনো একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন।' ব'লেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে দুম্ দুম্ ক'রে চ'লে গেলেন।

"আমি গেলাম সোজা অমলের ঘরে। দেখি কি, ও গরম সাবানজল দিয়ে বালগোপালের বিগ্রহটিকে অতি সযত্নে সাফ করছে। বলল ক্লিষ্টকণ্ঠে: 'দাদা, আজ সকালে চক্র দিতে গিয়ে দেখি—ঠাকুর—আঁস্তাকুড়ে—ডাস্ট বিনে। তাই তুলে এনেছি। আহা, এমন সুন্দর বিগ্রহকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে আছে ?'

"আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'কিন্তু তুমি তো ভগবানে বিশ্বাস করো না বলছিলে ?'

"ও বলল: বিশ্বাস করি ব'লি কোন্ মুখে দাদা ? শোনা কথা তো। তবু কী জানি কেন—এ-নিখুঁৎ মূর্তিটিকে আঁস্তাকুড়ে প'ড়ে থাকতে দেখে ভারি কষ্ট হ'ল। এটিকে রাখব কাছে কাছে। ঠাকুর সত্যি হোন বা না হোন—বিগ্রহটি যে সুন্দর এ তো সত্যি। বেশ তো, রাখব ঘরের আসবাব ক'রে। হ্যাঁ, কর্তা আমাকে বিদায় দিয়েছেন—এই অপরাধের জন্যে।'

'শুনেছি। কিন্তু কোথায় যাবে ?'

'জানি না, দাদা। ভাবছি নবদ্বীপে ফিরব। আপন বলতে এক বিধবা মা। কেবল তাঁর জন্যেই এ বিভুঁয়ে চাকরি নেওয়া। কিন্তু নবদ্বীপে দু'বেলা দু'মুঠো জুটবে কেমন ক'রে ভাবছি—বিশেষ আমার ম'ত নাস্তিকের।'

"পাটনায় এক বন্ধুর বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ ছিল দিন পনের থাকার। তাঁর একটি ছেলেকে গান শেখাতাম মাঝে মাঝে গিয়ে। ওকে সঙ্গে ক'রে পাটনায় নিয়ে গিয়ে বন্ধুর সুপারিশে এক স্কুলে চাকরি ক'রে দিলাম। অমল এম-এ পাস সংস্কৃত পড়াত—মাইনে দেড়শো টাকা, ঠাঁই পেলো একটি মেসে ছোট্ট ঘরে। বেশ খুশী হ'য়েই র'য়ে গেল ওখানে। দিন কয়েক বাদে একদিন হঠাৎ বলল: 'ঠাকুরকে রোজ দেখি চেয়ে। কেন জানি না—বেশ মন ভ'রে ওঠে দাদা!'

'বিশ্বাস গজিয়ে উঠল বা!' বললাম আমি হেসে।

"অমলও হাসল: 'আমাদের আবার বিশ্বাস, দাদা! তা ছাড়া বুলাভাইয়ের বিশ্বাসের দুর্গতি দেখে আর যেন বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখতে ভরসা পাইনে।'

"আমি বললাম: 'বুলাভাইয়ের বিশ্বাসকে ঠিক বিশ্বাস বলা যায় কি ? ও তো চুক্তি: আমাকে যদি দাও যা আমি চাই—কি না সংসার চাকার তেল, তবেই আমি তোমাকে দেব তাই যা তুমি চাও—কি না ভক্তি বিশ্বাসের চালকলা।

যারা সত্যি বিশ্বাস করে তাদের মতিগতি একটু ভিন্ন—এটুকু অন্তত আমি জানি।'

"অমল বলল : 'একথা আমারও মনে হয়েছে দাদা! তবে কি জানেন? আমার মতামত কাঁচা! জন্ম নবদ্বীপে, কাজেই ভগবান সম্বন্ধে শুনেছি তো কত কথাই! তবে ঐ যে বললাম—শুধু শোনা কথা বৈ তো নয়! কিন্তু অন্তরে আলো না জ্বললে মন খুলে আলোর গুণকীর্তন করতে ডরাই—মিথ্যাচার হবে এই ভয়ে। তবু আজকাল কেন জানি না—থেকে থেকে ঠাকুরের দিকে তাকাই, আর হঠাৎ মনে হয়—ঠাকুর যেন প্রসন্ন হ'য়ে হাসছেন! মনকে বলি—দূর্, সব কল্পনা! অথচ কোথায় বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ করে ভাবতে। তবে কিসে কী হয় তার কতটুকুই বা জানি বলুন?'

"ও আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। আমি বিব্রত বোধ করি। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেয়ে বলি : এখানে কেমন লাগছে?

"অমল হাসে : 'আমাদের আবার ভালো লাগা-না-লাগা। ছেলেরা পড়তে আসে, পড়াই—অবসর সময়ে দু'টা বই পড়ি—এখানে ওখানে যাই, দু' একটি বন্ধু মিলেছে, এ-ও-তা আলোচনা করি—দিন কেটে যায়। মন্দ কি? আমার কোনো উচ্চাশা নেই এই বাঁচোয়া—নৈলে হয়ত খারাপ লাগত। কেবল একটা কথা বলব আপনাকে? বলতে পারি—যদি কাউকে না বলেন। লোকে পাগল ভাববে দাদা, কাজ কি?'

"আমি হেসে বললাম : "আমি কাকেই বা বলতে যাব? তা' ছাড়া আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য—নির্জনে চুপচাপ থেকে একটু জিরিয়ে নেওয়া। আবার তো ঘুরতে হবে কর্মচক্রে! কলকাতায় কী ভাবে আমার দিন কাটে জানো না তো!'

'তবে শুনুন দাদা, বলি। তরশু দিন নবদ্বীপ থেকে এক বন্ধুর চিঠি পেলাম—একটি অনাথ শিশুর কলেরা হয়, মা তাকে পথ থেকে তুলে এনে শুশ্রূষা ক'রে বাঁচান। শিশুটি বাঁচে বটে, কিন্তু মা কলেরায় দু'দিনে মারা যান। আমার দাদা, বলেছি, সংসার বলতে ছিলেন ঐ এক বিধবা মা। সুরট থেকে তাঁকে প্রতিমাসে পঞ্চাশটি ক'রে টাকা পাঠাতাম—তাঁর স্বচ্ছন্দে চলে যেত। ভাবছিলাম সামনে পূজোর ছুটিতে যাব তাঁকে দেখতে, যদিও তিনি ঠাকুরসেবা ও গঙ্গাস্নান নিয়ে বেশ শান্তিতেই ছিলেন বলব। কেবল মাঝে মাঝে লিখতেন একটিবার শুধু বৃন্দাবন যেতে চান। এখানে এসে অবধি তাঁকে বৃন্দাবন ঘুরিয়ে আনবার জন্যে প্রাইভেট টিউশনি ক'রে কিছু টাকার জোগাড়

করব ভাবছিলাম—এমন সময় এই খবর এল। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। রাতে খুব কাঁদলাম, কিন্তু ঠাকুরকে ডাকতে পারলাম না। তিনি আছেন কি নেই কে জানে? তা' ছাড়া—মিথ্যা কথা বলব না—মনে ক্ষোভও উঠল গজিয়ে—যদি ঠাকুর সত্যিই থাকতেন তবে কি আমার পুণ্যবতী মা এ-ভাবে মারা যেতেন—পরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে? হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে কেমন যেন এক ঘোর মতন এল। শুনতে পেলাম পরিষ্কার বাঁশি বাজছে। ঘরের মধ্যে একটি মাত্র বাতি জ্বলছিল। মুখ তুলে দেখি বালগোপাল ফের পরিষ্কার হাসছেন! চোখের ভুলের সঙ্গে কানের ভুলের যোগ—এ ছাড়া আর কি বলব? তবে আশ্চর্য এই যে, সঙ্গে সঙ্গে মনে আমার শান্তি গেল বিছিয়ে—কোথাও শোকের দুঃখের আর যেন চিহ্নও নেই! হঠাৎ মাতৃশোক গ'লে আনন্দ হ'য়ে গেল কী ক'রে—আজো ঠাউরে পাই নে!'

"আমি চমকে উঠলাম, বললাম: 'অমল, তুমি ভাগ্যবান। সত্যে তোমার অচলা নিষ্ঠা আছে, তা' ছাড়া স্বভাবে আছে সহজ সরলতা, পবিত্রতা, দীনতা। তুমি যা দেখেছ শুনেছ—তা কল্পনা ব'লে আমার মনে হয় না। হয়ত কিছুদিন পরেই তোমার সংশয়ের আড়াল ঘুচে যাবে—অমনি তুমি বুঝতে পারবে অনেক কিছু যা এখন পারছ না। যদি সে-অবস্থা হয়—আমাকে লিখো, এইটুকু অনুরোধ রইল। কারণ আমিও খুঁজছি অনেকদিন থেকে—তোমার কাছ থেকে হয়ত পাব কিছু পথের পাথেয়—যা আমিও চাই—কিন্তু পাচ্ছি না, তোমার মতনই।' ও কথা দিল, লিখবে—যদি কখনো তেমন সুদিন আসে।

"পরদিন সকালে আমি কলকাতা রওনা হলাম। কেবল ওর মঞ্জুবাক্ স্নিগ্ধ সুন্দর মুখশ্রী ভুলতে পারলাম না—থেকে থেকে কেবলই মনে হ'ত ওর শান্ত স্নেহ ও সরল স্বভাবের কথা।"

অসিত বলল বার্বারার দিকে চেয়ে: "এর পরে বছর তিনেক অমলের কোন খবরই পাইনি। এখানে ওখানে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াই। ভাবি—একটি সদ্গুরুর আশ্রয় পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু সেই তাগিদই বা তেমন প্রবল কই? আশৈশব সাহিত্য সঙ্গীতের আবহে মানুষ তো, কাজেই মনে ছিল—সাহিত্যে আর গানে কিছু সত্যিকার সৃষ্টি করতেই হবে। নাম-ডাক একটু আধটু যে হ'ল না তাও নয়—কিন্তু মনের মধ্যে বাজে নির্বেদের সুর, কোথাও যেন কী বেঁধে—বৃথাই কাল কাটাচ্ছি ভেবে! মীরার একটি গান থেকে থেকে মনে পড়ে—'চাকর রাখো জী।' কিন্তু দাস হতে চাওয়া এক,

পারা আর। ফলে বৈরাগ্যও উঁকি মেরে টু দিয়ে যায়, কিন্তু বেদনা স্থায়ী হয় না। তখনো সদ্‌গুরুর দেখা পাইনি—হবে কেমন ক'রে?

"এমন সময় হঠাৎ একদিন চিঠি পেলাম অমলের। ও লিখেছে: 'দাদা, কিছু কিঞ্চিৎ পেয়েছি। যদি ইচ্ছে হয় আসবেন, বলব। আপনার কাছে কথা দিয়েছিলাম তাই লিখলাম।' সত্যবাদী যে স্বভাবে, সে কথা দিলে কথা রাখে।

"আমার মন তখন নানাকারণে অশান্ত ছিল। গেলাম ছুটে কলকাতা থেকে পাটনা। এবার এক ছোটো হোটেলে উঠলাম। গঙ্গার ধারে একটি হোটেল মিলে গেল বেশ নিজন, ঘরও পেলাম গঙ্গামুখী। ভাবলাম এখানেই কিছুদিন থাকলে মন্দ কি? অমলের মেস আমার হোটেল থেকে দেখা যায়। মাঝে কয়েকটি চালাঘর।

"অমল এল আমার কাছে স্কুলের পরে—সন্ধ্যার দিকে। তার মুখে যা শুনলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সব কথা ফেনিয়ে বলার দরকার নেই—তবে মোট কথাটা এই যে, ও প্রায়ই দেখত বিগ্রহটির দিকে চেয়ে চেয়ে, আর মনে হ'ত ঠাকুর যেন হাসছেন—স্পষ্ট। মাঝে মাঝে বাঁশি শুনত, কখনো বা নূপুর। মনের ভুল ভেবে এ সব ডিশমিশ ক'রে দিত কিন্তু চোখের দেখা বা কানের শোনাকে কল্পনা ব'লে বাতিল করা যতটা সহজ, মনের মধ্যে শান্তিকে নামঞ্জুর করা তো ঠিক ততটা সহজ নয়। তাই অবিশ্বাস সত্ত্বেও ওর মন একটু একটু ক'রে ঠাকুরের দিকে ঝুঁকতে লাগল। ক্রমশ এমন হ'ল যে সন্ধ্যায় কোথাও গেলেও মন ছটফট করত ঠাকুরের জন্যে। ঘরের মধ্যে এসে চুপটি ক'রে ব'সে ঠায় চেয়ে থাকত বিগ্রহটির পানে, আর ভাবত—বিশ্বাস করা ভালো, না মন্দ?

এমনি ক'রে বছর দুই কাটার পর হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখল এক পূজারী ঠাকুরের সামনে ব'সে—ওরই ঘরে। ও যেন উঠে তাঁকে প্রমাণ করল, পূজারী গুরুরূপ ধ'রে ওর কানে কৃষ্ণমন্ত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক্ আলোয় আলো—আর সে কী আনন্দ! ঘুম ভেঙে গিয়ে ঠাকুরের দিকে চেয়ে সেই মন্ত্রটি জপতে না জপতে ওর মনে হ'ল প্রতিরোম জপ করছে সেই মন্ত্র। কেমন ঘোর মতন এসে গেল—অমনি কী কাণ্ড! ঠাকুর দাঁড়িয়ে স্বয়ং—বললেন: 'কেমন, আর অবিশ্বাস করবি?' ব'লেই অন্তর্ধান।

"চমকে উঠে ব'সেই ওর চক্ষে অবিরল ধারা!—

'আর অবিশ্বাস করব না ঠাকুর—যখন কৃপা করেছ।'

"তার পরদিন থেকে ও সকাল-সন্ধ্যায় কেবল গুরুমন্ত্র জপে আর আনন্দে মন ছেয়ে যায়। উদ্ভাসিত মুখে আমাকে বলল:

'সে যে কী আনন্দ দাদা—যে পায়নি তাকে বোঝানো যায় না। মনে হ'ত সবকিছু থেকেই যেন মধু ঝরছে! কেমন ক'রে এ-কৃপা এল—কোত্থেকে এল জানি না—তবে এসেছে এ ধ্রুব। মনের কোথাও নেই আর একতিলও সংশয় কি অবিশ্বাস। আর কেবলই মনে হয়—সব ছেড়ে যাই বৃন্দাবন। কিন্তু কে যেন বলে: না—এখনো সময় হয় নি। কিছু কাজ বাকি আছে। স্পষ্ট বলে—হলপ ক'রে বলছি। একদিন মনে হ'ল—আমার স্বপ্নে-পাওয়া গুরুই বলছেন।

'আজকাল ইস্কুলে পড়ানোর পরে আমার অখণ্ড অবসর। কোথাও আর যাই না। বন্ধু-বান্ধব ডাকলে সোজা ব'লে দিই—যাব না। ক্রমে সবাই টের পেয়ে গেল যে, আমি দোর বন্ধ ক'রে শুধু ঠাকুরপুজো নিয়েই মত্ত থাকি। স্কুলের আর সব শিক্ষকেরা বলাবলি করে—কানাকানি করে—হাহাকারও করে:

'স্রেফ পাগল হ'য়ে গেল—আহা!—সহজ মানুষটা শেষটায় কি না ক্ষেপে গেল গা! আশ্চর্য দাদা, কারণ আমার মনে হ'ত ওরাই পাগল, তাই মুক্তো ফেলে ঝিনুক নিয়ে মশগুল!'

"এর পরে ও নানা রকম দর্শন হ'তে লাগল। কখনো জ্যোতি দেখত, কখনো বা কোনো দিব্য-মূর্তি, কখনো মেঘ থেকে ঝরছে আকাশ-গঙ্গা—এমনি আরও কত কী! রোজ সকালে এসে বলত এই সব—আর আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠত: পরম পাওয়ার সাক্ষ্য পেয়ে। কারণ ওর মুখচোখের ভাব ও কণ্ঠস্বরের ধ্বনিতে এমন একটা কিছু ফুটে উঠত যাকে অবিশ্বাস করার কথা ভাবাও যায় না।

"এমনি সময় ঘটল এক কাণ্ড!

"সেদিন পূর্ণিমার রাত। গঙ্গার ঘাটে ব'সে আমরা দু'জনে দেখছি স্রোতের জলে সোনার থাম ঝিকমিক করছে। হাওয়া উঠেছে—দেহ-মন গেছে জুড়িয়ে। আমি সবে একটি কীর্তন ধ'রেছি: 'ব্রজনন্দ কি নন্দন নীলমণি'—এমন সময়ে হৈ হৈ শব্দ। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি কি—আমার হোটেলের কাছে একটি ছাপরার ঘর দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। অমল নক্ষত্রবেগে ছুটল—আমিও ধাওয়া করলাম ওর পিছু-পিছু।

"আগুন ধরেছে তলা থেকে—কিন্তু তখনও চাল পর্যন্ত ওঠেনি।

প্রতিবেশী কয়েকজন বালতি-হাতে ছুটে এসে জল ঢালতে লাগল, কিন্তু হাওয়ার বেগ তখন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে—আগুনকে দমানো কঠিন। অমল আচমকা ধাঁ ক'রে পাশের একটা গাছে চ'ড়ে—তার শাখা বেয়ে চালের ওপর টপকে পড়ল, আমরা ওকে নিচে থেকে বালতি ক'রে জল জোগাতে শুরু করলাম। আগুন যেন একটু কমের দিকে—এমন সময়, দুরদৃষ্টি!—হাওয়ার মোড় গেল হঠাৎ ফিরে। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের নিমেষে চালায় ধরল আগুন। আমরা চীৎকার করে হাঁকলাম: 'অমল, লাফ দাও, লাফ দাও।' কিন্তু লাফ দেবে কি—ধোঁয়া আর আগুনের ঘেরাটোপে তখন ওর দেহ অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমাদের কানে এল ওর অস্ফুট আর্তনাদ—'ঠাকুর! ঠাকুর!' ব্যস, তার পরেই ছাদ মড মড করে ভেঙে পড়ল। ভাগ্যে অমলের একটা পা দেখা গেল। আমরা টেনে ওকে বার করলাম—কিন্তু ও তখন অজ্ঞান—দুটি হাত দুটি চোখের 'পরে—কিন্তু অনড়, অচল।

"আমি হোটেল থেকে একটি মোটর ক'রে ওকে নিয়ে ছুটলাম হাঁসপাতালে। ডাক্তার বলল—বেঁচে যাবে, তবে মুখ একেবারে পুড়ে গেছে—ঘা সারলেও দাগ উঠবে না।

"পরদিন কলকাতা থেকে এক তার এল—আমার এক আত্মীয়ের খুব অসুখ—মরণাপন্ন। অমলের প্রাণের আশঙ্কা নেই জেনে ওকে হাসপাতালে আমার এক বন্ধু ডাক্তারের হেফাজতে রেখে—ধাত্রীর হাতে ওর শুশ্রূষার জন্যে কিছু টাকা দিলাম। অমলকে বললাম, দুদিন বাদেই ফিরে আসব, ভয় নেই। আদৌ ইচ্ছা ছিল না কলকাতায় যেতে, তবু যেতে হ'ল। আত্মীয়টি বাঁচলেন না। শ্রাদ্ধশেষ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে পাটনা ফিরতে প্রায় মাসখানেক হ'য়ে গেল।

"অমল আর সে অমল নেই। অমন অনিন্দ্যসুন্দর মুখ পুড়ে এমন কুৎসিত হ'য়ে গেছে যে প্রায় চেনাই যায় না। তবু ভাগ্যে চোখ বেঁচে গেছে ভেবে ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিলাম।

কিন্তু মুখ ধবল রোগীর মত সাদাটে, এখানে-ওখানে তামাটে। আমার মনে খুব রাগ মতন হল: ঠাকুরের এ কেমন লীলা! এমন নিরীহ শান্ত সাধুভক্তের সুন্দর মুখখানির এ কী হাল করলেন! কিন্তু আশ্চর্য, ওর এজন্যে এতটুকু খেদ নেই। বলে কেবলই: "যে কৃপা পেয়েছি দাদা, তার বদলে একটি তো একটি, দশানন পুড়ে গেলেও মনে হ'ত সার্থক।' কিন্তু এর বেশি কিছু বলে না। অথচ আমারো আগ্রহ প্রবল—ওকে রোজই ধরি: 'বলো না ভাই, কী কৃপা পেলে!' ও বলি বলি করে দু-একবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না বলতে।

তবু আশা রাখি—হয়ত একদিন মুখ ফুটবে। এমনি ক'রে দিন সাতেক কাটল।

"এর পরই ঘটল যা চাইছিলাম আমি। সেদিন রাখি-পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় গঙ্গার ঘাটে ব'সে কীর্তন ধরেছি 'নন্দনন্দন চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত অঙ্গ'—এমন সময়ে হঠাৎ ওর হ'ল ভাবসমাধি, যেমন গান শুনতে শুনতে ওর প্রায়ই হ'ত। কিন্তু এ-অবস্থায় ওকে কথা বলতে শুনলাম এই প্রথম। চুপ ক'রে শুনতে লাগলাম—এক অদৃশ্য আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে জানানো ওর প্রাণের উচ্ছ্বাস: 'না ঠাকুর, না না! আর কী—তোমার দেখা পেয়েছি—এর পরেও বর! ছি ঠাকুর। এমন ক'রে কি লোভ দেখায়! তুমি দিনের পর দিন আসছ—কথা কইছ—মোহনভোগ প্রসাদ দিলে প্রসাদ খেয়ে যাও লুকিয়ে—মোহনভোগে তোমার কচি-হাতের আঙুলের দাগ দেখতে পাই—' ব'লে খিলখিল করে হেসে—'কিন্তু কী লোভী তুমি ঠাকুর! ঐটুকু ছোট্ট শিশু—এত-খানি খেয়ে ফেলতে আছে! অসুখ করবে না?' ইত্যাদি।

"শিউরে উঠলাম। ভোগ দিলে কখনো কখনো ভক্তের ভোগ ঠাকুর খানিকটা খেয়ে বাকিটুকুপ্রসাদ রেখে যান একথা বইয়েই পড়েছিলাম—চোখে দেখিনি তখন পর্যন্ত। তবু বিশ্বাস যেন হ'তে চায় না ঠাকুর আসেন, কথা কন ওর সঙ্গে—দিনের পর দিন! এও অবশ্য বইয়ে পড়েছি—কত ভক্তের জীবনেই ঘটেছে—তবু মনে হয়—হয়ত কল্পনা—উইশ্-ফুলফিলমেণ্ট—তোমরা বলো না এদেশে?"

বার্বারা বলল: "আমরা অজ্ঞ—অথচ ভাবি নিজেদের বিজ্ঞ। কাজেই অনেক কিছুই বলি না জেনে—ও ধরবেন না। বলুন, থামবেন না, লক্ষ্মীটি।"

অসিত প্রীতকণ্ঠে ব'লে চলে: "ওর ভাবসমাধি ভাঙলে ওকে হেসে বললাম যে, সব কথাই ফাঁশ হ'য়ে গেছে। অমনি ওর চোখে নামল ধারা, মুখ গেল খুলে—আর সঙ্গে সঙ্গে বলার তোড় নামল—যেন পাষাণ-চাপা নির্ঝরিণীর মুখের ঢাকা খুলে গেছে—যা বলতে নেই ও অনর্গল বলে চলে—পরিণামচিন্তা না রেখে। 'দাদা! কী বলব—বলার আর কী আছে বলুন এর পরে? ঠাকুর মুখপোড়াকেই যে সবচেয়ে ভালবাসেন এইটে দেখাতেই বুঝি করলেন এ-লীলা—লোকের চোখে নিষ্ঠুর—কিন্তু ভক্তের চোখে মধুর—মধুর—মধুর।' বলেই গুনগুনিয়ে আবৃত্তি করে ভাবাবেশে:

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো!
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্!

মধুগন্ধ মৃদুস্মিতমেতদহো !

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ !'

"গাঢ়কণ্ঠে ও ব'লে চলল : 'দাদা, যে দেখেছে সেই জানে, যে পেয়েছে সেই চেনে। তখন কে কী বলে, ভাবে—কী আসে যায় বলুন ? আপনিই একটা কীর্তন গান না—

এমনি স্মরণে জাগালে পরাণ,

ভুলালে—যা কিছু ছিল স্মরণে !

কী পেয়েছি—তার কী গাহিব গান।

কী দিয়েছ—হায়, কহি কেমনে।

'কেবল কী ভাগ্য যে করেছিলাম—হঠাৎ একটি বিগ্রহ দেখে মায়া করল—তুলে নিয়ে শুধু ঘরে রাখা—এর নাম কি তপস্যা ? না দাদা, তপস্যা আমি করি নি—না পুজোপাঠ, না জপতপ। বিশ্বাস বলতে যা বোঝায় তারো তো কোনো সম্বলই ছিল না আমার ! কে আমি বলুন ? এক নগণ্য স্কুল মাস্টার—যার তিনকুলে কেউ নেই। অথচ যোগী ঋষি বহু তপস্যা করেও যাঁর নাগাল পায় না আমি পেয়ে গেলাম কি না তাঁকে—আর না চাইতে !!

'মনে আছে আপনার—সুরটে আমি ঠাকুরের মন্দিরে প্রার্থনা পর্যন্ত করে চাইনি—কেন না বিশ্বাস নেই অথচ বিশ্বাসের ভঙ্গি করব এ আমি ভাবতেও পারি নি। এ-হেন নাস্তিকের ভাঙা ঘরে এলো কি না চাঁদের আলো—আর সে কী আলো ? সাক্ষাৎ প্রেমের ঠাকুর—জীবন্ত ঠাকুর !

'দাদা ! আমি অনেকদিন আগেই চ'লে যেতাম—বৃন্দাবন আমাকে টানে—কেবল—গুরু স্বপ্নে বললেন আমাকে এখানেই থাকতে।' থেমে একটু হেসে : 'মুখপোড়া ক'রে বোধহয় ঠাকুরের সাধ মেটে নি, সর্বাঙ্গ ভাজা হ'লে তবে পায়ে ঠাঁই দেবেন !' ব'লে ফের গম্ভীর হ'য়ে : 'কি জানেন দাদা ? আমার বড় অভিমান ছিল মুখশ্রীর। তাই বুঝি ঠাকুর করলেন কাঙাল—শ্বেতকুষ্ঠ ব'লে মনে হয় সবাইকার। ওরা আমায় ছাড়িয়ে দিয়েছে—এমন কুৎসিত মাস্টারকে কে রাখতে চায় বলুন, ছেলেরা যাকে দেখে ভয় পায় :—তা ভালোই হ'ল—গেল মানুষের চাকরি—ঠাকুরের সেবায়েৎ পদে যে বাহাল হয়েছে তার কি সাজে আজ কারুর তল্পি-বওয়া ? আপনি আমাকে কৃপা ক'রে যে-একশো টাকা পাঠিয়েছিলেন দাদা, তাতেই দিন চ'লে যাচ্ছে। এ-পুঁজিটুকু ফুরুলে ঠাকুরই ফের জুটিয়ে দেবেন মাসোয়ারা বা মাধুকরী। ঠাকুর যা করেন দাদা ! আমি

কে বলুন ? ব'লে —কিন্তু আমার যে কী লাভ হল—বলি কোন্ উপমা দিয়ে ?, ব'লে একটু থেমে মৃদু হেসে চোখ মিটমিট ক'রে :

"কিন্তু নিরুপমের যে কেমন লীলা—বোঝা ভার ! ভাবুন পাগলের মতন ছুটলাম আমি কী জন্যে ? না, একটা পুড়ন্ত চালাঘর বাঁচাতে। কী খেয়াল চাপল—ঠাকুরের বদ্‌খেয়াল ছাড়া আর কী বলব বলুন—উঠলাম কিনা অপল্‌কা খোড়ো চালে—এক মুহূর্তে ! তারপর চোখে দেখলাম অন্ধকার—চারধারেই দেখি আগুন্ আর আগুন ! ব্যূহে ঢোকা সহজ, বেরুনো ভার—বলে না ? মনে প্রথম এলো দারুণ ভয় ! প্রাণের ভয় ! তার পরেই ধিক্ ধিক্ করে উঠল দেহ-মনের প্রতি তন্তু। শুধু এই প্রার্থনা এল : এবার ঠাঁই দাও ঠাকুর—সব যে হারায় সেই না পায় তোমাকে—এবার পাওয়াও চরণ। বলতে না বলতে দেখি সামনেই ঠাকুর—হাতে বাঁশি মুখে হাসি ! বললেন : 'ওরে ভয় কি ? আমি কি নেই নাকি ?' ব্যস, তারপর আর কিছু মনে নেই—শুধু চোখে ঝাঁজ লাগছিল ব'লে চোখ ঢাকলাম দুহাতে—তাই বুঝি চোখ দুটো বেঁচে গেল। কিন্তু মুখপোড়া উপাধি দিলেন ঠাকুর অভিমান ভাঙতে। বলে না—নিঃস্ব যে হ'তে পারে সে-ই পায় বিশ্বকে ? আমি পেলাম বিশ্ব হারিয়ে বিশ্বের বিশ্বকে ! রূপ হারিয়ে পেলাম অরূপকে—রূপের রাসে !'

"চোখের জলে ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। বললাম : 'তারপর ?'

"ও বলল একগাল হেসে : 'এরও পর ? না না ঠিক বলেছেন দাদা, এই ঠাকুরটি আমার বড় সহজ পাত্র নন—এর পরে আছে কিছু। মা কালী তবু সংহার ক'রে ক্ষ্যামা দেন—কিন্তু আমার এই ঠাকুরটি তার পরেও পাড়েন উপসংহার। মাঝে মাঝেই এসে বলেন : ওরে, আমার কাছে যা হয় একটা বর চা না। যা চাইবি তাই পাবি। বল্ না কী চাস ? রোজ এমনি ক'রে দিক করেন ! বলুন তো দাদা, এর নাম কি উচিত ? তবে বোধ হয় ঠাকুর ভাবেন—নাকের বদলে যে নরুণ পায় সেও হয়ত নাকের শোক ভুলতে পারে না। রঙ্গ সে কত ঠাকুরের। নাছোড়বন্দ। এই বলেছিলেন কী জানেন ?—ওরে, আমার নামে বহু কলঙ্ক রটেছে—আমি নাকি ভক্তকে কেবল ভোগাই। তাই চাই তোকে দিয়ে প্রমাণ করতে যে আমি কেবল নিতেই দড় নই, দিতেও জানি। যা হয় একটা বর চেয়ে আমার মান বাঁচা, মুখ রাখ।"

"আমি হঠাৎ অমলকে বললাম : 'আচ্ছা যখন ঠাকুরের এতই সাধ—একটা কিছু বর চাইলেই বা !' ও অবাক্ হ'য়ে বলল : 'বর ? ভেবেই যে পাইনে দাদা !' আমার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল : কেন ! 'ঠাকুরকে বলা

মন্দ কি যে এ-পোড়ামুখ দেখে লোকে ছি ছি করে—লজ্জা দিও না।' ও খিলখিল ক'রে শিশুর হাসি হেসে বলে: 'বেশ বলেছেন দাদা। সত্যিই তো, তাঁকে যে পেল সে কেন দগ্ধানন হনুমান হবে?' বলতে বলতে ওর ফের ভাব এসে গেল, ও ফের বলে: 'এই যে ঠাকুর। ফে-র। আচ্ছা, বেশ এইবার চাইব বর—আমার নিজের জন্য নয়—পাঁচজনের চোখের বালি হ'য়ে আছি, সবাই বলে: দূর হ—ও কালা মুখ আর দেখতে পারিনে। কিন্তু পোড়া মুখে কি আর রং ধরাতে পারবে ঠাকুর—ঘোর কলিতে? দেখি তোমার কারিগরির দৌড়। কিন্তু সাবধান ঠাকুর! হেরে গেলে দেবই দেব দুয়ো।' বলে একটু চুপ করে থেকে ভাবমুখেই ব'লে চলে: 'কবে? সামনে জন্মাষ্টমী?...গঙ্গাস্নানের পর মুখ ঠিক হ'য়ে যাবে? বা বা বা! বেশ হবে! সেদিন থেকে ঘরে আয়না রাখব ফের।' ব'লে একটু পরে চাইল। না, একটিবার তাকিয়েই চোখ ঢাকল দুহাতে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝ'রে পড়ে অবিশ্রান্ত জলধারা!

"সাত আট দিন বাদেই জন্মাষ্টমী—ঠাকুরের জন্মদিন। কিন্তু আনন্দ করব কী—আমার মনে কেবলই সংশয় জাগে—এ কখনো হয়—এ যুগেও কি ঘটে এ-ধরণের অঘটন? পুরাকালে হয়ত ঘটত—*the age of miracles is past*—আবাল্য শুনে এসেছি বিলিতি পণ্ডিতমূর্খদের গবেষণা—যাঁরা সব কিছুকে বাঁধাধরার মধ্যে এনেছেন তাঁদের নির্ভুল বিজ্ঞানের সর্বজ্ঞ বুদ্ধির হুঙ্কার দিয়ে। মনে হতে থাকে—'এজাহার কার? কোথায় কে এক নাম-না-জানা স্কুলমাষ্টার সে হঠাৎ বলে চলেছে এ ও তা! আইনের ভাষায় বলা যায়—*We have only his word for it*, সত্যিই তো ভাবলাম আমি—'আমার কত বন্ধু আছেন ধুমধড়াক্কা জাঁহাবাজ সবজান্তা—নামডাক তাঁদের কত—কত চেলাচামুণ্ডা সৈন্য-সামন্ত—এঁরা কেউই দেখা পেলেন না যাঁর, তিনি স্বয়ং—বিশ্বরাজ—নধর নন্দ-গোপালটি হ'য়ে দিনের পর দিন আসছেন কিনা এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্কুলমাস্টারের কাছে প্রসাদের লোভে বর নিতে করছেন তাকে সাধাসাধি? আর সহজ বর নয় তো—পোড়ামুখ হ'য়ে উঠবে ফুল্লানন! দুর দুর এ কখনো হয়? কলিযুগে আকাশবাণী? সোনার পাথরবাটি?

"অথচ অবিশ্বাস করতেও বাধে। এ-লোকটি অখ্যাতনামা বটে কিন্তু কখনো মিথ্যা কথা বলেছে এমন প্রমাণও তো পাইনি? বরং অবিশ্বাসের এলাকায় যখন ও ছিল তখন পুজো করতে পর্যন্ত রাজি হয় নি—স্বচক্ষেই দেখেছি। কিন্তু তবু মন খুঁৎ খুঁৎ করে: যে ছিল জন্ম-অবিশ্বাসী তারি ভাগ্যে ঘটল কি না এমন দর্শনাতীত দর্শন যা মহামনীষী প্রতিভার বরপুত্রদের ভাগ্যেও ঘটে না? এ সব

মনে হ'ত অবশ্য সে-সময়ে যখন আমি ছিলাম আর পাঁচ-জনের মতনই অনভিজ্ঞ—না-পাওয়ার সাক্ষ্যই যাদের পরম পুঁজি। আজ জেনেছি এসব বিষয়ে একটু বেশি—যৎসামান্য সে জানা, তবু সেটুকুর সাক্ষ্যেই যে ঘটে গেছে আমার মধ্যে বিপ্লব। কারণ আমিও দেখেছি সম্প্রতি এমন অনেক কিছু যার কোনো তলই পাওয়া যায় না বুদ্ধি-বিচার জ্ঞান-প্রতিভা দিয়ে। যাক এ কথা—উচ্ছ্বাস মানায় না তোমাদের বুদ্ধিসংযত নিরেট আবহাওয়ায়। গল্পটাই বলি—বিশ্বাস করো বা না করো।"

বার্বারার মুখ লাল হ'য়ে উঠে। বলে: "কেন এ অযথা গঞ্জনা? আপনাকে বলি নি আপনাদের কথায় আমার বিশ্বাস হয়েছে!"

অসিত হেসে বলে: "আচ্ছা আচ্ছা! ক্ষমা। শোনো তা'হলে। কারণ এবার যা বলতে যাচ্ছি—আমার অনেক বন্ধুও পারে নি বিশ্বাস করতে। কী তপতী? বলি?"

তপতী মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।

অসিত নিশ্চিত মনে শুরু করে: "জন্মাষ্টমীর দিন সকালবেলা উঠেই ওর ওখানে গেলাম। দেখি—দোরে খিল। আস্তে ঘা মারলাম—কোনো সাড়া-শব্দ নেই। ওদিকে একটা জানালা খোলা ছিল—সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি ও পদ্মাসনে ব'সে—চোখ দিয়ে অবিরল ধারা ব'য়ে যাচ্ছে—সামনে জ্বলছে পঞ্চ-প্রদীপ—আর বিগ্রহটির পায়ের কাছে একটি রেকাবিতে গোল ক'রে সাজানো একতাল মোহনভোগ।" ব'লে বার্বারাকে: "আমরা এই ভাবেই ঠাকুরকে ভোগ দিই—পরে তুলে এনে খাই, কেননা ঠাকুর গ্রহণ করলেই ভোগ প্রসাদ ব'নে যায়।"

"ঠাকুর গ্রহণ করলেই—মানে?"

"তোমাদের বোঝানো মুশকিল। তবে এইটুকু জেনে রাখো ঠাকুরকে কোনো কিছু নিবেদন করলে ভক্ত ধ'রে নেন তিনি যাই কেন না গ্রহণ করুন—প্রসাদ ব'লে গণ্য হয়। কোনো ভোগ নিবেদন করার পরে, আমরা ধ'রে নিই—তিনি খেয়েছেন। অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে সচরাচর তিনি খান না বা ছোঁন না কিছুই। কেবল জনশ্রুতি—কখনো কখনো অতি বিরল ভক্তের ভোগ তিনি প্রত্যক্ষভাবে খান—যেমন কেক্ ভেঙে তোমরা খাও। এ যাত্রা ঘটল সেই বিরল অঘটন—এ আমার চোখে দেখা—আর সেই সব প্রথম শোনা-কথার চৌহদ্দি পেরিয়ে চোখে-দেখার এলাকায় পৌঁছলাম। শোনো—যদিও আমার বিজ্ঞ বন্ধুরা অনেকেই ব'লে বেড়ান বাঁকা হেসে—যে আমি সব বানিয়ে বলছি—যাক্।

"আমি একটু অপেক্ষা ক'রে জানালা থেকে ওকে ডাকতে যাব ভাবছি এমন সময়ে ও চোখ খুলে তাকালো। বিহ্বল দৃষ্টি। আমি তাকিয়ে রইলাম ঠায় ওর চোখের দিকে। একটু পরেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ও মৃদু হেসে উঠে টলতে টলতে দোর খুলল--আমি ঢুকতেই জড়িয়ে ধরল। বলল: 'দেখুন দাদা, দেখুন স্বচক্ষে। বলিনি—ঠাকুর বেজায় লোভী? এই মাত্র ভোগ দিতে না দিতে দেখুন কী কীর্তি! অর্ধেকেরো বেশি গেছে উবে!' বলে দেখালো আঙুল দিয়ে। জানালা থেকে দেখা যাচ্ছিল না, কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখি—কী কাণ্ড! গোল মোহনভোগের একটা দিকের প্রায় অর্ধেকটা কে খাব্‌লে খেয়ে গেছে—যেটুকু বাকি আছে তার এক ধারে অতি স্পষ্ট তিনটি আঙুলের দাগ—আর কচি শিশুর আঙুল—চার পাঁচ বছরের শিশুর! সে স্পষ্ট অথচ সরু খাঁজ ভুল করবার জো কী!"

বার্বারা অস্ফুট স্বরে চীৎকার ক'রে উঠল: "বলেন কি? সে ঘরে আর কেউ ঢোকে নি?"

অসিত হেসে বলে: "কে ঢুকতে যাবে? ওর চাকরি যাওয়ার পর থেকে ও একাহারী হ'য়েই দিন কাটাত। সারাদিন ঘরে দোর দিয়েই থাকত—সন্ধ্যে-বেলা বেরিয়ে অল্প কিছু খেয়েই আসত আমার কাছে। খাওয়া দাওয়া মেলামেশা হাসিগল্প করে না এমন মানুষকে পাঁচজনে পাগল না ঠাউরে করে কী? তার উপরে ওর মুখ দেখতে অতি কুৎসিত। ভয়ে প্রবীণরাই ওর ছায়া মাড়াত না—শিশুরা ওর কাছে আসবে কোন্ সাহসে? তাছাড়া নারীহীন মেসে কোথায় ছোট শিশু?—কী? তবু বিশ্বাস হচ্ছে না—এই তো? তাই না বলছিলাম—"

বার্বারার চোখে জল এল, ও বলল: "মিথ্যা বলব না—আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন একথা আপনার মুখ থেকে স্বকর্ণে না শুনলে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারতাম না। ভাবতাম রূপকথা—কি, বাড়িয়ে বলা—কিন্তু সে থাক, আপনি বলুন, থামবেন না—আমার তর সইছে না।"

অসিতের মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠল, ও বলল: "তারপর আমরা দুজনে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। অমলের পা টলছিল—তাই আমি ধরলাম ওর কোমর। ও হঠাৎ হেসে বলল: দাদা অমন ক'রে ধোরো না তাই ব'লে—দুর্নামের তা' হলে অন্ত থাকবে না, সবাই বলবে—দেখ্ দেখ্—মদ খেয়ে এসেছেন বোষ্টম গঙ্গাস্নান করতে!' ব'লেই বলল: 'দাদা গাওনা গানটি—সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী ব'লে! কেবল ঠাকুরটি আমায় মাতাল করেন

মদ খাইয়ে না—প্রসাদ দিয়ে—কেমন? ঠিক বলিনি?' ব'লেই খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে ফের।

অসিত বলল: "সে যেন আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই অপূর্ব ভাদ্রের গঙ্গার শোভা—বর্ষার পরে দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে। ঘাটে যেতে না যেতে সেই প্রাণকাড়া শাঁখ ঘণ্টা—এদিকে একদল লোক গাইছে:

জয় কৃষ্ণকেশব রামরাঘব কৃষ্ণকেশব রাম,

জয় মধুর মোহন পতিত পাবন কান্তিময় ঘনশ্যাম।

'ওদিক থেকে ভেসে আসছে ধূপের গন্ধ! ঘাটের উপরেই ছিল কৃষ্ণমন্দির সেখান থেকে কাঁসর ঘণ্টার ডঙ্কা ভেসে আসছে অবিশ্রাম। প্রাণ যেন উজিয়ে উঠল। তবু এমনিই মানুষের মন—যে এ-দৈব প্রসাদ পাওয়ার পরেও কেমন যেন ভয় ভয় করে। সংশয় কেটেও কাটে না। ভাবি—যদি ঠাকুরের বর দিতে চাওয়ার কথা ওর কল্পনা হয়?—যা হোক দুজনে ডুব দিয়ে উঠতেই চমকে গেলাম—মনের দারুণ পাষাণ-ভার পালকের মত হাল্কা হ'য়ে গেল। অভাবনীয় ব্যাপার!—ওর মুখের ধবলতা আদৌ নেই, কয়েকটা রেখা পড়েছিল তাও মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে! সেই আগের নির্মল অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী। ওকে জড়িয়ে ধরলাম: 'ধন্য অমল!' ও কিন্তু সত্যিই ভুলে গিয়েছিল বরের কথা। বলল: 'কী হয়েছে?' বললাম: 'তোমার মুখ ঠিক হয়ে গেছে!' ও শিশুর মত হাততালি দিয়ে উঠেই ঘাটের এক চন্দনদাতার ছাউনি থেকে আয়না নিয়ে মুখ দেখেই ঊর্ধ্ববাহু হ'য়ে নাচ শুরু করে দিল: 'ধন্য ঠাকুর, ধন্য, ধন্য!' ঘাটে লোক জ'মে গেল। কেউ কেউ ওকে দেখেছিল একটু আগে, তারা সসম্ভ্রমে বলাবলি করতে লাগল। কিন্তু ওর ভ্রূক্ষেপও নেই। ফের ছুটে গিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে স্তব ধরল গাঢ় কণ্ঠে:

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব

ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব

ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব!'

বার্বারা বিস্ফারিত নেত্রে বলল: "মুখ একেবারে ঠিক হ'য়ে গেল?"

অসিত বলল: "নৈলে বলছি কী? যদিও বলতে বাধে—কারণ নিজে বিশ্বাস করতে চেয়েও বিশ্বাস করতে পারিনি স্বচক্ষে দেখবার আগে—সে-বস্তু তোমরা বিশ্বাস করবে কী ক'রে—শুধু শোনা কথার 'পরে ভর ক'রে?

বার্বারা বলল: "বিশ্বাস আমি করেছি, বিশ্বাস করুন। জানেন? আমারে

কিছুদিন থেকে লোকজন হাসি-গল্প সাজসজ্জা কিছুই ভালো লাগে না। মাস তিনেক চেষ্টা ক'রে এক সখীর কল্যাণে ইতালিতে এক কারমেলাইট কনভেণ্টে ঠাই পেয়েছি অবশেষে: এই মাসের শেষেই যাব চ'লে রোমে—সংসারে আর ফিরব না।"

অসিত বলল: "এ কথা তো বলো নি এতক্ষণ?"

বার্বারা সস্মিত-মুখে বলল: "বললে হয়ত আপনিও বিশ্বাস করতেন না। অবশ্য মুখে কিছু বলতেন না। কিন্তু মনে হয়ত ভাবতেন—তুব্! আমেরিকান মেয়েও নাকি আবার ইতালির কনভেণ্টে বিবাগী হ'তে চায়—নিউইয়র্কের রং-মহল ছেড়ে।"

অসিত হেসে বলল: "এক হাত নিয়েছ, মানছি। আর এখন আন্দাজ করতে পারছি—কেন তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করো নি।"

বার্বারা বলল: "কিন্তু গল্পটা যে শেষ হয়নি এখনো।

অসিত বলল: "উনশেষ। আর বেশি কিছু বলার নেই। সেদিন সন্ধ্যায় যখন ওর ঘরে গেলাম—ঘর শূন্য। মেসের দারোয়ান আমার হাতে একটি চিঠি দিল। তাতে শুধু লেখা: দাদা চললাম। গুরুদেব বললেন—সময় হয়েছে। বৃন্দাবনে যদি কখনো যান—দেখা হবে। আর যদি নাও যান মনে রাখবেন যে একজন আপনার জন্যে প্রার্থনা করবে সেখানে ব'সে—যেন আপনিও সেই মণির মণি পান যা আমি পেয়েছি—না চাইতে। কেবল আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি দরদ। আর আপনার গান শুনে বুঝেছি আপনি আমি এক পথেরি পথিক। ছোট ভাইকে ভুলবেন না।"

বার্বারার দু-চোখে জল চিক্ চিক্ ক'রে উঠল, নত হয়ে অভিবাদন ক'রে বলল: "আমার জন্যেও আপনি ঐ প্রার্থনাই করবেন, আর...আর ছোট বোনকে ভুলবেন না—দাদা বলবার অধিকার দিচ্ছেন তো?

সেদিন যা ঘটল তাকে খানিকটা অভাবনীয় না ব'লে উপায় কি? নিউইয়র্কের এক মস্ত বণিক্ হলে গাইল অসিত ও নাচল তপতী। এ-হলে ফী মাসে নাকি বসে শান্তি সভার বৈঠক—মানে অশান্তরা করেন শান্তির জন্যে হাজারো বিতণ্ডা, বলেন খাসা খাসা কথা—সাক্ষাৎ ঈশার বাণী: "Blessed are the meek: for they shall inherit the earth... Blessed are the peace-makers: for they shall be called the children of God" ইত্যাদি। এ-হেন হাটে নৃত্য-গীত? তবে যাঁর ইচ্ছায় কর্ম সেই ক্রোরপতি কর্তা যখন নিজে এগিয়ে এসে দায়িত্ব নিলেন, বললেন টেবিল চাপড়ে: "মনে শান্তি আনতে নৃত্যগীতের মতন দূতী—বুঝলে কিনা?"—তখন বাকিসবাই জয়ধ্বনি ক'রে বলবেন না কেন: "হ্যাঁ তা বটেই তো!"

পরিণাম—অনুমেয়: শান্তিবাদীরা ঘটা ক'রে শিল্পের শান্তি-সভা বসালেন বাদবিতণ্ডার কুরুক্ষেত্রে। গানান্তে একটি কাফেতে ব'সে শিষ্যা তপতী বলল গুরু অসিতকে: "একটা কাজের মতনকাজ হ'ল বটে—এদেশে এসে এদের নিয়ম-ভাঙা, ভাবো দাদা!"

শ্রীমতী বার্বারা ছিল পাশে—কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে পাত্রটি সরিয়ে রেখে হাসিমুখে বলল: "শুধু কি নিয়ম-ভাঙা! কেমন টুক ক'রে শঙ্করাচার্যের সম্বন্ধেও বেশ দু-কথা ব'লে নিলেন! দাদার উপস্থিত-বুদ্ধি আছে।"

অসিত হেসে বলল: "মন্দের ভালো। সাংসারিক বুদ্ধি যার লুপ্তপ্রায়—অন্তত আমার সুবুদ্ধি বন্ধুরা এ-বিষয়ে সবাই একমত—তার একটু উপস্থিতবুদ্ধিও যদি না থাকে—তবে সে বেচারি ক'রে খায় কিসের জোরে?"

বার্বারা টপ্‌ ক'রে বলল: "আমাদের এমার্সন বলেছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা: 'সব ক্ষতির উল্টো পিঠেই একটা না একটা ক্ষতিপূরণ থাকে'।" ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে: "কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগছে দাদা! আপনি শঙ্করাচার্যের 'শিবোহং শিবোহং' গাইবার আগে আপনার ভূমিকা-ভাষণে বলেছিলেন যে, এ-ধরণের উপলব্ধি যাদের লাভ হয় তাঁরা সেই সঙ্গে লাভ করেন একরকম নিশ্চিন্তি যার মূলে আছে এই অটল প্রত্যয় যে, ভগবান তাঁদের ভার নিয়েছেন—পুরোপুরি। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এ-কথার স্বপক্ষে জীবনের 'কোনো এজাহার আছে কি না—অর্থাৎ আপনি নিজে এ-রকম কোনো

মানুষ চাক্ষুষ করেছেন কিনা যিনি শুধু যে বিশ্বাস করেন ভগবান তাঁর সব ভার নিয়েছেন তাই নয়—নিজের সর্বস্ব সে-বিশ্বাসের কাছে সমর্পণ ক'রে ভগবানের কৃপায় উত্তীর্ণ হয়েছেন দৈনন্দিন জীবন-পরীক্ষায় ?"

অসিত একটু হেসে বলল : "তোমার প্রশ্নটি সরল হ'লেও উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ নয়। কারণ যদিও এ-রকম সাধু আমি দেখেছি একাধিক ও পেয়েছি তাঁদের আশীর্বাদ, কিন্তু কৃপা কথাটা টেনে এনে তুমি যে সব ঘুলিয়ে দিলে। কেন না যে-শ্রেণীর এজাহারকে সাধুরা কৃপার দান ব'লে প্রত্যক্ষ দেখতে পান অপরে তাকে বলবে ভাববিলাস বা যোগাযোগ—যাকে তোমরা চলতি কথায় ভিশমিশ ক'রে দাও অটোসাজেস্‌চন বা কোয়েন্সিডেন্স ব'লে।"

বার্বারা বলল : "আমি নাস্তিকদের কথা বলছি না দাদা, বলছি সেই জাতের মানুষের কথা—যাদের মধ্যে আমি পড়ি আশাকরি—যাঁরা বিশ্বাস করতে চায়—কিন্তু ধরুন পায়ের নিচে খানিকটা মাটি না পেলে—"

অসিত বলল : "ও! এবার বুঝেছি তোমার কোথায় বাধছে।" ব'লে তপতীর দিকে তাকিয়ে বলে : "কী ? বলব নাকি ওকে শ্যামঠাকুরের কথা ?"

তপতী সায় দিয়ে বলল : "বলো, ও সত্যিই জিজ্ঞাসু—হ্যাঁ হ্যাঁ—ও অবিশ্বাস করবে না—ভেবো না।"

অসিত কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বার্বারার দিকে চেয়ে একটু হেসেই গম্ভীর হ'য়ে বলল : "তোমাকে সেদিন বলেছিলাম অমল নামে এক নবীন সাধকের কথা। আজ বলব এক প্রবীণ ভক্তের কথা। এঁর কথা আমি প্রথম শুনি অমলের কাছেই। তাঁর পুরো নাম—শ্যামলাল চক্রবর্তী—পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁর ভক্ত অনুরাগীরা তাঁকে ডাকত শ্যামঠাকুর ব'লে। অমলের কাছে তাঁর বিচিত্র জীবনের কিছু কিঞ্চিৎ শুনে অবধি এ-নমস্য মানুষটিকে দেখার জন্যে আমি উৎসুক ছিলাম। কিন্তু তাঁর নাম জানলেও ধাম জানা ছিল না। এমনি সময়ে একদিন দেখা হ'য়ে গেল একেবারে হঠাৎ—কী ভাবে বলি।"

থেমে কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত একটু ভাবে, তারপর বলে : "না, বাদ দেব না—গোড়া থেকেই শুরু করি।

"হ'ল কি, কাশীতে হিন্দুমহাসভার এক অধিবেশনে আমার নিমন্ত্রণ এল—গাইতে হবে ভজন। আমি ধরলাম প্রথমে তুলসীদাসের বিখ্যাত ভজন :

'তু দয়াল—দীন হুঁ, তু দানি—ময় ভিখারী।
ময় প্রসিদ্ধ পাতকী—তু পাপপুঞ্জহারী।'

"সে সময়ে মনটা ছিল বৈরাগ্যের উঁচু তারে বাঁধা। গুরুদেব স্বামী স্বয়মা-

নন্দকে কাশ্মীরে তাঁর আশ্রমে সবে দর্শন ক'রে ফিরেছি। বাঁশি শুনেছি—আয় রে আয়, সব ছেড়ে ভগবানের শরণ নে, ভয় নেই নেই নেই।' সাধ জেগেছে বৈকি—কিন্তু সাধ্য কই? ভয় করে যে! খতিয়ে শুধু আত্মগ্লানিই ওঠে ফেঁপে। ক্ষতিপূরণ মিলল গানে। যেই অনুশোচনার ধুয়োয় ফিরে আসি—কণ্ঠের সুরে মন দেয় দোয়ার—ঠাকুর, হলামই বা আমি পতিত—তুমি তো পতিতপাবন—জোর ক'রে টেনে নাও রাঙা পায়—আমি কি পারি? ফলে বুকে জেগে ওঠে ভাব, চোখে জল। নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে যে এত সুখ পাওয়া যায় কে জানত?

"গান শেষ হ'তে না হ'তে তুমুল জয়ধ্বনি—আর একটা, আর একটা! পাশের এক গম্ভীরানন সাধু বললেন: 'একটি গুরুবন্দনা গাইবেন?' আমি ধ'রে দিলাম মীরা-ভজন:

"গুরুচরণসঙ্গ লাগী মীরা রাতী রঙ্গ কনহাঈ।
জনম জনমকী টুটী প্রভুসঙ্গ সৎগুরু আন মিলাঈ॥"

"যত গাই মনে পড়ে গুরুদেবের প্রশান্ত উজ্জ্বল মুখ। ফিরে ফিরে গাই আস্থায়ী—জন্মে জন্মে যাকে চেয়েছি পাইনি—সেই হারিয়ে-যাওয়া হরির রঙে কবে মনপ্রাণ উঠবে রঙিয়ে—গুরু মিলিয়ে দেবেন ইষ্টকে?

"গানের পর সেই সাধুটিই উঠলেন বক্তৃতা দিতে। মাঝপথে আমি উঠে চ'লে এলাম। কেবল মনে হয়—'কথা কথা কথা!—বস্তুলাভ হবে কবে?'

"বাইরে আসার পথে সাদা-কাপড-পরা সৌম্যমূর্তি একটি মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স চল্লিশ হবে—চোখভরা জল, এসেই আমার দুহাত চেপে ধরলেন: 'আহা কী গানই গাইলে ভাই।—ভাগ্যবান্ তুমি—একটু ভাব করতে চাই তোমার সঙ্গে—যদি রাগ না করো—তাছাড়া তোমার সময় হবে কি?' প্রথম দেখাতেই 'তুমি'—'ভাই'! মানুষটির সরল হৃদ্যতায় আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। কুণ্ঠিত হেসে বললাম: 'বিলক্ষণ! আমি কী এমন রাজকাজে ব্যস্ত—' তিনি বললেন: 'না না, তুমি ব্যস্ত নও তো ব্যস্ত কে? কত সভা সমিতিতে তোমার ডাক—তোমার খবর আমি কিছু রাখি যে ভাই! অমল আমাকে মাঝে মাঝেই লিখত।'

'অমল! তাকে আপনি—?' তিনি হেসে বললেন: 'বিলক্ষণ! তার মা ছিল আমার জেঠতুত বোন।' আমি উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম: 'বাঃ! তবে চলুন, বাইরে কোথাও বসা যাক। এখানে আর টিঁকতে পারছি নে। যে গরম! তার উপরে লাউড স্পীকারে গীতার 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী' পাঠ—মৌনীই বটে! বলুন দেখি—রক্ত-মাংসের শরীর তো!"

"ভদ্রলোক হা হা ক'রে হেসে উঠলেন—প্রাণ খোলা হাসি: 'যা বলেছ ভাই? তাছাড়া এরা ভুল করে কোথায় বলব? বক্তৃতা যদি দিতেই হয় তবে দে না বাবা, গানের আগে। গানের পরে কি বক্তৃতা জমে? পরমহংসদেব কী বলেছিলেন মনে নেই...যখন গিরিশবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, চৈতন্য চরিতের পর বিবাহ বিভ্রাট অভিনয় দেখবেন কি না—এ কী করলে? পায়েসের পর নিমঝোল! হা হা হা!'

"কী চমৎকার যে লাগল তাঁর সেই মুক্ত হাসি—অথচ তখনো সেই গুরু-বন্দনার গান শুনে-উথলে-ওঠা চোখের জল শুকিয়ে যায় নি!

"কিন্তু ততক্ষণে আমরা সোজা রাস্তায় নেমে এসেছি। কোথায় বসা যায়?—এদিক ওদিক চাইছি একটা চায়ের দোকানের খোঁজে, এমন সময়ে তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দনের মতনই টুপ্ ক'রে বললেন: 'আমার বাসা এই মোড়টার পরেই—আসবে? ঐ বেলা পাঁচটা বেজেছে ঢং ঢং ক'রে—বলি, একটু চা হ'লে কেমন হয়? খাও তো?'

"আমি একগাল হেসে বললাম: 'বিলক্ষণ! জানেন দাদা, আমি বিখ্যাত ডি, এল, রায়ের চা-স্তুতি করি ত্রি সন্ধ্যা?' ব'লেই গুন-গুন ক'রে ধ'রে দিলাম:

'অসার সংসার, কে বা বলো কার—দারা সুত বাপ মা?

(এ) অসার জগতে যাহা কিছু সার—সে ঐ এক পেয়ালা চা—চা—চা।'

"ভদ্রলোকের সে কী হাসি। আমার পিঠ চাপড়ে বললেন: 'তুই ভাইয়ের এবার জমবে ভালো। বৈরাগ্যের সঙ্গে রসিকতা ..যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ, বলে না শাস্ত্রে?'

"আমি পথ চলতে চলতে বললাম: 'বলে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের প্রসঙ্গটা আমার বেলা না তুললেই ছিল ভালো। শাস্ত্রে তো 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্'-ও বলে, কিন্তু আমার যে ও-অভয়ের কথা মুখে আনতেও ভয় করে দাদা—কী নাম দাদার—এবার বলবার সময় হ'ল যে!'

"তিনি বললেন: 'শ্যামলাল চক্রবর্তী।' আমি চমকে উঠলাম: 'বলেন কি?' সাক্ষাৎ শ্যামঠাকুর?"

'হা হা হা! জানোই তো ভাই, আমাদের দেশের ভক্তদের কাণ্ড, কথায় কথায় ঠাকুর—অলিতে গলিতে অবতার! তুমি আমাকে নাম ধ'রেই ডেকো।'

"আমি ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম: 'আর অপরাধ বাড়াবেন না। এমন সাধুর সঙ্গে কি না এতক্ষণ প্রগল্‌ভতা ক'রে এসেছি—না না দাদা, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, পুলিশ চেনে চোর। আপনি এক কথায়

সব ছেড়ে আকাশবৃত্তি নিলেন—আর আমি সব জেনে শুনেও মিথ্যে সভায় সভায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছি—কোথায় আপনি আর কোথায় আমি !'

"বলতে বলতে তাঁর বাসায়। ছোট্ট বাসা—মাত্র তিনটি ঘর। একটি শ্যামঠাকুরের পুজোর ঘর, একটিতে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে থাকে, আর একটি বৈঠকখানাও বটে, খাবার ঘরও বটে। বাসাটি ছোট কিন্তু এমন পরিচ্ছন্ন যে বসতে না বসতে মনে একটা শান্তির ভাব ছেয়ে গেল। পাশের ঘর থেকে পবিত্র ধূপের গন্ধে মন কেমন যেন আরো উদাস হ'য়ে গেল।

"আমরা এ-কথা সে-কথা বলছি—এমন সময় দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে একটি মেয়ের প্রবেশ। শ্যামঠাকুর বলেন: 'আমার মেয়ে অন্নপূর্ণা। প্রণাম কর্ অন্নু—ইনিই সেই অসিতবাবু।'

সুদর্শনা ষোড়শী প্রণাম ক'রে চোখ বড় বড় ক'রে সসম্ভ্রমে বলল: 'অমলদার—'

হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ভিতরে নরম সাধু বাইরে গরম বাবু—বড় সহজ যোগাযোগ নয়! ব'লেই ফের হো হো ক'রে সেই প্রাণখোলা হাসি!

অসিত কফির দ্বিতীয় পেয়ালা নিঃশেষ ক'রে ব'লে চলে:

"এই হ'ল শ্যামঠাকুরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সেবার কাশীতে দু-তিন দিনের আমন্ত্রণে এসে দিন পনের কাটিয়ে গেলাম এঁরই টানে। কী চমৎকার যে কথা বলতেন তিনি! আর গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গেও ভাবকে গাঢ় রেখে হালকা সুরে বলবার সে কী অপূর্ব প্রতিভা! তার সঙ্গে নির্মল চরিত্র। আত্মাভিমান নেই, অথচ জোর দিয়ে কথা বলতে পারে এমন সাধু তখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি। সত্যি, একটি আশ্চর্য মানুষ!

"আশ্চর্য মানুষ গরম বাবুদের সমাজেও কখনো কখনো চোখে পড়ে, কিন্তু বৈরাগীদের মণ্ডলীতে এ-ধরণের উজ্জ্বল জোরালো ব্যক্তিত্ব বড় বেশি চোখে পড়েনি আমার। ব্যক্তিত্ব বলতে এখানে আমি চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি না। দুর্দান্তদের মধ্যেও তো এধরণের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় অনেক সময়েই। আমি বলছি—তাঁর ভাববার ভঙ্গি, কথা কইবার ঢঙ—বিশেষ করে তর্ক-সমাধানের বিশিষ্ট প্রবণতার কথা—পুঁথি-পড়া জ্ঞান আর ভাগবত ভাবধারা থেকে পাওয়া আন্তর শক্তি—এ দুইয়ের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। এমন কি মস্ত শিল্পপ্রতিভার শক্তিও ভাবগত চিত্তবলের সগোত্র নয়। ও আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু এ দেয় ভরসা।

বার্বারা বলিল: "ঠিক বুঝলাম না, কথাটা।"

অসিত বলল: "ব্যাখ্যা করে বোঝানো একটু কঠিন। কিন্তু শ্যামাঠাকুরের ছবিটি আরো একটু স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তুললে হয়ত বুঝতে পারবে ভাগবত শক্তির কাছ থেকে সাধুরা যে খোরাক পান তার ফলে তাঁরা রাতারাতি কী রকম বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেন। তাঁর ঐ আকাশবৃত্তির ইতিহাস একটু বললে হয়ত এ-কথাটা আপনা থেকেই সুবোধ্য হ'য়ে উঠবে।"

বার্বারা বলল: "আকাশবৃত্তি কথাটি মাঝে একদিন আমি দিদির কাছে শুনেছি নিরালায়। যাঁরা ভগবানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করেন — না?"

"না না। ভগবানের উপর নির্ভর তো অনেক সাধকই করেন। কিন্তু আকাশবৃত্তি যাঁরা অবলম্বন করেন তাঁদের নির্ভরেব আছে একটি বিশেষ ভঙ্গি। আমাদের দেশে অনেক সাধুই আছেন যাঁরা ভিক্ষে ক'রে দিন কাটান। কিন্তু শুধু ভিক্ষা ক'রে জীবিকা নির্বাহ করলেই তাকে আকাশবৃত্তি বলা যায় না আকাশবৃত্তি হল হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকা—ভিক্ষা করব না, কেউ কিছু নিজে থেকে দিলে নেব নিরভিমানে—অথচ কারুর কাছেই কিছু চাইব না তো বটেই, ঘুণাক্ষরেও কোন অভাবের কথা কাউকে জানাব না—এই ত্রিবিধ পণ নেওয়ার নামই আকাশবৃত্তি। আমাদের দেশে রামপ্রসাদ ব'লে এক মস্ত সাধক ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন কিনা কেউ নিশ্চিন্ত ক'রে বলতে পারে না, কিন্তু তাঁর একটি গানে এই বৃত্তির মনোভাবের এমনই একটি নিখুঁত ছবি আছে যে, আমার মনে হয় তাঁর সাধনার একটি স্টেজে তিনি এই আকাশবৃত্তিকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। নৈলে তিনি আকাশবৃত্তির প্রাণের কথাটি এমন অপরূপ শ্লোকে ফোটাতে পারতেন না:

'প্রসাদ বলে ভবার্ণবে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা,
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।'

কিন্তু ব্যাখ্যা রেখে তাঁর জীবনীর পাট বসাই তাহলে বুঝবে কী বিচিত্র ছিল শ্যামঠাকুরের চলন-বলন তথা অভয়বাণী।"

কফির শেষে পেয়ালাটি নিঃশেষ ক'রে অসিত খেই ধরল:

"এই দিন পনের ধরতে গেল আমি তাঁর ওখানেই ছিলাম। কেবল রাতে শুতে যেতাম নিজের ঘরে—গঙ্গাতীরে একটি ঘর পেয়ে গিয়েছিলাম বিখ্যাত ধনী শিউপ্রসাদ গুপ্তের প্রাসাদে। তবে তিনি আমার দেখা খুব কমই পেতেন—আমি ত্রিসন্ধ্যা কাটাতাম শ্যামঠাকুরের বৈঠকখানায়, আর মুগ্ধ হ'য়ে

শুনতাম তাঁর কথা পাঠ ঠাট্টাতামাশা উপমা—কেউ টিল মারলে পাটকেলটি ফিরিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ বলি তাঁর চরিত্রের এই দিকটার কথা—বলবার ম'ত বৈ কি।"

ব'লে অসিত নিজের মনেই একটু হেসে শুরু করল: "একদিন এক সভায় তিনি কথকতা করছেন—ভাগবত থেকে শ্রীদামের উপাখ্যান নিয়ে। শ্রীদাম ছিল কৃষ্ণের বাল্যবন্ধু, গুরুভাই। পরম ধার্মিক, কৃষ্ণভক্ত, কিন্তু অতি দরিদ্র। স্ত্রী বললেন—কৃষ্ণ তো দ্বারকার রাজা, তাঁর কাছে গিয়ে বলো দুঃখের কথা। শ্রীদাম ভেবেই সারা—ঠাকুরের কাছে গিয়ে ঐহিক প্রার্থনা করবে কী ক'রে—ভক্তি না চেয়ে? কিন্তু স্ত্রীর উপরোধে শেষে বাধ্য হ'য়ে রাজি হতে হ'ল। দ্বারকায় গেল ভাবতে ভাবতে। কিন্তু গেলে হবে কি, বাল্যবন্ধুর প্রাসাদে পৌঁছে তাঁর কাছে আশাতীত আদর পাওয়া সত্ত্বেও অভাবের কথা জানাতে পারল না—ভক্তিতেই রইল বিহ্বল হ'য়ে। কৃষ্ণ অন্তর্যামী—সবই বুঝলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না নির্লোভ সরল ভক্ত বন্ধুকে। সে গ্রামে ফিরে এসে—অবাক্! দেখে কি, তার কুঁড়েঘরটি হ'য়ে গেছে প্রাসাদ, দরিদ্র রাতারাতি ব'নে গেল জমিদার। এই হ'ল গল্প—একে নানা উপমা, ব্যাখ্যা ও গান দিয়ে ফলাও ক'রে শ্যামঠাকুর এমন অপূর্ব কথকতা করলেন যে অনেকেই চোখে জল রাখতে পারল না।

"এখানে একটু টীকা করতে হবে। এই সব পাঠের পরে শ্রোতারা কথককে সময়ে সময়ে প্রশ্ন ক'রে থাকেন। অনেক সভায় আসেন বাহাদুর একেলে শ্রোতা—মজা দেখতে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গায়ে প'ড়ে অধ্যাপককে কোণঠাসা করতে চান উকিলি ঢঙে। এঁরা হলেন মডার্ন আলোকপ্রাপ্ত, তাই সাধুকে লোকে সম্মান করছে দেখলে সইতে পারেন না। সিনেমা তারকার অটোগ্রাফ পেতে এঁদের উৎসাহের অবধি নেই, কিন্তু সাধু? ওরা যে মেকি টাকা—সায়েন্স সব ধ'রে ফেলেছে, এই ভাব আর কি!

"হবি তো হ, সেদিনও সভায় উপস্থিত ছিলেন এই জাতেরি এক কালাপাহাড়—এক নামজাদা নব্যশিক্ষিত বিলেত-ফেরত জমিদার। কাহিনী শেষ হ'তেই তিনি উচ্চাঙ্গের মুচকি হাসি হেসে, তার মোসাহেবদের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'ওহে, বড় ভুল হয়ে গেছে! কলেজে প্রফেসররা যদি এই সোজা পথটি বাৎলে দিতেন তবে মুখ বুঁজে ভক্ত হ'য়ে কেল্লা ফতে করতে পারতাম—শুধু সর্বদুঃখহরা কৃষ্ণ নাম নিয়ে নিখরচায় পায়ের উপর পা দিয়ে দিব্যি ব'সে ব'সে খাওয়া যেত। জমিদারির এত হাঙ্গামা পোহাতে হ'ত না।'

"শ্যামঠাকুর তৎক্ষণাৎ মুচকি হাসির প্রতিদান দিয়ে জবাব দিলেন: 'ভুল না

লক্ষ্মী, মশাই: বড বাঁচাটাই বেঁচে গেছেন। কারণ ভূতের শ্রীমুখে রামনাম ফুটতে না ফুটতে লেগে যেত ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ—যা আছে বারো ভূতে লুটে পুটে খেত—মোসাহেব বেচারিরা হ'তেন নিরন্ন।

"সভাশুদ্ধু লোক হো হো ক'রে হেসে উঠল। জমিদারবাবুর মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল। তিনি উঠে গেলেন। একটু বাদে ফিরে এসে গম্ভীর হ'য়ে বসলেন শ্যামঠাকুরের সামনে। তখন তিনি সুন্দর ক'রে উপমার পর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন ভক্তির মানে কী। শেষে বললেন: অনেকের মনে একটি ভুল ধারণ যে ভক্তি বলতে বোঝায় শুধু হৃদয়াবেগ বা শূন্য উচ্ছ্বাস। কিন্তু ভক্তি অত সস্তা নয়—সাধনায় তাকে মেলে না। মেলে শুধু ঠাকুরের কৃপায়—আর কেবল তখনই যখন সাধক 'আমার আমার' জ্ঞান থেকে পৌঁছোন 'তোমার তোমার' ভাবে। দাদূর একটি শ্লোকে আছে:

তেরা তেরা—ন কছু হমারা
মেরা মেরা কহত গঁওয়ারা

মানে—ভক্ত বলেন সবই তেরা তেরা—কিনা তোমার তোমার—মেরা মেরা কিনা আমার আমার করে—যারা অজ্ঞান। গুরু নানকের জীবনের একটি কাহিনী মনে পড়ল, বলি শুনুন। বড় সুন্দর।

'গুরু নানকের বয়স যখন ন-দশ বৎসর তখন তাঁর বাপ তাঁকে দোকানে রেখে কোথায় গিয়েছিলেন খানিকক্ষণের জন্যে। বালক চাল ডাল নুন তেল বিক্রি করতে ব'সে—এমন সময় একটি ক্রেতা এসে চাইল পনের না ষোলো কুনকে চাল। বালক নানক এক দো তিন...ক'রে মাপতে মাপতে তের কুনকে গুনতেই আর গুনতে পারে না, ভাবাবেগে ব'লে চলেন—তেরা তেরা তেরা তেরা—কুনকের পর কুনকে ক্রেতার ঝুলিতে ঢেলে চলেছেন কিন্তু মুখে শুধু ঐ এক তেরা তেরা তেরা শব্দ। ক্রেতা তো অবাক্ এহেন ভক্তির ভাবাবেশ দেখে।'

"জমিদারবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বললেন: 'বুঝলাম ঠাকুর, কিন্তু আপনার যদি এমন একটি কুলতিলক থাকত তবে নিশ্চয়ই তার উপর দোকানের ভার দিয়ে কোথাও যেতে ভরসা পেতেন না, পেতেন কি?"

"শ্যামঠাকুরের পিঠপিঠ জবাব: 'জানি না বাবুমশাই, কারণ অর্বাচীনে ভুল করেই। তবে যেটা জানি সেটি এই যে, আমি এ-ভুল করলেও আপনি ভুল ক'রে আর কোনো দোকানে যেতেন না, যেতেন কি?'

"জমিদারবাবু ভ্রূকুটি ক'রে বললেন: 'মানে?'

"শ্যামঠাকুর একগাল হেসে বললেন: 'তাও কি খুলে বলতে হবে?—

অর্বাচীনের তেরা তেরা-র দোয়ার দিয়ে মেরা মেরা বলতে বলতে বোকার ঝুলি খালি ক'রে নিজের ঝুলি ভ'রে নিতেন, হিসেব দিতে হ'ত না'?"

বার্বারা হেসে গড়িয়ে পড়ে: "কী কাণ্ড!"

অসিত বলল: "রোসো, গল্প এখনো শেষ হয়নি।"

"সভার মধ্যে আবার হাসির রোল উঠল। শুনতে পেলাম এখানে ওখানে দু'চার জন বলাবলি করছে: 'জমেছে রে জমেছে—নারদ নারদ! জমিদারবাবু গুম্ হ'য়ে ব'সে রইলেন। খানিক বাদে শ্যামঠাকুর ভক্তিযোগ ছেড়ে গীতার কর্মযোগ সম্বন্ধে বলা শুরু করলেন। নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সকাম কর্মের তফাৎ কোথায় সবে অবতারণা করেছেন, এমন সময় জমিদারবাবু ঠাট্টা ছেড়ে হলেন চড়াও, ঝাঁজালো সুরে বললেন: 'ওসব বাজে কথা মশায়, নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে র‍্যাংক ননসেন্স। আপনি সাধু হ'য়েও এখানে পাঠ করতে এসেছেন নিষ্কাম হ'য়ে, না প্যালা হাতাতে? তাই ওসব ন্যাকামি রেখে বলুন একটু জ্ঞানের কথা—যার আগুন সব কর্মকে ভস্মসাৎ করে—এ আমার কথা নয়, আপনার ঐ গীতারই কথা। শুধু কর্মে শানায় না, জ্ঞান চাই, শক্তি চাই ঠাকুর! বলুন গীতার পুরুষোত্তম যোগ সম্বন্ধে কিছু—যদি জানেন অবিশ্যি। আমি জানতে চাই গীতাকার কী বলতে চেয়েছেন যখন বললেন ক্ষর অক্ষরের পারে পুরুষোত্তম দাঁড়িয়ে। সগুণ নির্গুণ বুঝি, কিন্তু এ-দুয়েরো পরে আবার বিরাজমান কোন্ অদ্ভুত?—এই আমার প্রশ্ন—উত্তর দিন, যদি পারেন অবিশ্যি।"

"সভার সবাই খুব উজিয়ে উঠল—এ যে জমারো বাড়া, প্রায় দাঙ্গাহাঙ্গামা। তাঁর মোসাহেবরা উঠল জয়ধ্বনি ক'রে।

"শ্যামঠাকুর কিন্তু নির্বিকার, বললেন: 'একটু ভুল হ'ল বাবুমশাই। এ আপনার প্রশ্নই নয়। যদি হ'ত—তবে আমি জবাব দিতাম।'

"জমিদারবাবু হকচকিয়ে গেলেন: 'আমার প্রশ্নই নয়—মানে!'

"শ্যামঠাকুর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন: 'মানে—যার তেষ্টা পেয়েছে সে ছাতু খোঁজে না, খোঁজে জল। যার ভালুকে জ্বর এসেছে সে পুকুর খোঁজে না, খোঁজে লেপ। জ্ঞানীরা হ'লেন আসলে বৈদ্য, অভাব বুঝেই ব্যবস্থা দেন। আপনার জিজ্ঞাস্য কী হওয়া উচিত বলব? আপনি প্রশ্ন করুন: 'এই যে জমিদারি ক'রে পায়ের উপর পায়ে দীন দরিদ্রের মুখের অন্ন কেড়ে খাচ্ছি এ ঠিক হচ্ছে? এই যে মোসাহেবদের জয়ধ্বনির উড়ো হাওয়ায়, অন্ধ মোহের দাঁড় বেয়ে বিলাসের ঢেউয়ে চলেছি হু হু ক'রে—পৌঁছব কোথায়? যদি হঠাৎ ভরাডুবি হয় তবে সাঁতার দেব ডাঙার দিকে, না আরো কাছে কোনো চরে ওঠাই সুবিধা? এক কথায়,

বাবুমশাই, আগে একটু সুস্থির হ'য়ে দাঁড়ান কোথাও—তারপর হবে ক্ষর অক্ষর সগুণ নির্গুণের গুরুগম্ভীর গবেষণা। বর্ণপরিচয় সারা হ'তে না হ'তে ব্রহ্মসূত্র ?'

"জমিদারবাবু কী বলবেন ভেবে পেলেন না বোধ হয়, তাই বললেন: 'গবেষণা কি খারাপ জিনিস বলতে চান না কি ?'

"শ্যামঠাকুর হেসে বললেন: 'বাপ রে! পাঠ করতে এসেও অমন কথা বলতে কেউ কি আর ডাকবে আমাকে ? বলবে মুখ্যু, কিচ্ছু জানে না। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম একটি কথা বাবুমশাই, যে আপনি বাঁচলে বাপের নাম—তাই আপনার প্রশ্ন হোক—বাঁচার মতন বাঁচা বলি কাকে ? যেখানকার যা। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া ভুল। যে-শিশু আজো চলতে গেলে টলে, তাকে কুস্তির আখড়ায় পাঠাতে নেই। তেমনি জ্ঞান জ্ঞান করছেন—সে কোস্তাকুস্তির সময় আসবে যথাকালে—মানে, চলার টাল সামলাতে শিখলে তবে—তার আগে নয়—বুঝলেন' ?"

বার্বারা বলল: "শ্যামঠাকুর বিলেতে জন্মালে চমৎকার পার্লামেন্টেরিয়ান হ'তেন, না দাদা ?

অসিত বলল: "যা বলেছ। কিন্তু তাঁর এ-তার্কিক মূর্তি হ'ল তাঁর উস্কে-দেওয়া অবস্থার রূপ। আসলে মানুষটি ছিলেন সত্যিই দীন। তোমাদের ভাষায় 'টিট্' পেলে 'ট্যাট' ফিরিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর স্বভাব—কাজেই—এজন্যে তাঁর অনুতাপও হ'ত না, কিন্তু কোনো আন্তরিক জিজ্ঞাসা নিয়ে কেউ তাঁর কাছে আসতে না আসতে দেখতে পেত তাঁর শান্ত বিনয়ী মূর্তি—যে-মূর্তি একদিন বড় সুন্দর ফুটে উঠেছিল দশ-পনের বৎসর পরে। বলছি শোনো।

তখন আমি তুমেলে গুরুদেবের আশ্রমে। তিনি একদিন হঠাৎ এসে হাজির—গুরুদেবকে দর্শন করতে। গুরুদেবকে দেখে তাঁর সে কী আনন্দ। বললেন: 'অসিত, তুমি ভাগ্যবান্ ভাই। গুরুর মতন গুরু বটে।'

"আমি করুণ হেসে বললাম: 'গুরু দিক্‌পাল হ'লে কী হবে দাদা, শিষ্যের যে ফাটা কপাল! থেকে থেকেই মনে হয়: কই দশ বার বৎসর আশ্রমে সাধন ক'রেও জ্ঞান হ'ল কতটুকু ?'

"শ্যামঠাকুর মিষ্টি হেসে টুপ্ ক'রে জবাব দিলেন: 'ভাই, আচ্ছা ধরো, আজ যদি তোমার মনে হ'ত—বা রে, আমি সাধনা করতে না করতে দিব্যি জ্ঞান হয়েছে তো। তাহ'লে সেটা কি তোমার আজকের অবস্থার চেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় হ'ত বলবে' ?"

বার্বারা বলল: "সত্যি, চমৎকার কথা!"

অসিত বলল: "আরো চমৎকার মনে হ'তে যদি তাঁর মুখে শুনতে এসব কথা তাঁর বিশুদ্ধ বাংলায়। ভাষার জৌলুষ আর সরলতা ছিল যেন তাঁর সহজাত কবচ-কুণ্ডল, তাই তাঁর কথায় বড় একটা সুন্দর বাংলা ঘরোয়া আবহ গ'ড়ে উঠত। একথা বলছি এইজন্যেই যে খাঁটি বাংলা ভাষা বিলিতি বুকনি না মিশিয়ে বলতে খুব কম শিক্ষিত বাঙালীই পারেন। যে-দু'চারটি মানুষ পারেন—বা পারতেন বলাই ভালো—তাঁদের মধ্যে দু'টি মানুষ আমার কাছে চিরদিনই নমস্য হ'য়ে থাকবেন: একজন রবীন্দ্রনাথ, আর একজন ওই শ্যামঠাকুর। বাংলা ভাষায় নিজস্ব মৌখিক ইডিয়ম আমরা শুধু গল্প-নাটকেই লিপি আজকাল—মুখে এ-ইডিয়মের মান রাখি না বড একটা। এমন কি আমাদের শিক্ষিতা ঘরনীরাও আজকাল কথাবার্তায় ভর্তাদের বিলিতি বুকনি রপ্ত করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা।" ব'লেই থেমে: "না, আর একটা উদাহরণ দিই তাঁর বাক্‌শৈলীর—দুঃখের মধ্যেও প্রাণখোলা হাসি হাসার।"

"সেবার আমি বেরিয়েছি কন্সার্ট দিয়ে আশ্রমের জন্য কিছু টাকা তুলতে। কাশীতে পৌঁছতেই শ্যামঠাকুরের সঙ্গে দেখা। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে চমকে উঠতে হ'ল বৈকি; এমন বলিষ্ঠ মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে. কষ্টে হাঁটেন, শীর্ণ দেহ। কিন্তু মুখের হাসি চোখের জ্যোতি তেমনি অম্লান। বললেন হেসে: 'ভাই, এবার ঠাকুর যে-দেশান্তরে পাঠাতে চাইছেন তার নাম বলেন নি। তাই ভালোই হ'ল আর একবার দেখা হ'ল—পাড়ি দেবার আগে আর একবার ইচ্ছা ছিল তোমার গান শুনবার। ধরো।'

"আমি বললাম: 'কী যে অলুক্ষুণে কথা বলেন! কী হয়েছে আপনার যে—'

"তিনি বললেন তেমনি প্রফুল্ল হেসে: এমন আর কি! রক্ত আবদার ধরলেন আমি ভারী হব, মাথা বললেন চতুর্দিকে ঘুরব, হৃৎপিণ্ড বললেন আমি ছুটব রেলগাড়ি হ'য়ে আর দেহ থেকে যে জলধারা রোজ ধারাসারে প্রবাহিত হ'ল তিনি বললেন ক্ষীর না দিতে পারি—চিনি তো সরবরাহ করি।"

'ডায়েবিটিস!'

'অবিকল। কেবল খেদ এই যে এত মিষ্টি বৃথাই গেল, কারুর ভোগে এল না।'

"আমি হেসে বললাম: কী যে কথার ছিরি আপনার, দাদা! কিন্তু ঠাট্টা রাখুন। চলুন আমার সঙ্গে কলকাতা—ডাক্তার বিধান রায়—'

"তিনি বললেন: 'ভাই রে, নিদান কালে বিধান দিতে কেবল একজনই। তাছাড়া কী জানো? যে-শহরের পরে একবার পদ্মা দেবীর চোখ পড়ে, বাঁধ

বেঁধে তার ভাঙন ঠেকাতে চাওয়া বিড়ম্বনা। তার চেয়ে নতুন শহরের পত্তন করাই ভালো নয় কি? খরচও কমে, ভরসাও বাড়ে।'

"আমি এবার তাঁর সুরে সুর ধরলাম, বললাম: 'কিন্তু এবার যে একটু চুক হয়ে গেল দাদা, ঠাকুর তো শুধু ভাঙনই ধরান না, সাধনও সাধান—আপনিই তো বলেছেন কতবারই যে তিনি দৈত্যের কাছে চণ্ডী হ'লেও ভক্তের কাছে লক্ষ্মী।'

"শ্যামঠাকুর বললেন: "উঁহু, চুক হয় নি ভাই।' ব'লে নিজের কপালে চাপড় মেরে: 'তবে ভক্তের মত ভক্ত হ'লে তবে তো। তাই আমার ম'ত এক ভক্ত গেয়েছিলেন'—ব'লেই গুনগুন ক'রে ধ'রে দিলেন:

'দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোঽহম্‌উৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে।

এর বাংলাও গেয়ে থাকি ভাই, কালই গাইলাম এক ভক্ত সভায়:

শুনিয়া দীনবন্ধু নাম উঠিয়াছিনু উছসি'—ভাবি':
পাতকী বুঝি তরিল করুণায়!
শুনিয়া—তুমি ভক্তাধীন, হৃদয় মোর উঠিল কাঁপি':
আমার তবে ভরসা কোথা হায়!'

ব'লে হেসে: 'তবে তাই ব'লে এমন কথা মনে কোরো না যেন যে নিভরসা হ'য়ে থাকতেই আমি চাই। ঠাকুরকে বলতে সত্যিই ইচ্ছা হয় সময়ে সময়ে: ঠাকুর করলে কী? আরো দুটো দিন সবুর সইল না!'

"আমি বললাম: 'তবে বলেন না কেন'?"

"শ্যামঠাকুর হেসে বললেন: 'বাধে ভাই—একটু মুস্কিলে পড়েছি কি না।"

'মানে?'

"মানে আর কিছু না, শুধু এই যে ঠাকুর ফাঁশ না করলেও আমি কেমন ক'রে টের পেয়ে গেছি যে তিনি আমার চেয়ে একটু বেশী বোঝেন—আমার কোন্ চাওয়াটা ভুল, আর কোন্‌টা ঠিক। তবে স্রেফ চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে কিছু বলতে পারি না মুখ ফুটে—বুঝলে না?"

অসিত বলল: "এর পর আর তিনি বেশী দিন ছিলেন না। কিন্তু মরণের সময়েও মুখে সেই প্রশান্ত হাসি, সেই অবিশ্রাম রসিকতা। কিন্তু সে যাক, গল্পটাই বলি।"

একটু থেমে অসিত ফের শুরু করল: "শ্যামঠাকুর যে একজন বিশুদ্ধ

বাংলা কথক হ'য়ে উঠতে পেরেছিলেন তার একটি কারণ—তিনি শহুরে মানুষ ছিলেন না। ইংরাজি অল্প-স্বল্প জানতেন, কলকাতায় আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন, কিন্তু আজব শহর ওঁর ধাতে সইল না, পাস দেবার আগেই ফিরে এলেন গ্রামে—বলতেন প্রায়ই হেসে: 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং আর ন গচ্ছামি, বাবা! উফ! শহরে কি মানুষ থাকে? প্রতি মোড়ে পার হই প্রাণটি হাতে ক'রে। তার উপর প্রতি ঘরে দুর্দান্ত রেডিয়ো। রাজধানী আমার মাথায় থাকুন—আর ভিটে ছাড়া হচ্ছি নে।' হায় রে, তখন যদি জানতেন—কিন্তু না, যথাপর্যায়েই বলি।

"গ্রামে ফিরে ভাগ্যবশে বৌ-ও পেয়ে গেলেন গ্রামেই। তারপর তাঁর দেখতে দেখতে এখানে ওখানে পাঁচালি, যাত্রাগান, রামপ্রসাদী গেয়ে একটু নামও হল—এমনি সময়ে গ্রামের জমিদারের সুনজরে প'ড়ে গেলেন। সুদর্শন সরল সুকণ্ঠ যুবকটির 'পরে তাঁর মায়া প'ড়ে গেল—দিলেন তাকে সেরেস্তায় এক কাজ। এর পরে এ-গ্রাম্যদম্পতীর জীবন বেশ সুখেই কাটছিল, কারণ স্ত্রী কমলাদেবীও ছিলেন শুধু পতিব্রতা গৃহলক্ষ্মীই নয়—স্বামীর মতনই সরল আর একটি মাত্র মেয়ে অন্নপূর্ণা যেমন হাসিখুসি তেমনই সুন্দরী—এমন সময়ে বিধাতা পুরুষ সাধলেন বাদ—গ্রামে এলেন এক সাধু—আনন্দগিরি। উজ্জ্বল কান্তি সাদাচুল পাকা দাড়ি সন্ন্যাসী গ্রামে আসতে না আসতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। শ্যামঠাকুর ও কমলাদেবী তো উচ্ছ্বসিত! রোজই তাঁর পাঠ শুনতে যেতে আরম্ভ করলেন সন্ধ্যার পরে।

"আনন্দগিরি ছিলেন একটু আশ্চর্য ধরনের সাধু, স্বাতন্ত্র্যপন্থী। তাই শঙ্করাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ে নাম লিখিয়েও তিনি হ'য়ে উঠেছিলেন অনামী। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—'আমি কেউ না বাবা, কোনো পথেই চলি না, আবার সব পথেই চলি কারণ দেখি ঠাকুর আমার সব পথেই চলেছেন সমানে।' জ্ঞানের কথা বলতেন বেশীর ভাগ উপমা দিয়ে, কিন্তু সংক্ষেপে—কেউ বেশী প্রশ্ন করলে বলতেন: 'যারা সাধনা না করে সব কিছু জেনে মেরে দিতে চায় তাদের বুদ্ধি যায় ভেস্তে—কারণ তারা সব কিছুই উল্টো বোঝে।' কিন্তু তাঁর চোখে বয়ে যেত ধারা যখন তিনি পাঠ বা ভজন করতেন। তাঁর মুখে মীরাভজন ও মহাভারত রামায়ণের ব্যাখ্যা শুনে শ্যামঠাকুর মুগ্ধ হন। আনন্দগিরি সুর করে গাইতেন তুলসীদাসী দোঁহা:

'নাম জীহ জপি জাগহিঁ জোগী।
বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী।

ব্রহ্মসুখহি অনুভবহিঁ অনূপা।
অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥

অর্থাৎ সংসারের মোহঘুম ছেড়ে যে যোগী একবার নাম-জপে জেগে ওঠেন, তিনি যে অনুপম ব্রহ্মসুখ পান সে-সুখ যে কী অনাময় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—কেন না সে-সুখের না আছে নাম, না রূপ। তাঁর কাছে এই ধরনের সব পদাবলী শ্লোক দোঁহা প্রভৃতি শুনতে শুনতে শ্যামঠাকুরের মনে জেগে উঠল কৃষ্ণভক্তি। তিনি সস্ত্রীক আনন্দগিরির কাছে দীক্ষা নিলেন—কৃষ্ণমন্ত্রে।

"কী কাণ্ড। এ-মন্ত্র তাঁর জীবনে সক্রিয় হল খানিকটা তোমাদের টাইমবোমার ঢঙেই। মাসখানেক জপ করতে না করতেই ফাটল বোমা, ঘটল অঘটন: দুর্লভ অবস্থা—'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বচনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা' যাকে বলে—চোখের জলে বিশ্ব ঝাপসা, কথার আবেগে রুদ্ধ কণ্ঠ! আনন্দগিরি মস্ত সাধু হওয়া সত্ত্বেও অবাক্। বললেন শিষ্যকে: 'তোমার স্বধর্ম চাকরি নয়—আকাশবৃত্তি। তুমি গীতা ভাগবত রামায়ণ পাঠ করো, আর শোনাও হরিনাম আশপাশের লোককে। চাকরি ছেড়ে দাও।' শ্যামঠাকুর তো আকাশ থেকে পড়লেন, বললেন: 'গুরুদেব! আমি তো পণ্ডিত নই আপনার মতন—তা ছাড়া আমি হরিনাম শোনাব কি বলুন? আমি যে অনধিকারী!' আনন্দগিরি ধমকে বললেন: 'কৃষ্ণনামে মাসখানেকের জপেই যার চোখে জল সে অনধিকারী, আর অধিকারী হ'ল কিনা পুঁথিপড়া পণ্ডিত। শোনো—তুমি যে শুধু মহাভাগ্যবান তাই নয়—তোমাকে শিষ্য পাওয়া আমার মহাভাগ্য। তবু এখানে কিছু দিন তোমাকে চলতে হবে আমার কথা শুনে—বেশিদিন নয়, দু-তিন বৎসর মাত্র, তারপর ঠাকুরের নির্দেশ তোমার হৃদয়ে আপনা আপনিই জেগে উঠবে, গুরুর মাধ্যমের দরকার হবে না। তবে এখন আমার স্বস্থানে ফিরবার সময় হ'ল ব'লে একটা কথা ফাঁশ করি: ঠাকুর আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন বাংলা দেশে কিছুদিনের জন্য ফিরতে—আর সে কেবল তোমার জন্যেই। তাই শুধু এইটুকু বলা যে তুমি মনে রেখ: তোমার স্বধর্ম—আকাশবৃত্তি; আর স্বকর্ম—তাঁর নামগান। আকাশবৃত্তি তোমাকে নিতে হবে কেন আমি বলতে পারব না—কারণ সবাইকে এ-বৃত্তি নিতে হয় না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, যে নিতে পারে সে ভাগ্যবান্ অধিকারী, কেন না তার ভার তখন ঠাকুর নিজে নেন। কী ভাবে—তুমি বুঝবে পরে। এখন শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, তিনি যাকে একবার চেপে ধরেন তাকে ভাগবতের ভাষায়—একেবারে নিঃস্ব না ক'রে ছাড়েন না: 'যস্যাহম্ অনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ'—বলেছেন তিনি

ভাগবতে। অতএব নির্ভয়ে হও নিরবলম্ব, তোমার জমিদার ভর্তাকে গিয়ে সোজা বলো—তুমি এখন থেকে শুধু রামের চাকর, আর কারুর নও।'

"কমলাদেবীর মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি সরাসর গিয়ে মাথা কুটলেন আনন্দগিরির পায়ে: 'এ কী নিদারুণ ব্যবস্থা ঠাকুর! আমরা যে সংসারী—উনি আকাশবৃত্তি নিলে মেয়ের বিয়ে দেবে কে—সংসার চালাবে কে? আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'মা, যুগ যুগ ধ'রে যিনি ব্রহ্মাণ্ড চালিয়ে এসেছেন তিনি একটি ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে পরিবারের সংসারও চালাতে পারেন না মনে করো? তোমাকে সেদিন বলি নি কি গীতার কথা যে, অনন্যমনে যে তাঁর উপাসনা করে, ঠাকুর কথা দিয়েছেন তাকে রাখেনই রাখেন—ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি?'

অসিত একটু থেমে মৃদু হেসে বলে: "এই হ'ল গুরু শ্যামঠাকুরের ঘরোয়া জীবনে বেপরোয়ার আদিপর্ব। ভাব জাগতে না জাগতে সব ছাত্রাকার—ওলট-পালট—খানিকটা যেমন কালো ঝড় উঠলে হয়—দুদণ্ড আগে যেখানে ছিল গাছপালা কুটির, দুদণ্ড পরে—একেবারে নিশ্চিহ্ন। শ্যামঠাকুরের একটি কথা আজো মনে পড়ে—আমার জীবনেও বারবারই ঘটেছে এ-অঘটন। বলতেন তিনি: 'এরি নাম ঠাকুরের লীলা রে ভাই! কাকে যে তিনি কোন্ পাকে ফেলে কোন্ আঘাটা থেকে কোন্ ঘাটে টেনে তোলেন, কেউ কি জানে?'

কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত ফের শুরু করল: "গ্রাম তোলপাড়। সরল সদাশয় সুকণ্ঠ শ্যামঠাকুরকে অনেকেই স্নেহ করতেন—তিনিও মাঝে মাঝে ওখানে বাউল কীর্তন গেয়ে অনেককেই মুগ্ধ করেছিলেন, তার উপর তাঁর গৃহলক্ষ্মী কমলাদেবীও সত্যিই লক্ষ্মী যাকে বলে—প্রতিবেশীরা তো মহা খাপ্পা, গিয়ে ধরল জমিদারকে—'ঐ সর্বনেশে সাধুই যত নষ্টের গোড়া, ওকে দিন তাড়িয়ে। শ্যামঠাকুর ভালোমানুষের পো, ওর কথা শুনে এবারে দ'য়ে মজবে সপরিবারে!' জমিদারবাবু শ্যামঠাকুরকে হারাতে রাজি না হ'লেও শিউরে উঠে বললেন: 'সাধুকে তাড়াব এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। তবে শ্যামলালকে বুঝিয়ে বলতে পারি।'

"কিন্তু যে একবার নামরসের স্বাদ পেয়েছে তাকে বোঝায় কোন্ উকিল? অথ—শ্যামঠাকুর গৃহধর্ম ছেড়ে বনলেন কথক—এখানে ওখানে গাছতলায় ব'সেই শুরু ক'রে দিলেন—নামগান, গীতা ভাগবত চরিতামৃত পাঠ।

"প্রথম দিকে দিন চলা ভার হ'য়ে উঠল বৈকি। কিন্তু দেখতে দেখতে কেমন যেন সব বিরোধ হ'য়ে গেল ঠাণ্ডা! বিশেষ ক'রে যখন তিনি চরিতামৃত পাঠ

ক'রে নিরক্ষর প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীদের বুঝিয়ে দিতেন—তখন চোখের জলের সঙ্গতে তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠত এক অপরূপ ভাবের সুর। কারুর কাছে কিছুই তিনি চাইতেন না, কিন্তু প্যালা পড়ত তাঁর পাঠে—এক আনা দু আনা সিকি আধুলি। মাসের শেষে দেখেন—অবাক্ কাণ্ড!—চাকরিতে যা মাইনে পেতেন ঠিক ততগুলি টাকা জুটে যাচ্ছে! সংসার আগের মতই চলল—যদিও সময়ে সময়ে এমনও হ'ত যে ঘরে চাল বাড়ন্ত। কমলাদেবী কেঁদে সারা, কী খেতে দেবেন স্বামীকে, মেয়েকে? কিন্তু কোত্থেকে কে যে পাঠিয়ে দিত সিধে—অনাহারে তাঁদের একদিনও কাটে নি যদিও উদ্বেগে কেটেছে অনেকদিনই—বিশেষ ক'রে মা ও মেয়ের।

"তবু এমনই মানুষের মন—মেনেও মানতে পারে না। তাই শ্যামঠাকুর যে শ্যামঠাকুর, তাঁরও মনে থেকে থেকে উঠত দুশ্চিন্তা 'যদি পাঠ না জমে, যদি অসুখ করে—খাব কী?' তার পরেই ঘটত একটা না একটা অঘটন, পাঠ না জমলেও জুটত প্যালা, অসুখ করলেই আসত অপ্রত্যাশিত প্রণামী। তখন অনুতপ্ত হ'য়ে গৃহদেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়তেন—'কবে নির্ভর আসবে ঠাকুর?' সঙ্গে সঙ্গে মনের আঁধার যেত কেটে, বলতেন স্ত্রীকে: ঠাকুর যখন হালে—খেয়াপার ঠেকায় কে?'

"কিন্তু এবার এল এক মস্ত পরীক্ষা। অন্নপূর্ণা চোদ্দ পার হ'য়ে পড়ল পনেরোয়। সবাই সুর ধরল সমতালে: 'অরক্ষণীয়া—বিয়ে দাও, বিয়ে দাও।' কিন্তু অন্নপূর্ণা সুন্দরী হলেও বৃত্তিহীন গরিবের মেয়ে—নিতে কেউ এগোয় না। শ্যামঠাকুর প্রথমটায় অচঞ্চল ছিলেন, কিন্তু চারিদিকের কলরবে ক্রমে একটু একটু ক'রে ফের জাগল সেই দুশ্চিন্তা—তাই তো! কূল-কিনারা না পেয়ে লিখলেন গুরুদেবকে চিঠি: 'কী হবে গুরুদেব?' উত্তর এল শুধু দুটি ছত্র: 'মেয়ে কার? তোমার, না তাঁর?'

"কিন্তু গ্রামের লোক ছাড়ে না, বিশেষ করে গিন্নীবান্নীর দল। নানা ছলে প্রায়ই এসে বলে কমলাদেবীকে: 'চেষ্টা-চরিত্তির না করলে কি আজকালকার দিনে মেয়ের বিয়ে হয় মা? তোমার কর্তাকে বলো কলকাতায় যেতে একবার—এমন সুন্দর মেয়ে'···ইত্যাদি। শ্যামঠাকুর ফের গুরুদেবকে লিখলেন। উত্তর এল: 'কলকাতা কেন? কর্তা কে? তুমি না তিনি?'

"কিন্তু ক্রমে এমন হ'ল যে অন্নপূর্ণা ঘরের বাইরে উঁকি দিতেও ভয় পায়। মেয়েরা সবাই বলাবলি করে: 'আইবুড়ো মেয়ে এত বড়টি গা? কী যে হবে ওর দশা—বাপ—থেকেও নেই—মাগো মা! আরো কত কথা—কেচ্ছা! মনের

দুঃখে একদিন কমলাদেবী এক প্রতিবেশিনীর কাছে ব'লে ফেললেন মুখ ফসকে : 'ঠাকুরের এ কী ব্যবস্থা বোঝা দায়। ভিখিরিই যদি করবেন তবে ছেলে না দিয়ে মেয়ে কেন?' অন্নপূর্ণা ছিল পাশের ঘরে। মাঝে মাঝেই সে কাঁদত লুকিয়ে লুকিয়ে। এবার আর পারল না। স্থির করল বাপ মার ভার হ'য়ে আর থাকবে না। গলায় কলসী বেঁধে ভোরবেলা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাবে—এমন সময় পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরল যমুনা—ওর বাল্য-সখী। কান্নাকাটি শুনে পাশের ঘর থেকে ওর দাদা বেরিয়ে এল—বাইশ বছরের সুদর্শন যুবক অনিল। মেধাবী ছাত্র, কলকাতায় এম-এ তে ফার্স্ট হ'য়ে রিসার্চ করছে। সবে' পুজোর ছুটিতে গাঁয়ে ফিরেছে। বাপ কলকাতার এক মস্ত সওদাগরি অফিসের বড়বাবু—থাকেন গরম চালে। তাঁর ইচ্ছা ছিল খুব বড় ঘরে সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিধাতা-পুরুষ মুচকে হাসলেন অলক্ষ্যে। অনিল অন্নপূর্ণার অনিন্দ্য কান্তি দেখে একেবারে অথই জলে। এমন মেয়ে কিনা জলে ডুবে মরতে যায়। ম্যাড্। তাছাড়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তার বলিষ্ঠ মন সাড়া দিয়েছিল। সব ছাপিয়ে, যৌবনের জোয়ারে পরিণাম-চিন্তা গেল ভেসে। যমুনাকে বলল : 'সে অন্নপূর্ণাকেই বিয়ে করবে।' মা রাজি, কিন্তু বাবা একেবারে অগ্নিশর্মা। ভিখিরির মেয়েকে ঘরে আনা? পাগল, না ছন্ন! মা আতঙ্কে কেঁদে সারা। সাধুকে ভিখিরি বলা? অকল্যাণ হবে যে! গ্রামে ফের নানা কথার জটলা! যমুনা বড় ভালবাসত অন্নপূর্ণাকে, সেও ধরল : 'আহা, এমন সুন্দর বৌ বাবা রাজার ঘরেও পাবেন নাকি? তাছাড়া এমন ফুলের ম'ত নির্মল মেয়ে!' ঘরে বিষম অশান্তি। অনিলও বেঁকে বসল। বলল : 'ওকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবো না।' দেখতে দেখতে গ্রামের অনেকেই অনিলের দিকে দাঁড়ালেন। অগত্যা শেষটায় বাপকেও সায় দিতে হ'ল। অফিসের বড়বাবু হ'লেও একা আর কতদিন যুঝবেন? বিয়ে হ'য়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিন আনন্দগিরির পুনরভ্যুদয়। বললেন হেসে : 'কী রে শ্যামলাল? এ-বিয়ের কর্মকর্তা বলবি কাকে?' শ্যামঠাকুর গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন : 'গুরুদেব! কত পাই—তবু ভুলে যাই কেন?'

"অন্নপূর্ণা বিয়ের পরে সুখী হ'ল বৈকি। কেবল শ্বশুর মাঝে কলকাতা থেকে ফিরলে তাকে একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হ'ত প্রথম দিকে। কিন্তু ক্রমশ তিনিও পুত্রবধূর লক্ষ্মীশ্রীতে, সেবায় ও স্বভাবগুণে মুগ্ধ হলেন। বললেন : 'অপরাধ' করেছি মা—মনে রেখো না।' অন্নপূর্ণা পায়ের ধুলো নিয়ে বলল : '[illegible] না বাবা। কেবল আশীর্বাদ করুন যেন ঠাকুরের কৃপায়

যোগ্য হই।' আবাল্য ধার্মিক বাপের সংস্পর্শে ওর মনটি ফুলের মতই শুভ্র হ'য়ে ফুটে উঠেছিল।

এবার এল আর এক পরীক্ষা। আনন্দগিরি শিষ্যকে বললেন: 'এ গ্রামে তোমার কাজ শেষ হয়েছে। তুমি কাশী যাও। সেখানে বসাও নামগানের পাঠ। শ্যামঠাকুরের মুখ শুকিয়ে গেল, বললেন: 'গুরুদেব, এখানে আমার তবু যাহোক একটু নামডাক হয়েছে, কাশীতে আমাকে চেনে কে? চলবে কী করে?' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'এখানে যিনি সচল সেখানে কি তিনি অচল, না ঠুঁটো?'

"ঘরে ফের কান্নাকাটি। এ কী বিড়ম্বনা! গ্রামের লোক এবার ক্ষেপে উঠল: 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। শ্যামঠাকুরের এখানে তবু যাহোক একটা হিল্লে হয়েছে—কাশীতে বেঘোরে পড়ে কী হবে বেচারির!' এবার অন্নপূর্ণা গিয়ে পড়ল আনন্দগিরির পায়ে: 'বাবাকে কেন দেশান্তরে পাঠাচ্ছেন? সেখানে তাঁকে দেখবে কে?' গুরুদেব বললেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবছা হেসে: 'কে কাকে দেখে মা? দেখেন শুধু একজনই—সেই দীনদয়াল, আর আমরা সবই দেখি—কেবল তাঁকে বাদ।' ব'লেই গুনগুন ক'রে ধরলেন: 'জো নজর আতে হৈঁ নহি অপনে জো হৈ আপনা—নজর নহী আতা! দেখি যাদের নয় তারা আপন, আপন যে রয় সে-ই শুধু গোপন। বুঝলে মা?' অন্নপূর্ণা আঁচলে চোখ মুছে বললেন: 'ক্ষমা করবেন গুরুদেব। বুঝেছি এবার।'

অসিত একটু থেমে ফের শুরু করল:

"শ্যামঠাকুর কাশীতে এলেন একেবারে একা। তাঁকে না ব'লে তাঁর বেহাই কাশীতে লিখে দিলেন এক চিঠি তাঁর এক ভাইপোকে—যেন শ্যামঠাকুরের একটু দেখাশুনা করে। ছেলেটির নাম সুধেন্দু।

"কোত্থেকে যে কী হয়! শ্যামঠাকুর প্রায়ই বলতেন আমাকে একটি কথা: 'ভাই, মিথ্যেই আমরা ভেবে মরি—যা করার করেন তিনিই, আমরা শুধু হাঁকু-পাকু ক'রে কষ্ট পাই—এই দেখ না সুধেন্দু—কোত্থেকে ও এল বলো তো? আর কেনই বা আমাদের জন্যে এত করল! সে কি সোজা করা ভাই—আমাদের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব ব্যবস্থাই সে ক'রে দিল না চাইতে। অথচ আমরা কতই না ভাবতাম—কী হবে কাশীতে—যেখানে আত্মীয়-স্বজন তো দূরে থাকুক, একটি চেনা মুখ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া ভার।'

অসিত একটু থেমে ব'লে চলল: "সুধেন্দু সত্যি ওঁদের কী যে সেবাটা করত দিনের পর দিন! শুধু ফাইফরমাশ খাটা নয়—কাশীর নানা বর্ধিষ্ণু

পরিবারেই সে শ্যামঠাকুরের নামগুণগান ক'রে নানান্ উপলক্ষে তাঁর নিমন্ত্রণ জুটিয়ে দিত। তার একটা মস্ত সুবিধে হ'য়ে গিয়েছিল সে মস্ত পালোয়ান ছিল ব'লে। নানা প্রদর্শনীতে দেহবলের এ ও তা নানান্ প্রতিযোগিতায় সে প্রায়ই হ'ত ফার্স্ট—সর্বত্রই তার আদর—পপুলার যাকে বলে। কাজেই নবীন হ'য়েও সে হ'য়ে দাঁড়াল প্রবীণের পৃষ্ঠপোষক। ফলে শ্যামঠাকুরের জুটে যেত প্যালা! খুব বেশি না হ'লেও—চ'লে যেত।

কিন্তু সংসার অচল না হওয়া সত্ত্বেও কমলাদেবী কাশীতে প্রথম দিকে প্রায়ই মন-মরা হ'য়ে থাকতেন। গ্রামে ছিলেন তিনি স্বামীর ভিটেয়, চারদিক খোলা, আলো হাওয়া, গাছে গাছে ভোর থেকে পাখি ডাকে—তাছাড়া নিজের একটু খেত-খামারও ছিল। কিন্তু কাশীর ভাড়াবাড়ির ঘুপচিতে এসে তিনি স্বস্তি পেতেন না, বিশেষ ক'রে মন কেমন করত অন্নপূর্ণার জন্যে। একদিন তিনি নিজেই গুরুদেবকে লিখলেন। উত্তর এল—'মেয়ে আসতে চায় তো আসুক না কিছুদিনের জন্যে।' শ্যামঠাকুর মাথা চুলকে বললেন: 'কিন্তু এ-ঘুপচিতে—তাছাড়া—যা পাই তাতে দুজনের টায়ে-টায়ে চ'লে যায়, মেয়ে এলে—'। কমলাদেবী নাছোড়বন্দ্। কী করেন?—বিপদে প'ড়ে শ্যামঠাকুর লিখলেন গুরুদেবকে: আকাশবৃত্তি তো নিয়েছি আমি একাই গুরুদেব, কমলাকে কেন মিথ্যে কষ্ট দেওয়া—ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিই গ্রামে।' গুরুদেব লিখলেন: 'একলা মানুষের চ'লে যায়ই একরকম ক'রে। নির্ভরদীক্ষারও ক্রম আছে—তাই তোমাদের দু'জনকে কাশী পাঠানো—তিনজন হ'লে আরো ভালো হ'ত।' শ্যামঠাকুর মহাভাবনায় প'ড়ে লিখলেন: 'অন্নপূর্ণাকে হয়ত তাঁরা পাঠাতে পারেন—কিন্তু যদি দিন না চলে?' গুরুদেবের জবাব এল পিঠপিঠ: 'তা'হলে ঠাকুরের নামে আর একটা কলঙ্ক বাড়বে বৈ তো নয়—বোঝার উপর শাকের আঁটি—সইবে।' কমলাদেবী ভর্ৎসনা করলেন স্বামীকে: 'কী লেখো সব যা তা গুরুদেবকে?' শ্যামঠাকুর অনুতপ্ত হ'য়ে লিখলেন: 'সে কী কথা গুরুদেব! ঠাকুরের কলঙ্ক? তাঁর কৃপা যে কত—বারবারই দেখিনি কি? কিন্তু হাতে যে একেবারে টাকা নেই—মেয়েকে আনাই কী ক'রে?' এ-চিঠির উত্তর এল: 'দিন-দুনিয়ায় কে কাকে আনায় বা পাঠায় শ্যামলাল—শুধু একজন ছাড়া?' শ্যামঠাকুর এ-চিঠির মানে বুঝলেও ঠিক অর্থপরিগ্রহ করতে পারলেন না। গুরুদেবের মতলবটা কী? কেবল ভাবেন আর ভাবেন!

"হবি তো হ—এই সময়ে কমলাদেবীকে তাঁর বেহান চিঠি লিখলেন যে অন্নপূর্ণা গর্ভবতী—যদি মেয়েকে নিয়ে যেতে চান তবে বেলা থাকতে থাকতে নিয়ে

যাওয়াই ভালো। শ্যামঠাকুর তো মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন: হাতে পুঁজি মাত্র পাঁচটি টাকা! ঘুম হ'ল না সারারাত।

"পরদিন সকালে মণিঅর্ডারে দু'শো টাকা এসে হাজির! শ্যামঠাকুরের গ্রামের এক ভক্ত লিখল: 'মা আপনার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই মনে আছে। তিনি সম্প্রতি বুকের ব্যথায় শয্যাশায়ী। আমাকে বললেন কেঁদে যে তিনি আপনার কাশীবাসের বিরোধী ছিলেন, সেই পাপেই তাঁর এ-দশা, তিনি আপনাকে দু'শো টাকা প্রণামী পাঠাচ্ছেন আপনার জন্মদিন উপলক্ষে। আশীর্বাদ করবেন—মা যেন সেরে ওঠেন।'

শ্যামঠাকুর অনুতপ্তা শিষ্যাকে আশীর্বাদ পাঠিয়ে দিলেন। দিন দশেক বাদে চিঠি এল: 'মা আপনার আশীর্বাদে সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন—একেবারে যাকে বলে মিরাকুলাস কিওর। আমাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। যদি কিছু দরকার থাকে জানাবেন।' শ্যামঠাকুর ফের আশীর্বাদ পাঠিয়ে লিখলেন: 'না, ঠাকুর রয়েছেন—দরকার আবার কী?' মেয়েকে 'আনানোর' কথা মন থেকে মুছে ফেলে দিলেন।

দু-চারদিন বাদে হঠাৎ এই বর্ষীয়সী শিষ্যাটি লিখলেন: 'ঠাকুর! আপনার জন্মদিনে চরণ-দর্শনে যাওয়ার সাধ—অন্নপূর্ণাও ধরেছে—আপনার বেয়ান আমার সঙ্গে তাকে পাঠাতে রাজি—যদি আপনি অনুমতি দেন।' শ্যামঠাকুরের চোখ উঠল ছলছল ক'রে। লিখলেন গুরুদেবকে: 'না গুরুদেব, ঠাকুরের কলঙ্কের বোঝা বাড়তে পেল না—এ-যাত্রাও তিনি রাখতেই চাইলেন, মারতে না। কিন্তু বলুন তো এ কী যোগাযোগ!' গুরুদেব লিখলেন: 'এ ঠাকুরের ইচ্ছায়ই ঘটেছে—কারণ তুমি অন্নপূর্ণাকে নিজে যেচে গিয়ে আনতে চাও নি—ঠাকুরের উপরেই ছেড়ে দিয়েছিলে।'

"এই শিষ্যাটির অবস্থা ছিল ভালো। দুদিন বাদে অন্নপূর্ণাকে নিয়ে ওদের ঘরের মোটরেই মা ও ছেলে এসে হাজির—শ্যামঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন আগে।

"কিন্তু যে যত ওঠে তার পরীক্ষাও হয় তেমনি সঙিন। ঘটল ফের এক দুর্দৈব। কাশীতে এসেই অন্নপূর্ণা ধরল গঙ্গাস্নান করতে যাবে। আসন্নপ্রসবা মেয়েকে গঙ্গাস্নানে পাঠাতে শ্যামঠাকুরের মন চাইল না। কিন্তু অন্নপূর্ণা ধ'রে পড়ল: 'গঙ্গাস্নানে কখনও অমঙ্গল হ'তে পারে?' শ্যামঠাকুর লজ্জিত হ'য়ে বললেন: 'খুব শিক্ষা দিলি মা! কিন্তু দাঁড়া তাহ'লে, আগে ওদের মোটরটা চেয়ে পাঠাই।' অন্নপূর্ণা বলল: 'গঙ্গা তো কাছেই বাবা!' শ্যামঠাকুর বললেন:

'না, না, পথে বড় ভিড়—যদি ধাক্কাধাক্কি লাগে, কাজ কি? শিষ্যকে ব'লে পাঠাতেই সে তৎক্ষণাৎ মোটর পাঠিয়ে দিল। এই প্রথম তিনি কারুর কাছে কিছু চাইলেন নিজে থেকে। না চাইলেই ভালো ছিল। হ'ল কি, পথে মোটরের ধাক্কা লাগল এক একার সঙ্গে। অন্নপূর্ণার তলপেটে বাজল চোট। গঙ্গাস্নানে যাওয়া হ'ল না। ফিরে এসেই কেবল বমি।

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। শ্যামঠাকুর গুরুদেবকে লিখলেন সব কথা। গুরুদেব লিখলেন: 'মোটর চাইলে কেন? ব্রত ভঙ্গ করলে কর্মফল কিছুটা অন্তত ভুগতেই হবে। তবে ভবিষ্যতে আর যেন এরকম না হয়। আর এক কথা: এখনো এত উদ্বেগ কেন? যে এখনো আমার আমার করে সে পরম নির্ভরের পরীক্ষায় পাস হবে কেমন ক'রে?'

ডাক্তারের চিকিৎসায় দিন পনের বাদে মেয়ে খানিকটা সেরে উঠল বটে, কিন্তু তাঁর দু'শোর একটি টাকাও রইল না। তার উপর এ-পনের দিনের পর তাঁর নিজের হ'ল নিউমোনিয়া। মাসখানেক বাদে সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে দিন চলা হ'য়ে উঠল ভার। এ রকম বিপন্ন তিনি কখনো হন নি। এ দিকে আসন্নপ্রসবা মেয়ে, ওদিকে ডাক্তারের আদেশ—মাসখানেক পুরো বিশ্রাম না নিলে তাঁকে ফের শয্যাশায়ী হ'তে হবে। সুধেন্দুও ভেবে সারা— ঠাকুর পাঠ না করলে প্যালা পাবেনই বা কেমন ক'রে? সে এখান ওখান থেকে কিছু কিছু প্রণামী জুটিয়ে দিত, তাতে কোনোমতে সংসার খরচটা সামলানো যেত বটে, কিন্তু বাড়ী ভাড়ার কী হবে? সংসারী মানুষ ধার করতে পারে, কিন্তু এ যে বিচিত্র অবস্থা—না গৃহী না সন্ন্যাসী—কাউকে মুখ ফুটে অভাবের কথা জানানোরও ও উপায় নেই! এদিকে বাড়িওয়ালার তাগাদা বেড়েই চলে। তারা দু'ভাই— দারুণ বেনে। মাস পয়লাঃই হাজির হবে ভাড়া আদায় করতে। কিন্তু এযাত্রা দেখতে দেখতে দেড়মাস ভাড়া বাকি! ওরা কর্কশকণ্ঠে ব'লে গেল একদিন সকালে এসেই—'সাধু-ফাধু বুঝি না মশাই, শেষ কথা—আর পনের দিনের মধ্যে দু'মাসের ভাড়া চুকিয়ে দিতে পারেন ভালো, নৈলে বাড়ি দিতে হবে ছেড়ে'— যাকে বলে 'আল্টিমেটাম'।

"মেয়ে অসুস্থ, তার উপর ন'মাস গর্ভবতী—ট্রেনে ক'রেও এখন আর গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। উপায়? শ্যামলাল গুরুদেবকে লিখলেন। উত্তর এল: 'ফের পথ-খোঁজা—দিশা না জেনে? ঠাকুরের উপর যে সব ছেড়ে দিয়েছে সে কি স্বধর্মে নিরুপায় নয়?'

অসিত থেমে বারান্দার দিকে চেয়ে বলল: "তারপর যা ঘটল সে এমনি আশ্চর্য

যে বলতে ভয় পাচ্ছি পাছে ভাবো আজগুবি। কিন্তু শুরু যখন করেছি তখন সারা করাই চাই। তাই শোনো।”

“আমি ঠিক এই সময়েই কাশীতে দিনের পর দিন শ্যামঠাকুরের ওখানে কাটাচ্ছি। তিনিও দিনের পর দিন কেবলই ঠাকুরের কথাই ব'লে চলেছেন—নিজের ভাবনা চিন্তার কথা আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানান নি—অভাবের কথা তো নয়ই। কাশীতে তাঁর গৃহস্থালীর ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার কথা আমি জানতে পেরেছিলাম পরে। তাই আমি পরমানন্দেই দিন কাটাচ্ছি এই সদানন্দ মুক্ত-পুরুষটির সঙ্গে—এমন সময়ে হঠাৎ আমার এক সাবেক কালের বন্ধু এলাহাবাদ থেকে এসে হাজির—আমি কাশীতে শুনে। নাছোড়বান্দা—এলাহাবাদ যেতেই হবে তাঁর বন্ধু-বান্ধব বিষম ধরেছে। ইচ্ছা অনিচ্ছার দোটানায় প'ড়ে শেষে গেলাম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু এলাহাবাদে দু' তিন দিন নানা ফ্যাশনেবল আসরে গান গাইতে গাইতে মনে গ্লানি এল ছেয়ে। এ কোথায় এলাম—যেখানে কেবল পার্টি আর পার্টি—ফুলের মালা আর সুবসনা শিক্ষিতাদের ভিড়! শুধু কি তাই? বাধ্য হ'য়ে বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে কথা কইতে হত সায়েন্সের, শিল্পের, সিনেমার, বিলেতের নানা মনীষীর ভাবধারার—সে কি সোজা কালচার্ড কথালাপ! কিন্তু কী করি? দশচক্রে প'ড়ে ফের সেই দারুণ আবর্তেই প'ড়ে গেলাম যা থেকে অতিকষ্টে উঠেছিলাম সৎসঙ্গের শ্যামল কূলে। কেবলই মনে হ'তে থাকে শ্যামঠাকুরের একটি কথা: 'ভাই রে, অনিত্য বড় সহজ পুরুষ নন—নিত্যের ছদ্মবেশ ধ'রে যখন আসেন তখন সাধ্য কি তাঁর নিজমূর্তি আন্দাজ করবে? সাধে কি ঠাকুর বলেছেন গীতায় যে তাঁর গুণময়ী মায়াকে মায়া ব'লে চিনতে পারে কেবল সে—যে চিনেছে মায়েশকে?' সত্যিই দেখলাম তাই। সব বুঝেও তবু কোথায় যেন একটু ভালো লাগে—অহমিকা গোঁফে চাড়া দেয় ফুলের মালা পেয়ে। নৈলে কি আর কেউ ড্রয়িংরুমে ফিরি ক'রে বেড়ায় বৈরাগ্যের বেহাগ, ভক্তির ভূপালি? কিন্তু এই সূত্রে যেন আরো বুঝতে পারলাম—শিখলাম বলাই ভালো—যে ভাব ভক্তির আবেশ সাধুসঙ্গের অপেক্ষা রাখে—অনুকূল আবহে সে উজিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু হৈ-চৈ-এর আঁধিতে তার মূল ধ'রে টানাটানি!

কিন্তু ভগবানের কৃপা তবু কাজ করে। দু'চার দিন বাদেই অনিত্য দেখা দিল নিজমূর্তিতে, টের পেলাম—মুক্তি মেলে না কালচার্ড কথালাপে, হাততালি কুড়িয়ে, সভাসমিতিতে নিখুঁৎ গান গেয়ে। এক কথায়, অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম বিবেকের বকুনিতে। পালাতেই হবে। কিন্তু ব্যূহের মধ্যে ঢোকা সহজ হ'লেও তা' থেকে বার হওয়া দায়। কী করি? ভাবনায় প'ড়ে গেলাম। এমন

সময়ে ঘটল—যাকে আমি চিনেছি ঠাকুরের কৃপা ব'লে, যদিও আমার বুদ্ধিমান বন্ধুরা বলবেন—মরুক গে শোনো।

"চার পাঁচদিন বাদে এলাহাবাদে বন্ধুর সুন্দর নিলয়ে আমার জন্মদিনে খুব এক পার্টি হ'ল। ফের সেই ফুলের মালা, অভিনন্দন পাঠ, কালচার্ড কথালাপ, সান্দেশ সিনেমা শিল্পের জয়ধ্বনি। রাত্রে মনে ছেয়ে এল গভীর অবসাদ——কোথায় এসেছি কোথা থেকে? শ্যামঠাকুরের প্রিয় ভাগবতী শ্লোক মনে প'ড়ে গেল—'আয়ুষাং যদসদ্ব্যয়ঃ'—পরমায়ুর বাজে খরচ দেউলে হওয়া। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি কি, এক উজ্জ্বলকান্তি পুরুষ আমাকে বলছেন: 'এখনো মায়ার মোহ? কাল ভোরে উঠেই কাশী রওনা হও।' ব'লেই অন্তর্ধান। কি জানি কেন মনে হ'ল—ইনি আনন্দগিরি—সে কী সৌম্যমূর্তি—সাদা দাড়ি, পাকা চুল, কাঁচা সোনার রঙ! ভোর তখন চারটে।

"স্থির করলাম—আর না: 'সময় এসেছে এবার এখন বাঁধন কাটিতে হবে।' কাউকে কিছু না বলে ঘণ্টাখানেক বাদে বেরিয়ে রাস্তা থেকে নিজেই ট্যাক্সি ডেকে এনে হলাম উধাও—'চলো কাশী। সর্বতোভাবে ঘুমন্ত বন্ধুর নামে শুধু একটি চিঠি রেখে গেলাম। যা মনে করে করুক। আমাকে এরা আর ডাকবে না কোনোদিন—বলবে 'চাষা'। ভালোই তো—শাপে বর। কী হবে আমার এমন সব কালচার্ড বন্ধুদের নিয়ে যাদের কাছে মনের অন্তঃপুরের কথা বলতে পারি না—শুধু ঠুনকো ঠুংরি গজল গেয়ে হাততালি কুড়োনো? তাছাড়া বার বারই মনে হ'তে থাকে এই একটা কথা—যাঁর ডাকে শ্যামঠাকুর পৈতৃক ভিটে ছাড়লেন তাঁর ডাক আমার কাছেও হয়ত এই ভাবেই আসবে, ছাড়িয়ে নেবে আমাকে বাসনাবন্ধন থেকে—পপুলার হবার লোভ থেকে—ত্যাগী না হয়ে ভক্ত সাজবার বিড়ম্বনা থেকে। এমনি ক'রেই তো বাঁধন খসে—তবে যখন ঠাকুর টানেন তখন লাগে বৈ কি—হোক না সেটান মুক্তির দিকে।

"এই সব আথাল-পাথাল ভাবতে ভাবতে মোটরে পৌঁছলাম কাশী; শ্যামঠাকুরের ওখানে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বারোটা; দেখি কি—তিনি ঠায় রোয়াকে দাঁড়িয়ে, আর তাঁর বাড়ির সামনেই, রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুধেন্দু দুর্দান্ত ঝগড়া করছে দু'টি ভুঁড়িওয়ালা বাবুর সঙ্গে। তাঁরা বলছেন: দেবই ওকে ঘাড় ধরে বের-ক'রে। সুধেন্দু বলছে আস্তিন গুটিয়ে বিশুদ্ধ কাশীর বাংলায়: 'চলা আও না। সুধেন্দুর জান থাকতে বড়ো না—আও দেখি একবার মরদের মুরদ।'

"আমি মোটরে হর্ণ দিয়ে নামতেই ওরা চমকে ফিরে দাঁড়ালো। আমি

সুধেন্দুর কাঁধে দিলাশা দিয়ে বললাম : 'ঠাণ্ডা হ'য়ে বলো তো ভাই, ব্যাপারখানা কী?' সুধেন্দু তাচ্ছিল্যের সুরে বলল : 'কী আবার? বাড়ীভাড়া বাকি পড়েছে দু'দিন। জানোয়ার! জানে ওরা দিদির কী অবস্থা—' ব'লেই ফের রুখে উঠে ওদের দিকে তাকিয়ে 'বাড়িভাড়া ঠাকুর কবে বাকি রেখেছেন শুনি? যা যা উল্লুক! এ কি মগের মুল্লুক নাকি যে ঘাড় ধরে বিদায় করবি? আও না, চলে আও।' বাবু দু'টি ভয় পেয়ে দু'পা পেছিয়ে বলল : 'বে-আইনি? মারবেন না কি? সুধেন্দু বলল : 'আলবৎ মারেঙ্গা। বাড়িভাড়া বাকি—তো নালিশ করগে যা—আইন আছে নাকি বাড়িভাড়া না পেলে ঘাড ধরে তাড়াবি? আমি সুধেন্দুর পিঠ চাপড়ে বললাম : 'একটু ধীরে সুস্থে ভাই—' ব'লেই বাবু দু'টির পানে চেয়ে বললাম : কত টাকা পাওনা আপনাদের? শ্যামঠাকুর এতক্ষণ নিরুদ্বিগ্ন মুখে রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, শুধু দু'টি ঠোট নড়ছিল—জপ করছিলেন, এই সময়ে রাস্তায় নেমে আমাকে বললেন : 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না ভাই আমারা পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে যাচ্ছিলাম ধর্মশালায়, এমন সময় অন্নপূর্ণার ব্যথা উঠল—ওদের বললাম দুদিন সবুর করতে—বলতেই বাবু দুটি মুখ ভেংচে বিশ্রী একটা গাল দিল। আর যাবে কোথা? সুধেন্দু লাফিয়ে উঠে ওদের দুজনের দুটি টেকো মাথা দুহাতে ধ'রে দমাশ ক'রে ঠুকে দিল। চিৎকার ক'রে 'পুলিশ পুলিশ—খুন খুন, করতে-করতে ওরা দে দৌড়। এ অবস্থায় পুলিশের ফ্যাসাদে পড়া কিছু নয় ভেবে আমি তৎক্ষণাৎ মোটরে ওদের পিছু নিলাম। মিনিটখানেক বাদে ওদের ধরে ফেললাম—ওরা তখনও হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছে ভুঁড়ি দুলিয়ে। মোটর একটা মোড়ে দাঁড করিয়ে হেঁকে বললাম : 'শুনুন—ও মশাই—একটা কথা। পুলিশ ডাকবেন না।' ওরা আমাকে মোটর থেকে নামতে দেখে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে শান্তকণ্ঠে বললাম : 'শুনুন পুলিস ডেকে আপনাদের কি লাভ হবে—ভাড়া তো তাতে আদায় হবে না।' ওরা আমার মোটর দেখে একটু থতমত খেয়ে গেল। ওদের মুখের সাদৃশ্য দেখে মনে হ'ল দু'ভাই, ভুঁড়িতে প্রায় যমজ—এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমাকে। তবু ওরি মধ্যে ঈষৎ বৃহত্তর ভুঁড়ি যাঁর তিনি বললেন সমীহ করে : 'কিন্তু কী করি বলুন মশায়? বাড়িভাড়া না পেলে তো চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি না।' আমি বললাম : 'সে-ব্যবস্থা হবে। বলুন, বাড়িভাড়া কতদিনের বাকি? সে বলল : 'দু'মাসের ছেষট্টি টাকা। আমি তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে একশো টাকার একটি নোট বের ক'রে তার হাতে গুঁজে বললাম : 'এই নিন দু'মাসের পুরো ভাড়া। আর যদি কথা দেন যে সাধুজিকে অন্তত আর একমাস বিরক্ত

করবেন না তবে এ-টাকা থেকে আর এক মাসের অগ্রিম রাখুন গচ্ছিত—কেবল কথা দিতে হবে।'

ওদের মুখের চেহারাই বদলে গেল, হাতজোড় ক'রে বলল : 'আমরা কী করব মশাই—আমাদের তো বেঁচে-বর্তে থাকতে হবে—দু' তিনটি বাড়িভাড়া থেকেই আমাদের সংসার চলে। তবে আপনি যখন শ্রীমুখে বলেছেন যে উনি সাধুপুরুষ, তখন আর কথা কী? আমরা আর ওঁকে তাগাদা দেব না—একমাস কেন দু'মাস থাকুন না—স্বচ্ছন্দে। আমাদের কি অসাধ? তা বলি কি, আসুন না পাশেই আমাদের বাড়ি—আর যদি কিছু মনে না করেন আমাদের ওখানেই এবেলা খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নিন না—আহা; শ্যামঠাকুরের মেয়েটির যে অবস্থা।'

"আমি মনে মনে হাসলাম। দরদ জাগতে একটু সময় নিল বৈকি! মুখে বললাম সুভদ্র সুরে : 'আমি পথে খেয়ে নিয়েছি, ভাবনা নেই—কেবল রসিদ দিন।' মনে মনে ভাবলাম—হা রূপচাঁদ। কী মায়াই জানো ঠাকুর!"

বার্বারা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল : "তারপর?"

অসিত বলল : "রসিদ নিয়ে ফিরেই ছুটলাম ডাক্তারের খোঁজে, সুধেন্দু ছুটল ধাত্রীর খোঁজে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই অন্নপূর্ণার প্রসব হ'য়ে গেল, কিন্তু কাটাকুটি ক'রে তবে। প্রসূতি বেঁচে গেল বটে, কিন্তু শিশুটি জন্মবার কয়েক মিনিট পরেই মারা গেল।"

বার্বারার চোখ চিকচিক ক'রে ওঠে : "আহা!"

অসিত একটু চুপ ক'রে ওর দিকে চেয়ে থাকে। বার্বারা বলে : "তারপর দাদা!"

অসিত চমক ভাঙে, বলে : "ও হ্যাঁ। তারপর আর কী, কমলা দেবীর সে কী কান্না! অন্নপূর্ণার তখনো ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটে নি। কিন্তু কমলা দেবী আমার সামনে এসেই শ্যামঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে হু হু ক'রে কাঁদতে লাগলেন। শ্যামঠাকুর তাঁর মাথায় হাত রেখে শান্তকণ্ঠে বললেন : 'যিনি দিয়েছিলেন তিনিই ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন—এতে বলবার কী আছে?'

এই সময় ধাত্রী ডাক দিল—কমলাদেবী চ'লে গেলেন—অন্নপূর্ণা জেগেছে। কিন্তু শ্যামঠাকুরের মুখে বিষন্নতার ছায়াও নেই, হাসিমুখেই বললেন : 'দেখলে তো ভাই! না, এখনো প্রমাণ চাই যে ঠাকুরটি আমার আর যাই করুক না কেন, কথার খেলাপ করেন না—মারতে মারতেও রাখেন?'

"তাঁর মুখে হাসি দেখে আমারও মন ভালো হ'য়ে গেল। আমি বললাম হেসে

ঈষৎ দুষ্টুমির সুরেই : 'এর নাম কি ঠাকুরের রাখা দাদা, না অ্যাক্সিডেন্ট ? ধরুন, যদি আমি না আসতাম হঠাৎ ?'

শ্যামঠাকুর চোখ মিটমিটিয়ে হেসে বললেন : 'এসেছিলে কি ভাই সাধে ? গরজ বড় বালাই। স্বপ্নে কে দিল ধাক্কা—ভোরে উঠেই কাশীতে যেতে ব'লে ?'

"আমার গায়ে কাঁটা দিল : 'তবে তিনি সত্যিই—'

"আর কে হ'তে পারে ভাই ? তিনি আমাকেও ব'লে গেলেন সব স্বপ্নে।" ব'লেই ফের তাঁর খোলা হাসি হেসে : 'খানায় ফেলতেও যিনি, টেনে তুলতেও তিনি—' বলতে না বলতে তাঁর কণ্ঠের স্বর গাঢ় হ'য়ে এল—মুখে হাসি চোখে জল—বললেন : 'গাও না ভাই তোমার সেই গুরুবন্দনাটি যেটি প্রথম শুনি তোমার মুখে সেই হিন্দুমহাসভায়—আহা কী গান মীরার !—' ব'লেই হাতজোড় ক'রে চোখ বুজে গান ধ'রে দিলেন—আমারি শেখানো গান—

'হরি-মিলনসে কঠিন হৈ মীরা আপনা সদ্‌গুরু পানা।
হরি-করুণাসে খুলে জো নয়না—তো ময় গুরু পহচানা॥'

গাইতে গাইতে দু'গাল বেয়ে দরদর ক'রে ঝরতে থাকে অবিরল অশ্রুধারা—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বেজে ওঠে সে কী অপরূপ সুর—রাস্তায় ভিড় জ'মে যায়। আমিও ধ'রে দিলাম গান তাঁর সঙ্গে :

'ময় অনাথ গুরু নাথ হমারো, গুরু মেরো সঙ্গ সহাই।
হরি মিলায়ো গুরু মুঝে—গুরু হরিকী শরণ লগাঈ।"

* * * * *

বার্বারার চোখে জল ভ'রে এল, চোখ মুছে তপতীর দিকে চেয়ে বলল : "এ লাইনগুলির মানে বুঝিয়ে দিতে দাদা ভুলে গেলেন !"

তপতী হেসে বলল : "দাদা অম্‌নি ভুলো। এর মানে হ'ল :

হরি মিলনের চেয়েও কঠিন সদ্‌গুরুর মিলন।
গুরু চেনে সে-ই—হরির কৃপায় খুলেছে যার নয়ন।
গুরু হয়ে নাথ অনাথা মীরারে করে আশ্রয় দান
হরি এনে দিল গুরু-পায়ে—গুরু দিল হরি সন্ধান।'

খানিক পরে বার্বারা মুখ তুলে অসিতের দিকে তাকালো : "গল্পটা কি এখানেই শেষ ?"

অসিত বলল : "না, শ্যামঠাকুরের বিচিত্র জীবনে আরো অনেক কিছু ঘটেছিল—কিন্তু সে-গল্প আর একদিন করব। রাত বারোটা—কাফে ওরা বন্ধ করেছে।

তিনজনেই উঠে দাঁড়ায়। বার্বারা হঠাৎ বলে: "কেবল একটা কথা বলব দাদা—যদি রাগ না করেন?"

অসিত আশ্চর্য হ'য়ে বলল: "রাগ?"

বার্বারা একটু ভেবে বলে: "ব'লেই ফেলি। আপনার কাহিনী আমি অবিশ্বাস করিনি দাদা, সত্যি বলছি—কেবল···কি জানেন? আমি যদি কোনোদিন গুরুবরণ করি তবে করব তিনি বিপদে-আপদে এভাবে রক্ষা করতে পারেন ব'লে নয়—ঐ যে মীরা বললেন তিনি ভগবানের সন্ধান দিতে পারেন—সেই জন্যেই।'

তপতী বলল হেসে: "বিপদে-আপদে রক্ষা পেতে যারা গুরুবরণ করে তাদের গুরুবরণই যে হয়নি ভাই! তবে এ-ও ঠিক যে, ভগবানের শক্তি আশীর্বাদ করুণা গুরুর মধ্যে দিয়ে সক্রিয় হ'তে পারে। তবে কেমন ক'রে এ হয়—সে-কথা তুমি এখনো বুঝতে পারবে না হয়ত। এ-সব ব্যাপারে না ঠেকলে শেখা যায় না।"

বার্বারা বলল: "কল্পনায় খানিকটা হয়ত বুঝি দিদি। কিন্তু সে-কথা যাক। আমার শেষ একটি জিজ্ঞাস্য আছে: গুরুবরণ হ'লে কি ভগবানের সন্ধান পাওয়া সত্যই একটু সহজ হয়?

অসিতই উত্তর দিল এ-প্রশ্নের: "হয় কেবল···।"

বার্বারা সপ্রসন্ন নেত্রে তাকায়: "কেবল—?"

অসিত বলে: "মীরা ঐ গানেই তো ব'লে দিয়েছেন পরিষ্কার ক'রে—গুরু সদগুরু হওয়া চাই—বদ্‌গুরু হ'লেই ভরাডুবি।"

বার্বারা বিস্মিত নেত্রে তপতী দিকে তাকিয়ে বলে: "বদ্‌গুরু কী বস্তু দিদি?"

তপতী হেসে বলে: "আমি শুধু সদ্‌গুরুই জানি ভাই—পুঁজি কম। দাদার দু'রকমই দেখা আছে।"

ঝমাঝম্...শোঁ...শোঁ...শোঁ...বুঁ - শূঁ আরো কতরকম ধ্বনির সমন্বয়ে গড়ে উঠল ঝড়বৃষ্টির অর্কেষ্ট্রা—একেবারে আচম্‌কা ! অসিত তপতীর দিকে চেয়ে হাসে : "বিদেশে স্বদেশ, তপতী ! নিউয়র্কে কালবোশেখী ! দেখছ ?"

তপতী অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের হোটেলের বসবার ঘরের জানলার দিকে তাকিয়ে শুধু বলে : "হুঁ।"

অসিত ওর সোফা ছেড়ে জানলার কাছে এসে আকাশের দিকে চেয়ে বলে : "হুঁ নয়—উঁহু। ইনি নন ক্ষণিকের অতিথি—এই কল্লোলিনী ঘনঘটা। আজ তোমার প্ল্যানিটেরিয়মের আশা ছাড়ো।" সঙ্গে সঙ্গে জানলার গায়ে ফটাকট শব্দ। তপতী লাফিয়ে জানলা খুলে বাইরের ব্যালকনি থেকে তিন চারটে শিলা নিয়ে মহা উৎসাহে অসিতের সামনে ধরল : "দেখ কী প্রকাণ্ড ! শিলা বটে—আমেরিকার যোগ্য।"

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

তপতী উঠে দোর খুলেই : "এ কী ! বার্বারা ! এ-হেন দুর্যোগে ?"

বার্বারা ওভারকোট খুলে আলনায় রাখতে রাখতে বলে : "না এসে পারলাম না দিদি। তবে কারণটা শুনলে হয়ত—"

তপতী ওকে বসাতে না বসাতে ফের ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং। দোর খুলতেই কফি পরিবেশকের কফি নিয়ে ঢুকে একটি টিপয়ে রেখে প্রস্থান।

তপতী বলল : "বোসো ভাই। ঠিক সময়ে এসেছ। আগে কফি খেয়ে একটু ঠাণ্ডা—থুড়ি গরম হও, তারপর শুনব কার মোহন বাঁশি তোমাকে এ-ঝড়-বৃষ্টিতে করল ঘরছাড়া।"

বার্বারা সোফায় আসীন হ'য়ে হাসিমুখে বলল : "অজান্তে দৈববাণী ক'রে ফেলেছেন দিদি—এ মেটাফার নয়, large as life—সত্যিই বাঁশি, তবে এটা নাস্তিক নিউয়র্ক, বৈষ্ণব বৃন্দাবন নয় এই ভরসা।"

ব'লে কফির পেয়ালায় থেকে থেকে চুমুক দিতে দিতে বার্বারা বলল ওর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা : ওর ফ্ল্যাটে সটান বিছানায় শুয়ে আবিষ্ট হ'য়ে পড়ছিল এডুইন আর্নল্ডের Light of Asia, যেখানে তিনি বলেছেন :

Veil after veil will lift—but there must be

Veil upon veil behind—

এমন সময় উঠল : পরিষ্কার বাঁশির আওয়াজ। অথচ মনে হ'ল না বাইরে থেকে আসছে, উঠছে যেন ওর নিজের মধ্যে থেকে! ও পরখ করতে দু'কানে আঙুল দিল—ওমা! তবু বাজছে সমানে! আর কী মিষ্টি যে! বলতে বলতে স্বর ওর কেঁপে উঠল :

"কিন্তু কী আশ্চর্য দিদি! শুনিনি সে-সুর কস্মিনকালেও—অথচ মনে হল যেন কতকালের চেনা! হয়ত দাদার কোনো গানের শুনে-ভুলে-যাওয়া সুরই বেজে উঠে থাকবে—বলতে পারি না। না শুনুন—আমার কথা শেষ হয়নি। শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন একটা আবেশ মতন—বা ধ্যানই বলুন—এসে গেল : আমি দেখলাম—স্পষ্ট দেখলাম দিদি—এই ঘরটি, আর আপনারা তিনজন ব'সে ধ্যান করছেন—আপনারা দুজনে সোফাটায় পা মুড়ে ব'সে আর একটি সুদর্শন লম্বা চওড়া যুবক ঐ চেয়ারটাতে পা ঝুলিয়ে ব'সে। আপনারা কি তিন-জনে মিলে সত্যি ধ্যান করছিলেন দিদি—মানে, ঘণ্টাখানেক আগে? তখন বেলা তিনটে হবে!"

তপতী খুশী হ'য়ে বলে : "করছিলাম।"

অসিত তপতীর দিকে চেয়ে বলে : "রুপার্টকে বলতে হবে—সে দূরদর্শনে বিশ্বাস করতে চায় না, বলে ওসব মনের ভুল।"

বার্বারা বলে : "রুপার্ট কে দিদি?"

তপতী বলে : "একটি তার্কিক ছেলে—Atlantic Monthly পত্রিকার সম্পাদকের সেক্রেটারি। প্রতি রবিবারে আমাদের সঙ্গে এসে ধ্যানে বসে—ধ্যানে ওর কিছু কিছু উপলব্ধিও হয়—কিন্তু একে এ-যুগ, তার উপর এ-দেশ, দেখবার সময় ও দেখে অনেক কিছুই, কিন্তু তারপরেই ধরে মামুলী বিজ্ঞ সুর : এ সব কী? অটোসাজেসচন্, না সাবকনশাস, না হ্যালিউসিনেশন—আরো কত কী গালভরা বৈজ্ঞানিক নাম—যার না আছে মাথা, না মুণ্ডু।"

বার্বারা বলে : "দেখে—তবু অবিশ্বাস?"

তপতী হেসে বলে : "শুধু অবিশ্বাস? তার উপরে তর্কের উপরে তর্ক—প্রশ্নের উপর প্রশ্ন : এও কি কখনো হয়—তাও কি কখনো সম্ভব? শেষটায় বাধ্য হ'য়ে তাকে বলতে হয় ফী বার সেই এক কথা : কী হয় আর কী না-হয় এ-সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাই মনগড়া, অপল্‌কা। ধরো আজই ও তর্ক তুলতে চাইছিল দূরের জিনিস মানুষ দেখতে পারে এ-কথা বিশ্বাস করবার আগে জানা দরকার সাক্ষীদের সাক্ষ্য মজবুত কিনা—ইত্যাদি। দাদা ওকে বললেন আমার কয়েকটি দর্শন। কিন্তু এম্‌নি ওর স্বভাব যে আমাদের কথায় অবিশ্বাস করতে

না পারার দরুনই যেন আরো মনমরা হ'য়ে পড়ল। তখন কী করি, সান্ত্বনার সুরে বললাম : 'ভাই, বিশ্বাস করতে যদি না-ই চাও, নাই বা নিলে আমাদের কথা। কেবল—তুমি আমাদের ছোট ভাইয়ের মতন ব'লেই বলছি—পারো তো একলা একলা নিজের মনকে একটু ধমকিয়ো, বোলো : যা অন্তঃসাৎ করতে পারছ না তাকে বাইরে রাখলে তত ক্ষতি নেই, কেবল একটু নম্র হবার চেষ্টা করলেই বা, বলতে শিখলেই বা যে, যা-কিছু আজ আমার কাছে অগ্রাহ্য, কে জানে হয়ত কাল গ্রাহ্য হ'তেও পারে, তাই যে-পথে চলতে চাও চলো, কেবল এইটুকু স্বীকার ক'রে যে, সম্ভব অসম্ভবের যে ধারণা এখন তোমার কাছে অকাট্য মনে হচ্ছে তা ভুল হ'তেও পারে।' ও তখন করুণভাবে ঘাড় নেড়ে বলল : ঠিক বলেছেন দিদি—আসুন তর্কাতর্কি রেখে একটু ধ্যানই করা যাক মনকে বাগ মানাতে।'

বার্বারা উৎসুক কণ্ঠে বলল : "তারপর ?"

এবার অসিত কথা কইল : "আমরা তিনজনে ফের ধ্যানে বসলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে চোখ খুলতেই দেখি ওর মুখের চেহারাই বদলে গেছে : চোখ বোঁজা, ঠোঁটে মৃদু হাসি, আর দু'গাল বেয়ে ধারা নামছে। একটু বাদে ও চোখ খুলে খানিকক্ষণ বিহ্বলের মতন চেয়ে রইল, তারপর সাড় আসতেই সলজ্জে চোখ মুছে ঈষৎ কেঁপে উঠে বলল : 'কী সুন্দর বাঁশিই যে শুনছিলাম দাদা! মাফ করবেন—অনর্থক তর্ক তুলে আপনাদের কত সময় নষ্ট করি—ভুলে গিয়ে যে, যারা সত্যি কিছু পেয়েছে তারা সে-কথা বলতে ভালোবাসলেও তা নিয়ে তর্কাতর্কি করতে ভালবাসে না। এখন থেকে আপনাদের সঙ্গে শুধু ধ্যানই করব—তর্ক না।' খুশী হ'য়ে ওকে বললাম : 'সাবাস জোয়ান! এই-ই তো সুবুদ্ধির কাজ। কারণ সত্যের পথে বুদ্ধির সারথ্য কিছুদূর পর্যন্ত কাজে এলেও তারপর সারথি বদল করতেই হয়। আর সে-সারথি হ'ল ধ্যান, অন্তর্মুখিতা, অভীপ্সা—তর্ক নয়। তাই জ্ঞানের পরম লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে চাও এদের বরণ করাই হ'ল পন্থা।'

বার্বারা মুখ নিচু ক'রে শুনছিল, এবার মুখ তুলে বলল : "আপনি ঠিকই ধরেছেন দাদা, কেবল—হয়েছে কি জানেন ? জ্ঞানের পরম লক্ষ্যে পৌঁছতে আমরাও চাই আপনাদেরই মতন, কেবল আমরা ছেলেবেলা থেকে ধ্যানের দীক্ষা তো পাই নি, তাই বুদ্ধিকে আঁকড়ে ধরি, বলি—জানতে চাই একথা ঠিকই, কেবল নিজের শর্তে হ'লে তবেই—নৈলে নয়।"

অসিত খুশী হ'য়ে বলে : "খাসা বলেছ। মনে পড়ল ঠিক এই কথাই আমাকে

একদিন শ্যামঠাকুর বলেছিলেন তাঁর নিজস্ব ঢঙে: 'দাদা, সাহেবরাও চান ভগবানের দেখা, কেবল চান ঝাঁজালো ঢঙে—সাহেবি সুরে, বলেন: 'তুমি যদি থাকো ঠাকুর, তবে আমার কাছে এমন ভাবে ধরা দাও যাতে আমার বুদ্ধি অপ্রস্তুত না হয়—মানে, যার আমি ব্যাখ্যা করতে পারি ন্যায়ের টীকায়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায়। কিন্তু এভাবে যে ঠাকুরকে মাপতে যায় দাদা, তার measuring tape তাঁর নাগাল পায় না, যেমন মা যশোদা দড়ি পান নি যখন তিনি বালগোপালকে বাঁধতে ছুটেছিলেন।' ব'লেই সে কি হাসি! ওরা আজ যতই সপ্রতিভ হোক না কেন দাদা,—দেখো—একদিন অপ্রতিভ হবেই হবে'।

বার্বারা বলল: "কাল আপনার মুখে শ্যামঠাকুরের গল্প শুনে অনেক রাত অবধি কত কী যে ভেবেছি আথাল-পাতাল—বলুন না দাদা, ওঁর কথাই আজ। আপনি তো বলেছিলেন আরো অনেক আছে বলবার।"

অসিত তপতীর মুখের দিকে চাইতেই সে বলল: "এখন বলতে পারো।"

অসিত বলল: "কাল চোখ টিপে মানা করেছিলেন, মনে আছে?"

তপতী বলল: "কিন্তু ও কাল তো আর বাঁশি শোনেনি, শুনেছে আজ। এ-সর্বনাশা বাঁশি যে একবার শোনে তার মনের মধ্যে যে অনেক কিছুই অজ্ঞাতে ওল্‌ট-পালট হ'য়ে যায় এ তো জানো নিজেই—ভুক্তভোগী হ'য়ে।" ব'লে বার্বারাকে: "আজ তাই তুমি দেখতে পেলে দূর থেকে যে আমরা তিনজনে ধ্যান করছি। আহা, রুপার্ট আর একটু বসলে ফার্স্ট'হ্যাণ্ড তোমার মুখ থেকেই শুনত একথা—তা'হলে হয়ত ওর মনের কুয়াশা আর একটু কাটত। তা সে হবে'খন আর একদিন—সামনের রবিবারে ওকে আর তোমাকে চায়ে ডাকব কেমন?"

বার্বারা বলল: "বেশ। কেবল—তা ব'লে আজকের গল্পটা যেন মারা না যায়।" ব'লে অসিতকে: "বলুন না দাদা, এমন কি কথা—যা বলতে দিদি কাল চোখ টিপে মানা করেছিলেন?"

অসিত কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলল: "একটু বেশি অভাবনীয় কি না, তাই ভাবনা হয়। ও আমাকে প্রায়ই সাবধান ক'রে দেয়, বলে—এ-ধরনের কথা এদেশে বেশি বলা কিছু নয়—যে যতটুকু হজম করতে পারে তাকে তার বেশি পরিবেশন করলে তার্কিক পেটের অম্লশূল হয়, যার ফলে বিশ্বাসের ফুসফুস সবল না হ'য়ে আরো দুর্বলই হ'য়ে আসে।"

বার্বারা অনুযোগের সুরে বলল: "কিন্তু এ ঘোর অবিচার। আপনাদের কথায় আমি কবে অবিশ্বাস করেছি শুনি?"

তপতী বলে: "ভাই, রাগ কোরো না, কিন্তু ভেবে বলো তো, আজ যা

এত সহজে মেনে নিতে পারছ মাসখানেক আগেও কি তাকে মঞ্জুর করতে পারতে সম্ভব ব'লে ?"

বার্বারা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "তা বটে! কিন্তু—" ব'লেই অসিতকে : "তবু বলুন দাদা! আমি মঞ্জুর করব কথা দিচ্ছি।"

অসিত হেসে বলল : "এর আর না করি কী ক'রে ?"

অসিত বলে : "যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা একটু বেশি অভাবনীয় ব'লেই এত সাত-পাঁচ ভাবা। তবে তুমি যখন কথা দিয়েছ যে রূপার্টের মতন জেরা করবে না, ভক্তিমতীর মতন সজ্জনের সাক্ষ্য মঞ্জুর করবে, তখন বলি খুলে—শুনলেই বুঝবে কেন বলতে বাধছিল।

"বলেছি, শ্যামঠাকুর খাঁটি সাধু হওয়া সত্ত্বেও ঠিক মামুলী সাধু ছিলেন না—ছিলেন খানিকটা সেই জাতীয় জেদী মানুষ যাদের—যাদের কী নাম দেব ?—হ্যাঁ, হয়েছে—apostle apostle—ঐ কথাটাই খুঁজছিলাম—যাঁরা, মিলটনের ভাষায় চান—to justfy the ways of God to man : কাজেই নানা সভায় নরম কথক হ'য়ে গিয়েও দেখতে দেখতে হ'য়ে দাঁড়াতেন গরম তার্কিক—ঢিলটি মারলে পাটকেলটি দিতেন ফিরিয়ে। যেদিনকার কাহিনী বলতে যাচ্ছি সেদিন তাঁর এই তীরন্দাজ রূপটিই—কিন্তু না ভূমিকা রেখে গল্পের কোঠায়ই আসি।

"আমার এক জমিদার বন্ধু পুলিন সান্যাল কাশীতে গঙ্গার ধারে একটি বাড়ি কিনেছিল। হঠাৎ একদিন সকালে সে কোত্থেকে খবর পেয়ে আমাকে এসে এক সভায় পাকড়াও করল—সেখানে শ্যামঠাকুর কথকতা করছিলেন—প্রহ্লাদের কাহিনী। শুনে ওর কী খেয়াল হ'ল, আমাকে বলল : 'পরশু জন্মাষ্টমী, জানিস তো যোগমায়া কী সাংঘাতিক ভক্তিমতী, তাই তাকে তিনতলার ছাদে একটি মন্দির ক'রে দিয়েছি। সে বিষম খুশী হবে যদি শ্যামঠাকুর সেখানে পরশু সকালবেলা জন্মাষ্টমীর একটা পাঠ মতন দেন। শ্রোতা থাকব মাত্র আমরা দুজন—থুড়ি, তোকে নিয়ে তিন। পাঠের পর অবশ্য মধ্যাহ্ন ভোজনটা আমার ওখানেই হবে।' শ্যামঠাকুর শুনে হাসিমুখে বললেন : 'তা বেশ তো দাদা, ভজনের পর ভোজন—কার আর অসাধ ?' পুলিন হেসে বলল : 'আমি কিন্তু একটু নাস্তিক গোছের মানুষ ঠাকুর—তবে আমার স্ত্রী এমনি দারুণ আস্তিকা যে হয়ত ক্ষতিপূরণ হ'য়ে যাবে।' শ্যামঠাকুর পিঠপিঠ জবাব দিলেন : 'এই তো চাই দাদা। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—ধৃতরাষ্ট্রের ঘরণী গান্ধারী—নৈলে মহাভারত জমবে কেন ?'

"শ্যামঠাকুর ঘণ্টাখানেক ধ'রে ভাগবতের নানা শ্লোকের ব্যাখ্যা ক'রে যথাবিধি ফলাও ক'রে তুললেন কৃষ্ণের জন্মকাহিনী—কারাগারে কী ভাবে অতিমানবের

জন্ম হ'ল—প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে দ্বিভুজ—শেষে বাসুদেবের তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়া—রক্ষীদের হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়া—যমুনার বুক চিরে পথ ক'রে দেওয়া—তোমাকে তো বলেছি এ-কাহিনী, তাই এসব কথার পুনরুক্তি করব না।

"পাঠ শেষ হ'লে পুলিনের স্ত্রী যোগমায়া জলভরা চোখে শ্যামঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বলল: 'আহা, কী কথাই শোনালেন ঠাকুর! প্রাণমন যেন জুড়িয়ে গেল!' এমন সময় হঠাৎ পুলিন দুষ্টুমির স্বরে বলল: 'বলেছিলাম না ঠাকুর ওঁর সদ্‌গতি ঠেকায় কে? কেবল ভাবনা হয়—আমার কী গতি হবে—এসব কথা শুনে যার কান মজলেও মন ভেজে না।'

"শ্যামঠাকুরের পিঠপিঠ জবাব: 'ভয় নেই—এখানে সতীর পুণ্যেই পতি ত'রে যাবেন তাঁর আঁচল ধ'রে—কী বলো মা? ঘোর কলির সবই উল্‌টো।' যোগমায়া হেসে উঠল!

"পুলিনের মুখ চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল—স্ত্রীর সামনে অপ্রতিভ হ'য়ে। বলল: 'ঠাট্টা করলেন বটে ঠাকুর, কিন্তু ঠাট্টা রেখে একটু গম্ভীর হ'য়ে বলবেন কি, এ ধরণের আষাঢ়ে গল্প শুনে কার কী সত্যি উপকার হয়?'

"শ্যামঠাকুর বললেন: 'গুরুপাকে যে-পেটরোগার বদহজম হয় সেকি বুঝতে পারে পুলিনবাবু, জোয়ান মানুষ কেমন ক'রে ঐ একই ভোজে দুর্বল হ'যে না প'ড়ে বল পায়? সর্বং বলবতাং পথ্যম্—বলবানের পেটে সবই সুপথ্য।'

"পুলিনের মুখচোখের ভাব এ-ব্যঙ্গে আরো বদলে গেল, বলল: 'সাদা প্রশ্নের বাঁকা উত্তর দিয়ে গেলে জিৎ হয় না ঠাকুর, ও হ'ল হার মানারই সামিল!'

"শ্যামঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন, বললেন মুচকে হেসে: 'হারজিতের খবর রাখেন জমিদার—দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমি ছাপোষা মুখ্যু মানুষ, জানি দুটো ঠাকুরের কথা—যিনি হারতে হারতেও জেতেন।'

"পুলিনের কেমন যেন রোখ চেপে গেল, যোগমায়ার ত্রস্ত চোখের দিকে না তাকিয়েই ব'লে বসল: 'ঠাকুরের জিতের খবর রাখেন হয়ত দিব্যচক্ষু সাধুরা, কিন্তু আমরা চর্মচক্ষে তো দেখি তিনি, হেরেই মরেছেন। ডি. এল. রায়ের একটি হাসির গান মনে পড়ে, যা তিনি লিখেছিলেন দিনদুনিয়ার চেহারা দেখে:

> 'আলোর চাইতে আঁধার বেশি, স্থলের চাইতে শূন্য!
> (আর) বস্তা বস্তা পাপের মধ্যে কতটুকু পুণ্য?'

"শ্যামঠাকুর এবার সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে একটু কেশে গলা সাফ ক'রে বললেন: 'আমি এক জুয়াড়িকে জানতাম, পুলিনবাবু। সে রেস খেলে কেবলই মরবে হেরে, অথচ নেশার এমনি ফুসলানি যে, সে যতই হারবে ততই রুখে উঠে

বলবে : পরের বার এমন জেতাই জিতবে—এমন একটা ঘোড়ার উপর বাজি ধরবে যে রাতারাতি আমীর! শেষ পর্যন্ত সে আমীর হ'ল না, হ'ল ফকির, কিন্তু অবাক্ কাণ্ড—অম্নি সে কাঁদুনি গাওয়া ধরল : ভগবান আমাকে না হারিয়ে জিতিয়ে দিতেও তো পারতেন। অর্থাৎ কি না তার ফতুর হওয়ার জন্যেও দায়িক ঐ যত নষ্টের-গোড়া ঠাকুরের বেদরদী ব্যবস্থা। এমনিই ঢঙ এ-সংসারের হাজার হাজার লোকের। আমরা চোখ না চেয়ে চ'লে খানায় প'ড়ে হাত পা ভাঙব নিজের দুর্বুদ্ধিতে অথচ—দোষ চাপাব ঐ যত-দোষ নন্দঘোষ ঠাকুরের স্কন্ধে—তিনি খট্টায় মখমল বিছিয়ে রাখেন নি কেন?

"পুলিন এবার ঝাঁজালো ব্যঙ্গের সুর ধরল : 'কিন্তু ঠাকুর যদি এতই কৃপাময় তবে হাজার হাজার লোকের মগজে চোখ-না-চেয়ে চলবার দুর্বুদ্ধিই বা দিলেন কেন শুনি? ডুবতে ডুবতে কেউ বেঁচে গেলে আপনারা গদ্গদ হ'য়ে বলবেন : মরি মরি ঠাকুরের কী কৃপা রে! অথচ কেউ গাড়িচাপা প'ড়ে মরলে বলবেন : চোখ চেয়ে না চলার ফলেই ঘটল অপঘাত। ঠাকুর যদি সবজান্তা তথা সবপার্তা—তবে অ্যাক্সিডেন্টের আগে নিরীহ বেচারীদের একটু সাবধান ক'রে দিতে কী হয়েছিল?

"শ্যামঠাকুর হঠাৎ ভালোমানুষি সুর ধরলেন : 'একথার উত্তর যারা জানে তাদের এক মুস্কিল কী জানেন? মুস্কিল এই যে তারা যা জানে তা অনিরীহ অগ্নিশর্মাদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। তাই আপনাকে কেমন ক'রে বোঝাব বলুন এই তত্ত্বকথাটি যে, ঠাকুর সবপার্তা হয়েও অনেক কিছুই করেন না—করতে পারেন না বলে নয়, করতে চান না ব'লে?'

"পুলিন বলল একটু সুর নামিয়ে : 'কিন্তু এ তো হ'ল অন্ধ বিশ্বাসীর কথা ঠাকুর—যারা যা দেখে তার উল্‌টোটাকেই শিরোধার্য করে ঋষিবাক্য ব'লে। সাদাচোখে আমরা যা দেখি সে হ'ল এই যে, ঠাকুর অনেক কিছু পারেন না, যা পারলে শুধু আমাদের নয়, তাঁর উকিলদেরও একটু সুবিধে হ'ত।'

"শ্যামঠাকুর হেসে বললেন : 'পাকা লোক হ'য়ে এমন কাঁচা কথা বলতে আছে পুলিনবাবু? আপনাদের বিজ্ঞান-ঋষি দেখেন কি সাদা চোখে, না অঙ্কের চশমা প'রে? দূরবীন অনুবীনে যা দেখা যায় সে-সব কি সাদা চোখে দেখা যায় না ব'লে নামঞ্জুর? তেমনি, সাধুরা যদি দেখেন—ঠাকুর অনেক কিছুই পারেন যার বুদ্ধি কোনো হদিশই পায় না—'

"পুলিন বিদ্রূপী বিনয়ে বলল : 'একটা দৃষ্টান্ত যদি দিতেন, দয়াময়!"

"শ্যামঠাকুর ভুরু উঁচিয়ে বললেন : 'তথাস্তু, বাম্মর ! তবে তার আগে ভূমিকা হিসেবে একটা সেকেলে গল্প পেশ করব।'

'এক যে ছিল ছিটগ্রস্ত রাজা—খামখেয়ালী। অর্থাৎ খুশি হ'লে মতির মালা, ক্ষেপে উঠলে বেত্রো শালা, আর কি। একদা তাঁর কী খেয়াল হ'ল, বায়না ধরলেন জ্ঞানীরা যে সত্যি জ্ঞানী তার প্রমাণ চাই হাতে হাতে ! ডাক দাও রাজ্যের পণ্ডিতদের। আমি চাই দুটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর : ঠাকুর কী পারেন, আর কী পারেন না।

'এহেন উদ্ভট প্রশ্নের ত্রিশূল যে-পণ্ডিত দেখে সেই করে আমতা আমতা—অমনি সঙ্গে সঙ্গে রাজা তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেন অর্ধচন্দ্র। লোকে শশব্যস্ত। পণ্ডিতরা সব' দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলেন মান বজায় রাখতে। এমনি সময়ে বদরীনারায়ণ থেকে এক অবধূত এসে হাজির। সব শুনে বললেন : আমাকে নিয়ে চলো রাজার কাছে, আমি উত্তর দেব।

'রাজা অবধূতকে দেখে যথাবিধি প্রশ্ন-যুগল পেশ করলেন। সাধুজি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন : 'ভগবান পারেন অসম্ভবকে সম্ভব করতে।' ব'লে একটি কাহিনী বললেন তাঁর স্বচক্ষে দেখা অঘটন। কাহিনীটি আমি ভুলে গেছি পুলিনবাবু, তবে তার জায়গায় আমি এ-সূত্রের ভাষ্য করব আমার নিজের চাক্ষুষ-করা একটি ইতিহাস দিয়ে। শুনুন।"

অসিত বলল : "শ্যামঠাকুর পাশের ঘটি থেকে একটু গঙ্গাজল খেয়ে শান্তকণ্ঠে বলা শুরু করলেন :

'আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে হয় এক জমিদারের ঘরে। তাঁর নাম বিপ্রদাস। কয়েক বৎসর আগেও তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গে—যাকে বলে নামকরা জমিদার। আজ তাঁর অবস্থা শোচনীয়—বীরভূমে একটি আটচালায় আছেন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। কিছু কোম্পানির কাগজ ছিল, তার সুদ থেকে কোনো মতে কুলিয়ে যায়—টায় টায়। কিন্তু তাঁর মনের দুঃখ প্রায় কেটে গেছে রাধাবল্লভের কৃপায়। এমন কি পাকিস্তানের মুসলমানরা তাঁকে পথে বসানো সত্ত্বেও তিনি মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হননি—বলেন : ওদের আমরাও কি ঘৃণা করেছি কম ?—যদি একটুও ওদের ভালোবাসতাম—কিন্তু সে যাক্, গল্পটা বলি।

'মানুষটি সত্যিই স্বভাব-উদার, ধর্মভীরু—সবার উপর, খাঁটি বৈষ্ণব। কিছুদিন আগেও একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন : ভাই, টাকা যখন ছিল তখন এমন কী আর সুখে ছিলাম, আর কৃপায় ঠাকুর এখন এমন কী

আর দুঃখে রেখেছেন? প্রাসাদ কেড়ে নিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রসাদ কি দেননি?

'কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখনো পাকিস্তানে তাঁর জমিদারি থেকে তিনি বেশ মোটা খাজনাই পেতেন ও তাঁর মস্ত বাগানওয়ালা প্রাসাদে মোটের উপর আরামেই ছিলেন বলব। দুঃখে শোকে আরো লুটিয়ে পডতেন তাঁর গৃহদেবতা রাধাবল্লভের জাগ্রত বিগ্রহের পায়ে।

'একটি মাত্র ছেলে—তখন তার বয়স সতেরো আঠারো: কৃষ্ণদাস। নাম তাকে মানিয়েছিল—ছেলেবেলা থেকেই উদাস, কৃষ্ণভক্ত। মন্দিরে পুজো করত আগে পুরুতে। কিন্তু ক্রমশ দলে দলে উদ্বাস্তরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার ফলে যখন গ্রামে পূজারী পাওয়া ভার হ'য়ে উঠল কৃষ্ণদাস ধরল সে-ই হবে পূজারী।

পুজো করবার মন্ত্র তন্ত্র সে ঠিকমত জানত না, কিন্তু যার হৃদয়ে জেগে উঠেছে ভক্তি তার পুজোর ভুল ধরবে কে? দেখতে দেখতে তার অর্চনায় পাষাণ বিগ্রহ উঠলেন হেসে। মন্দিরে ব'সে যখন সে মধুরকণ্ঠে ভজন করত তখন চোখের জলে তার বুক ভেসে যেত, শুনতে লোক জ'মে যেত। দেখতে দেখতে তার সরল পবিত্র অন্তরে সতেরো বৎসর বয়সেই নাম উঠল জেগে। সে চলতে ফিরতে পথে ঘাটে জপত শুধু—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

'হিন্দুদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলল, সঙ্গে সঙ্গে মোল্লা-মৌলবীর লেকচার গোঁড়ামিও উঠল ফেঁপে। শেষে একদল মুসলমান রুখে উঠল: পথে ঘাটে কাফেরের মুখে পুতুল-দেবতার নাম। শোনাও যে পাপ···ইত্যাদি।

'ওদের এক চাকর ছিল আবদুল। যেমন বলিষ্ঠ তেমনি বিশ্বস্ত। কৃষ্ণদাসকে সে হাতে ক'রে মানুষ করেছিল—ডাকত বাপজান ব'লে। বাপজানের ভজন শুনে আবদুল চোখের জল ফেলত। ফলে গ্রামের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই উঠল অতিষ্ঠ হ'য়ে। কিন্তু আবদুল নির্বিকার, কেউ কিছু বললে হেসে বলত: আল্লার কি জাত আছে না কি রে? কৃষ্ণও যিনি পয়গম্বরও তো তিনিই। এ ধরণের উদার কথা যখন ও বলত—ওর কণ্ঠে জেগে উঠত এমন এক সহজিয়া সুর যে গোঁড়ারাও থম্‌কে যেত কী বলবে ভেবে না পেয়ে! আর এ-সুর ওর কণ্ঠে জেগে উঠেছিল কোনো পুঁথি-পড়া বুলি রপ্ত ক'রে নয়, কৃষ্ণদাসকে ভালোবেসে।'

ব'লে শ্যামঠাকুর হেসে পুলিনের দিকে চেয়ে বললেন: 'আপনাদের সাহেবপুরাণে বলে না love me love my dog? এখানে শুধু dog প্রভু উল্টে গেছেন ভালোবাসার ধাক্কায়—হা হা হা!'

"আমরা সবাই হেসে উঠলাম, হাসি থামলে শ্যামঠাকুর ফের শুরু করলেন:

'এ-হেন আবদুল একদিন এসে বিপ্রদাসকে জানালো গ্রামের মুসলমানদের জটলার কথা। বিপ্রদাস ভয় পেয়ে ছেলেকে ডেকে বললেন : বলি কি বাবা…মানে… কিছুদিন পথে ঘাটে ঠাকুরের নাম নাই বা নিলে।

'কৃষ্ণদাস কিছুই জানত না, আশ্চর্য হ'য়ে বলল : কেন বাবা ?

'আবদুল বলল সব কথা খুলে। শুনে কৃষ্ণদাস বলল : সবই বুঝলাম, কিন্তু গুণ্ডাদের হুকুমে ঠাকুরের নাম নেওয়া ছাড়ব এই কি ঠাকুরের হুকুম—ব'লে বিপ্রদাসের দিকে ফিরে—না আপনার উপদেশ ?

'বিপ্রদাস অপ্রতিভ হ'য়ে বললেন : তা নয় বাবা…তবে কি জানো ?…মানে শাস্ত্রেও আছে—ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে…দিনকাল বদলে গেলে—

'কৃষ্ণদাস ঝোঝালো স্বরে বলল : ঠাকুরও বদলে যান ? কিন্তু শাস্ত্রে কি এও নেই বাবা, যে কর্মকর্তা এক ঠাকুর, আর কেউ নয় ?

'বিপ্রদাস আমতা আমতা স্বর ধরলেন : তা বটে বাবা, তবে…হয়েছে কি… মানে গুণ্ডারা তো মানুষ নয়—খুনখারাপি—

'কৃষ্ণদাস উদ্দীপ্ত স্বরে বলল : রাখে কৃষ্ণ মারে কে বাবা ? সেদিন গীতার পাঠ দিতে আপনিই ব্যাখ্যা করেছিলেন না কি "ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি"র মানে ?

'বিপ্রদাস বিপন্ন হ'য়ে আবদুলের দিকে তাকাতে সে মৃদুস্বরে বলল : দুশমনরা যে মতলব আঁটছে বাপজান, সে শুধু ভয়ানক নয়—মুখে আনতেও বাধে। ওরা ষড়যন্ত্র করছে তোমাকে গোমাংস খাইয়ে, কলমা পড়িয়ে মুসলমান করবে। তাই আমিই হুজুরকে বলেছি তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে। হয়ত আবহাওয়া ফের বদ্‌লে যাবে, কিন্তু যতদিন না যায়, ঠাকুরের নাম বাইরে না-ই বা নিলে—গুণ্ডাদের তো জানো না বাপজান, ওরা মানুষ নয়, দু'পেয়ে জানোয়ার—সব পারে। তাই বিপদ কাটাতে—

'কৃষ্ণদাসের চোখ জ্ব'লে উঠল, বলল : তুমি কী বলছ চাচা ? বিপদ থেকে বাঁচানো যাঁর নিত্যকর্ম ও স্বভাবধর্ম তাঁর শঙ্কাহরা নামের সামনে বিপদ টিঁকতে পারে না কখনো ! নয় কি বাবা ?

'বিপ্রদাস প্রমাদ গণলেন, বললেন : তা বটে বাবা, তবে কি না…মানে একটু সাবধান হ'লে লোকসান তো নেই। তাই…মানে আমি বলি কি দু'চার-দিন না হয় বাড়ি থেকে না-ই বেরুলে। আর যদি—

'কৃষ্ণদাস বলল : বেরুতেই হয় তবে প্রাণের ভয়ে ঠাকুরের নাম জপ না হয় মনে মনেই করলাম—এই তো ? কিন্তু এ তো শুধু কাপুরুষের কথা নয়—এ যে অবিশ্বাসীর কথা, ভণ্ডের কথা। মুখে বলব ঠাকুরের নাম অকূলের কাণ্ডারী,

আর কাজের বেলায়—ছি-ছি, আর বললেন না বাবা—ব'লেই কৃষ্ণদাস হঠাৎ শিশুর মত কেঁদে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'আমার দিদির ভয়ে রাতে ঘুম হয় না—একটি মাত্র ছেলে, আর অমন ছেলে! শেষে আমাকে এক তার ক'রে দিলেন: কৃষ্ণদাসের বড় বিপদ, অবিলম্বে এসো। আমি গিয়ে পৌঁছতেই দিদি সব খুলে বললেন: এখন কী ক'র ভাই, তুমিই বলো—আমি আর ভাবতে পারছি না।

'শুনে আমার চোখে জল এল, আমি কৃষ্ণদাসকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম: সাবাস জোয়ান! ঠাকুরের ভক্ত কাপুরুষ হবে কী দুঃখে? সে যে মহাপুরুষ, সাবাস! আনন্দে কৃষ্ণদাস আমার কাঁধে মাথা রেখে ভক্তির আবেশে কেঁপে উঠে সে কী কান্না!

'পরের দিন বিপ্রদাস দুপুর বেলা আমার ঘরে এলেন। বললেন: ভাই, কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার দিদির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করেছি যে, বোধ হয় এখন এখান থেকে কৃষ্ণদাসকে নিয়ে আর কোথাও যাওয়াই ভালো। হিন্দুরা পাকিস্তান থেকে দলে দলে পালাচ্ছে—আমার মনে হয় আমাদেরো দিন এসেছে ঘনিয়ে, আরো এইজন্যে যে, এ-গ্রামের বেশির ভাগ মুসলমান—বিশ ত্রিশ বৎসর আগেও—হিন্দু ছিল। তারাই আজ হিন্দুর সব চেয়ে বড় শত্রু কেন না আমরা তাদের অচ্ছুৎ নাম দিয়ে দূর-ছেই করেছিলাম বলেই তারা মুসলমান হয়; আবদুলের কাছে খবর পেলাম যে এদের মধ্যেই একদল শুধু কৃষ্ণদাসকে নয়—আমাদেরো গোমাংস খাইয়ে, কলমা পড়িয়ে মুসলমান করবে পণ নিয়েছে।

'আমি চুপ ক'রে রইলাম, কী আর বলব—যখন কথাটা সত্যি। মনে পড়ল কবির মর্মান্তিক ভবিষ্যদ্বাণী যা আজ হাতে হাতে ফলেছে বাংলায় ও পাঞ্জাবে:

হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

"ব'লে শ্যামঠাকুর কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুঁজে থেকে যোগমায়ার দিকে করুণ হেসে বললেন: 'অথচ এমান আমাদের বুদ্ধিমন্ত মনের কাজের বিচার মা, যে, নিজের পাপের কর্মফলে যখন ভুগি তখনো দোষ চাপাই নিরীহ ঠাকুরটির ঘাড়ে—তিনি থেকেও কেন নেই—পেরেও কেন কোনো বিহিত করছেন না? যখন অন্যায় করি রিপুর মোহে তখনো কাঁদুনি গাই—রিপু মোহ তিনি সৃষ্টি করলেন কেন—ভুলে গিয়ে যে তিনি শুধু রিপু মোহই সৃষ্টি করেননি, জ্ঞানও সৃষ্টি করেছেন, হৃদয়ে বিবেকের নির্দেশও দিয়ে আসছেন সেই কবে থেকে! কিন্তু সে অন্য কথা,

—যাক্।' বলে পাশের ঘটির গঙ্গাজলে গলা ভিজিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে শ্যামঠাকুর ফের শুরু করলেন :

'বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল : ভাই, আমার ছেলেবেলায়ও পূর্ববঙ্গে সংখ্যায় হিন্দুরাই ছিল বেশি ভারি—আমাদের ছুঁৎমার্গের অপমানে অত্যাচারেই তারা মুসলমান হয়েছে, নৈলে কি এদেশে হিন্দুর আজ এ-অবস্থা হ'ত? কিন্তু কাঁটাগাছ বুনে অমৃতফল ফলল না বলে কেঁদে লাভ কী? এখন হচ্ছে এই যে, আমাদের যখন যেতেই হবে তখন কেন আর মিথ্যে দেরি করা? তাই ভাবছি বীরভূমে আমাদের যে ছোট আটচালাটা আছে সেখানেই গিয়ে আপাতত আশ্রয় নেওয়া যাক্—পরে যদি ঠাকুর দিন দেন তো ফিরলেই চলবে—যদিও জানি সে আশা দুরাশা।

'ঠিক এই সময়ে বাইরে ঘরে শুনলাম আবদুলের চড়া স্বর : তুই এখানে কী করছিস? আড়ি পেতে কথা শোনা? দেব দূর ক'রে···ইত্যাদি। আমরা দোর খুলতেই দেখি ওদের দাসী ফতিমাকে আর আবদুলে বেধেছে। পরে শুনলাম ফতিমার বাবাও আগে ছিল হিন্দু—মুসলমান হয় হিন্দুদেরই ঘৃণায়, অবজ্ঞায়। আমরা বেরুতেই সে রুখে উঠে বলল : বেশ করেছি—আড়ি পেতেছি, এসব পুতুল পুজো আর চলবে না। ব'লেই হনহন ক'রে বেরিয়ে গেল। আবদুল উদ্বিগ্ন মুখে বলল বিপ্রদাসকে : হুজুর, কিছু যদি মনে না করেন তবে বলি, অন্তত কিছুদিনের জন্যে চলুন যাই কলকাতায় কি বীরভূমে। ফতিমা ওদের গিয়ে সব কথা বলবেই বলবে। আমার মনে হয় ও অনেকদিন থেকেই ওদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আঁটছে। গুণ্ডারা তো আর মানুষ নয় হুজুর—কখন কী ক'রে বসে—কাজ কী? সব চেয়ে ভয় হয় বাপজানের জন্যেই হুজুর—ব'লে ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

'বিপ্রদাস আবদুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন : ঠিকই বলেছিস আবদুল—আর দেরি করা কিছু নয়, চ—আমরা আমাদের মোটর বোটে রওনা হই চুপিচুপি—বিগ্রহ নিয়ে। মালপত্র বেশি কিছু নিস্ নি—ওরা সন্দেহ করতে পারে। কাল সন্ধ্যায়ই অন্ধকারে পাড়ি দেব—পরে যা করেন ঠাকুর।

'তাই ঠিক হ'ল—শুভস্য শীঘ্রং—ত্বরিৎকর্মা আবদুল মালপত্র বাঁধাছাঁদা নিয়ে পড়ল।

'কিন্তু যা ভয় করেছিলাম আমরা!—না, বলি যথাপর্যায়ে।

'পরদিন ভোরবেলা বিপ্রদাস রোজকার মতন নদীতে প্রাতঃস্নান করতে

গেছেন, কৃষ্ণদাস মন্দিরের জন্যে বাগান থেকে গুন্ গুন্ ক'রে নাম জপতে জপতে ফুল তুলছে—আর আমি উপরের তলায় গাড়িবারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে ভাবছি—কে এই ক্ষণজন্মা ছেলে যার মনে এমন দুর্লভ ভক্তি জেগে উঠল এ বয়সে!—এমন সময় দেখি দারোয়ান লতিফ গেট খুলে ঢুকল বাগানে। খানিক আগে ওকে সাইকেলে চেপে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম। কী ব্যাপার ভাবছি—এমন সময়ে ও সোজা কৃষ্ণদাসের খুব কাছে ঘেঁষে চাপাসুরে কি বলল—শুনেই কৃষ্ণদাস পাগলের মতন খালি পায়েই ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে আবদুলের ঘরে গিয়ে ওকে সব বললাম। ওর মুখ শুকিয়ে গেল, বলল: লতিফটা প্রায়ই ফতিমার সঙ্গে গুজ গুজ ক'রে কী সব কথা কইত—আমার মনে হয় লতিফটাই দুশমনদের গিয়ে খবর দিয়েছে যে আমরা আজই সন্ধ্যায় পাড়ি দেব—ওরা তাই ভোরবেলাই বাপজানকে—কিন্তু এসব কথা পরে হবে —আর দেরি নয়, চলুন বাবু, চলুন—ব'লেই বিপ্রদাসের বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমিও ছুটলাম ওর পিছু-পিছু। কিন্তু পথে বেরিয়েই হল মহা মুস্কিল—

'কোন্ দিকে গেছে কৃষ্ণদাস? একটু পরেই একটা মোড—সেখানে তিন-দিকে তিনটে রাস্তা—আর একটা মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ। কৃষ্ণদাস বা লতিফের কোনো চিহ্নও নেই। কী করি? একটু ভেবে আবদুল বলল। এক কাজ করি—আমার সাইকেলটা নিয়ে আ'সি, আপনি এখানে একটু দাঁড়ান বাবু, আমি এলাম ব'লে।

'আমি ঠায় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবছি আখাল-পাতাল—এমন সময়ে আবদুলের পুনরভ্যুদয়, কিন্তু সাইকেলে নয়—ছুটতে ছুটতে! বলল: লতিফটাঃ সরিয়েছে আমার সাইকেল—সোজা দুশমন! ঠিক এই সময়ে ভাগ্যবলে একটা একাগাড়ি আসছিল। আবদুল একাওয়ালাকে রুকতে ব'লেই আমার দিকে চেয়ে বলল: আমি যাচ্ছি ঐ বাঁদিকের রাস্তাটা ধ'রে—বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলেই ছুটে আসবেন। আমাদের হিন্দু মালিটা ও বামুনটাও এল ব'লে। আপনারা কিন্তু এখানে অপেক্ষা করবেন, বন্দুকের আওয়াজ না শুনলে নড়বেন না।

'একটু বাদেই মালি ও বামুন এসে হাজির—বামুনের হাতে লাঠি,—মালির হাতে শড়কি। আমরা ঠায় আবদুলের পথ চেয়ে, এমন সময়ে—মিনিট পাঁচেক বাদে—আবদুল ফিরে এল। চেঁচিয়ে বলল: ওপথে কেউ কোথাও নেই বাবু। আমি এবার ডানদিকের পথে দেখি—আপনারা দাঁড়ান, বন্দুকের আওয়াজ শুনলেই ছুটে আসবেন কিন্তু।

'ও এক্কাওয়ালাকে মোড় নিতে বলতে না বলতে—কী কাণ্ড, দেখি কি, মাঝের মেঠো পথ দিয়ে কৃষ্ণদাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। আমিও ছুটলাম ওর দিকে। ও আমাকে জড়িয়ে ধ'রেই নেতিয়ে পড়ল। ওকে আমরা এক্কায় উঠিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম। দিদির আমার ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী কান্না! ঠাকুর ফিরিয়ে দিয়েছেন হারানিধি—জয় ঠাকুর জয় জয়···

"শ্যামঠাকুর একটু থেমে ফের শুরু করলেন: 'এবার বলি কৃষ্ণদাসের জবানিতে যা ও বলেছিল আমাদের চারজনের সামনে—আবদুল, বিপ্রদাস, দিদি আর আমি।

'কৃষ্ণদাস বলল: কী বলব মা ঠাকুরের কাণ্ড—উপন্যাসেরো বাড়া, ভাবা যায় না মা, ভাবা যায় না—তবু লোকে বলে ভগবান নেই। শুনুন বাবা! লতিফটা এসে আমাকে বলল: সর্বনাশ হয়েছে—বাবু পা পিছলে ঘাটে প'ড়ে গেছেন, নড়তে পারছেন না, চলুন চলুন। শুনেই আমি পাগলের মতন ছুটলাম—এমন কি ঠাকুরকেও ভুলে গেলাম, তাই হয়ত ঘটল মতিভ্রম—আবদুলকে ডাক দেবার কথা পর্যন্ত মনে হ'ল না। ব'লে আমার দিকে চেয়ে: ঐ মেঠো পথ দিয়ে আমরা চলি না মামাবাবু, কারণ ওটা গিয়ে পড়েছে শ্মশানে। কিন্তু নদীর পথে ঐটেই শর্টকাট ব'লে আমরা ঐ পথই ধরলাম। মিনিট দুই তিন ছুটে শ্মশানে পড়তে না পড়তে হঠাৎ কোত্থেকে একটা কালো দুশমন চেহারার লোক বেরিয়ে এসে আমার ডান হাত খপ্ ক'রে চেপে ধরল। আমি ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম: ঠাকুর! অমনি সে হো হো ক'রে হেসে উঠে বলল: তোর ঠাকুর সালাও কিছু করতে পারবে না, তোর বাবা সালাও না। পারবে শুধু তোর সমুরা—যে তোর মুখে গরুর গোস্ত্ গুঁজে দিয়ে, কল্মা পড়িয়ে তোকে মোচলমান করবে আর তোর ঠাকুর সালা বাঁশি বাজাতে বাজাতে হায় হায় করবে, বুঝলি সালা—হা-হা-হা! তারপর মুখ খিস্তি ক'রে বলল: জাঁক ক'রে বলা হয় ঠাকুর বাঁচাবে। দেখি সালা ঠাকুরের কত মুরদ। ওঠ্ সালা মোটরে! তখন চোখে পড়ল দেখি—অদূরে একটা মোটর দাঁড়িয়ে।

'সঙ্গে সঙ্গে লতিফও হা হা করে হেসে আমার বাঁ হাত চেপে ধরল: চল্ সালা সমুরার বাড়ি। তবে ডর নেই এমন চোস্ত্ গোস্ত খাবি যে—ব'লেই ফের দু'জনে মিলে অট্টহাসি।

'হঠাৎ কেঁদে উঠলাম: ঠাকুর! ঠাকুর!

'ওরা আরো বিকট হেসে উঠল। লতিফ বলল: সালা! চেঁচা যত পারিস—এখানে আছে শুধু সকুনি—ঠাকুরও নেই, আদমিও না। ব'লেই দিল

আমাকে এক ধাক্কা। আমি মাটিতে প'ড়ে যেতেই ওরা আমাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলল মোটরের দিকে। আমি কেবল বলতে লাগলাম: ঠাকুর! ঠাকুর! ঠাকুর!

'খানিকটা এভাবে টেনে এনে ওরা আমাকে হেঁচকে তুলে দাঁড় করালো। সেখানে খালি কাদা আর কাদা—পাশে একটা মস্ত গর্ত, বৃষ্টির জলে ডোবা মতন হ'য়ে আছে। লতিফ ফের মুখ খিঁচিয়ে ক'রে ধমকে বলল: দেখ্ সালা—ভালোয় ভালোয় ওঠ্ বলছি গাড়িতে—নৈলে এমন মারই মারব—ব'লেই আমাকে এক লাথি।

'ঠিক এই সময়ে আমার মনে কোথেকে যে বল এসে গেল কে জানে? আমি চেঁচিয়ে বললাম: আমি উঠব না গাড়িতে, ঠাকুর আছেন—দেবেন তোকে সাজা। ওরা হো হো করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন আমার কানে কানে বলল: ভয় নেই রে—তোর বুকের কাছেই আমি রয়েছি—দেখ না চেয়ে।

'বলতেই আমার মনে প'ড়ে গেল আমার লকেট্টার কথা, মামাবাবু! কিছুদিন আগে জন্মদিনে মা আমাকে একটি সোনার লকেট গড়িয়ে দিয়েছিলেন। মাঝে বাঁশি হাতে ঠাকুর আর চারপাশে চারটি হীরে। জামার ভিতর থেকে আমি সেই লকেটটি বার ক'রেই মাথায় ঠেকিয়ে বললাম মনে মনে: ঠাকুর! কথা দিয়ে কথা না রাখলে কলঙ্ক তোমারি। আর আশ্চর্য—সে-সময়ে হঠাৎ মনে কেমন যেন অভয় বিছিয়ে গেল।

'লকেটটা দেখেই দুশমনটা লাফিয়ে উঠে আমার কব্জি চেপে ধরল: দে সালা, আভি দে। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে থেকে লতিফ ধরল সেই দুশমনটার হাত বলল: না, এ হামার মজুরি, হামিই তো ওকে এনেছি ভুলিয়ে! এ চীজ হামার বলতে না বলতে—সে কি কাণ্ড! দুশমনটা দিল লতিফকে ধাক্কা। লতিফ ঠিকরে প'ড়ে তক্ষুনি উঠে ধরল ওকে চেপে। বাধল লড়াই। দুজনেই দুর্দান্ত ষণ্ডা—শুম্ভ নিশুম্ভ যাকে বলে—ধস্তাধস্তি করতে করতে ভূমিশয্যা। ঠিক এমনি সময়ে আমার কানে কানে সেই স্বর বলল: এবার পালা। আমি দে দৌড়। ঠিক তক্ষুনি শুনলাম দারুণ চিৎকার, সঙ্গে সঙ্গে জলের মধ্যে ভারি জিনিস পড়ার শব্দ—ঝমাস্! পিছন ফিরেই দেখি—ওমা! কেউ কোথাও নেই—কেবল দু' তিনটে পা সেই ডোবার জলের বুকে—ব্যাঙের ছাতার মতন। আমি আর দাঁড়ালাম না।

'দিদি ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলে দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে শুধু বলে: জয় ঠাকুর···জয় ঠাকুর···ঠাকুর···ঠাকুর···

'কৃষ্ণদাসের মুখ চোখ রাঙা হ'য়ে উঠল ভাবের আবেগে, বলল হেসে: এখন

কি চোখের জল ফেলে মা! শুধু হাসো নাচো...বাবা, মামাবাবু···ধরুন কীর্তন—ব'লেই জলভরা চোখে ধ'রে দিল:

তোমার পায় যে হরি চরণতরী—ঝড় তুফানে সে কি ডরে?

সে যে অকূল পাথার হয় হেসে পার তোমার নামের হালটি ধ'রে!

"একটু থেমে ধরা গলায় শ্যামঠাকুর বললেন যোগমায়ার দিকে চেয়ে: 'তবু এমনি আমাদের অকৃতজ্ঞ মন মা যে, এত পাই তবু তাঁকে ভুষি, পদে পদে তিনি অন্তরে থেকে নানা ভঙ্গিতে বলেন: ওরে তোরা ঘুম ছেড়ে উঠে দোর খুলবি কবে? আমি যে ঢুকতে পারছি না!—তবু আমরা শুনেও শুনি না। বার বার তিনি রোগে আসেন বৈদ্য হ'য়ে, শোকে নিদ্রা হ'য়ে, নিরাশায় ভরসা হ'য়ে, আঁতুড় ঘরে মা হ'য়ে, শৈশবে খেলার সাথী হ'য়ে, কৈশোরে বন্ধু হ'য়ে, যৌবনে স্ত্রী-পুত্র হ'য়ে, অন্তিমকালে শান্তি হ'য়ে—তবু বিপদ-আপদের দু-একটা ঢেউ আসতে না আসতে তাঁকে ডাকতে ভুলে বলি: 'দিনদুনিয়ায় শুধু ঝড়-তুফান অকূল পাথারই আছে, তরণ-তরীর, পারের পারীর চিহ্নও নেই।' বলতে বলতে তাঁর চোখ উঠল চিক্‌চিক্ ক'রে, গাঢ়স্বরে বললেন: 'কিন্তু মা, ঋষিরা মিথ্যে বলেননি যখন তাঁরা বলেছিলেন—তিনি আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, আর তাঁর জন্যেই আমাদের কাছে প্রিয়জন এত প্রিয়—যখন বলেছিলেন—তাঁকে যেই সবছেড়ে চায় সেই পায়। মা, সত্যি বলছি তোমাকে—একথার মার নেই যে তাঁর কৃপার স্পর্শ আমরা পাই না শুধু চাই না ব'লেই। তাই না চিনতে পারি তাঁর করুণার স্বরূপ, না দেখতে পাই তাঁর অখিলরসামৃত-মূর্তি। কিন্তু তবু বলছি মা তোমাকে যে, সব কিছু মিথ্যা হ'তে পারে, কেবল একটি কথা মিথ্যা নয় যে—তিনি আছেন—আর—' ব'লে চোখ মুছে—'আর যে-ই যেখানে অসহায় হ'য়ে শুধু তাঁর শরণ চায়, বলে তাঁকে সর্বান্তকরণে যে, সে শুধু তাঁরি আশ্রয় চায়—তার কাছেই তিনি আসেন ছুটে যেমন এসেছিলেন বিপন্না দ্রৌপদীর কাছে যখন তিনি আকুল হ'য়ে ডেকেছিলেন কেঁদে—' ব'লেই বিগ্রহের সামনে হাতজোড় ক'রে ধ'রে দিলেন গান:

'বরেণ্য! বরদানন্ত! অগতীনাং গতির্ভব!

ত্রাহি মাং কৃপয়া দেব! শরণাগতবৎসল!'

গেয়েই আমার দিকে ফিরে বললেন—মুখে হাসি চোখে জল: 'আঁখরের রাজা! দিলেই বা দুটো আঁখর এমন ঠাকুরের!—আজ যে জন্মাষ্টমী দাদা—গানেরই তো দিন।'

"কষ্টে চোখের জল সামলে আমি ধ'রে দিলাম:

কোথা তুমি বিনা বরদাতা? কেবা অনন্ত সুখধাতা?
ওগো অগতির গতি, জীবন-সারথি, জনমে মরণে ত্রাতা।"

বার্বারার দিকে চেয়ে অসিত গাঢ়স্বরে বলে: "গান থামলে যোগমায়া চোখের জল মুছে গড় হ'য়ে শ্যামঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বলল: 'আমার স্বামীর অপরাধ নেবেন না ঠাকুর!—দুমদাম ক'রে তিনি বলেন বটে অনেক কথাই—কিন্তু তার পরেই—'

শ্যামঠাকুর পাদপূরণ করলেন: 'মনে মনে ভাবেন—কৃষ্ণদাসকে একবার বীরভূমে গিয়ে দেখে এলে কেমন হয়?'—ব'লেই পুলিনের দিকে চেয়ে হেসে—'নয় কি দাদা?'

"পুলিন হেসে করজোড়ে বলল: 'ঠাকুর! টেলিপ্যাথি রপ্ত হ'লে কি সিম্প্যাথি হয় লুপ্ত? কিংবা মনের কথা যে জানতে পারে সে মানতে পারে না যে, বাগ্‌বিতণ্ডায় আমাদের যে রূপটি ফুটে ওঠে সেইটেই আমাদের সবটা নয়?'

"শ্যামঠাকুর ওর কাঁধে হাত রেখে নরম হেসে বললেন: 'পারে বৈকি দাদা! তবে কি জানো? বাগ্‌বিতণ্ডাও তো ঐ বহুরূপীরই একটি রূপ বৈ কিছুই নয়—তাই বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলিকেও আমরা মেনে নিই মেঘ-কুয়াশা আবর্জনার ঝাড়ুদার ব'লে। তাছাড়া—' ব'লেই যোগমায়ার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে: তর্কাতর্কির ঝাঁজে অপ্রেমের জলই যায় উবে, প্রেমের দুধ ঘন হ'তে হ'তে ক্ষীর হ য়ে দাঁড়ায় না কি—বলো তো?' যোগমায়া সলজ্জে মুখ নিচু করতে শ্যামঠাকুর হেসে বললেন: 'লজ্জা কি মা? লজ্জাহরণ মিষ্টিতে আছেন ব'লে কি আর টক-ঝালে নেই?'

"পুলিন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বলল: 'ভরসা যখন দিলেন ঠাকুর, তখন ভয়ে ভয়ে মনে করিয়ে দিতে পারি কি যে রাজা অবধূতকে আরো একটি প্রশ্ন করেছিলেন?"

"শ্যামঠাকুর বললেন হাসিমুখে: 'মনে করিয়ে দিতে হবে না দাদা! তবে ঠাকুর কী পারেন ব'লে তোমাকে তটস্থ করার পালা সারা হ'লে তবে না শুরু হবে—তিনি কী পারেন না ব'লে তাকে অপদস্থ করার পালা।' ব'লেই যোগমায়ার দিকে চেয়ে: 'ভয় নেই মা, ভয় নেই। ঠাকুরটি আমার আর যাই হোন না কেন, খোট্টা নন—ঠাট্টা বোঝেন—হা হা হা হা! শোনো বলি।'

বার্বারা হাততালি দিয়ে খুব খানিকক্ষণ হাসে, তারপর বলে : আপনাদের ধর্মে দাদা ওই জিনিসটি আমার কী যে ভালো লাগে—এই ভগবানকে নিয়ে আপনাদের হাসিঠাট্টা—যেন তিনি ঠিক আমাদের বন্ধু, সাথী, আপন জন! আমাদের খৃস্টানিটির অনেক কিছুই আমার মন টানে, কেবল সময়ে সময়ে মনে হয় যেন বড় বেশি গুরুগম্ভীর—হাঁপিয়ে উঠি! সারা বাইবলে হাসির চিহ্নও নেই, শুধু যীশুর শিষ্যরাই নয়, তিনি নিজেও কোথাও একটিবারো হাসেন নি—হাসিঠাট্টা তো দূরের কথা। জানেন? এ নিয়ে আমরা স্কুলে সময়ে সময়ে চুপি চুপি বলাবলি করতাম—সেণ্ট ম্যাথিউ আমাদের শাসিয়েছেন যে স্বর্গরাজ্যে they neither marry nor are given in marriage, কিন্তু ধরো, যদি সেখানে গিয়ে দেখি—they neither laugh nor tolerate laughter—তাহ'লে?—তবু খৃস্টান সংস্কার তো দাদা, সব বুঝেও ব্লাসফেমির নামে কেমন যেন একটু ভয় ভয় করে।"

অসিত হেসে বলে : "জানি। আমাদের সংস্কৃত ভাষায় ঐ কথাটির প্রতিশব্দ নেই। তাই—ভাগবতে আছে—অর্জুন যেমন কৃষ্ণকে মিথ্যুক ব'লে ঠাট্টা করতেও ডরাতেন না, ওদিকে ঠাকুরও সে-ঠাট্টাকে ঠাট্টা ব'লেই চিনে নিয়ে অর্জুনের হাসির দোয়ার দিতেন নিজেও হেসে!"

তপতী বলে : "ঠাট্টা কী বলছ দাদা? ধমক?—আমাদের ভক্তেরা কি ঠাকুরকে ধমকে দিতেও পেছপাও নাকি? বলো না ওকে সনাতনের গল্প।"

অসিত বলে : "হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড! বলবার ম'ত—আরো এইজন্যে যে অঘটনটা গল্প নয়—সত্যি! শোনো বলি। সনাতন ছিলেন বৃন্দাবনে, ঠাকুরকে এমনি বেঁধেছিলেন তাঁর প্রেমের রশি দিয়ে যে, ঠাকুর তাঁর বিগ্রহ থেকে ফুটে বেরিয়ে এসে রোজ ভক্তের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে খেতেন যা তিনি রেঁধে দিতেন। একদিন হ'য়েছে কি, ঠাকুর বললেন ঠোঁট ফুলিয়ে—বালগোপাল, কচি শিশু তো : 'শাক আলুনি যে!—খাই কি করে!—নুন দাও।' অমনি সনাতন এক ধমক : 'অবুঝ হয়ো না ঠাকুর! আমি নিঃস্ব ভিখিরি—ভিক্ষে ক'রে যা পাই তোমাকে এনে খাওয়াই। নুন আজ জোটেনি—কী করবো! তোমাকে নিয়ে পেরে ওঠা ভার! আজ বায়না ধরলে—নুন দাও, কাল বলবে—খিচুড়ি চাই, পরশু—মালপো মণ্ডা। আর জ্বালাতন কোরো না ঠাকুর, ঐ যা জুটেছে খাও সোনা

হেন মুখ ক'রে।' ঠাকুর আর কী করেন! ঐ আলুনি শাক-ভাতই খেলেন মুখটি চুন ক'রে। ভক্তের ধমক—বলতে তো পারেন না: সইব না। কিন্তু দেরি হ'য়ে যাচ্ছে, ব'ল শোনো শ্যাম-ঠাকুরের দ্বিতীয় গল্প—ঠাকুর কী পারেন না?"

অসিত বলে: শ্যামঠাকুর পুলিনের দিকে চেয়ে বললেন: 'কথকের স্বধর্ম প্রগল্‌ভতা। তাই একটু ভূমিকা করি দাদা। সাহেবপুরাণে একে বুঝি বলে Prologue—না না Moral বুঝি?' ব'লে নামমাত্র হেসেই গম্ভীর হ'য়ে শুরু করলেন: ভাগবতে একটি শ্লোক আছে:

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

এর মানে হ'লো: যে-ভক্ত হরিকে প্রিয়জন মনে ক'রে সব ছেড়ে ডাকে, সে যদি কখনো ঝোঁকের মাথায় এমন কি অপকর্মও ক'রে বসে, তাহ'লে ঠাকুর তাকে তার কর্মফলের শাস্তি থেকে না বাঁচিয়ে পারেন না। ঘরোয়া ভাষায় এর টীকা করতে হ'লে বলতে হয়: যেহেতু ঠাকুর শক্তের কাছে গরম হলেও ভক্তের কাছে নরম, সেহেতু যে-ভক্ত ভুল ক'রে বিপাকে পড়েছে তাকেও উদ্ধার করতে ছুটে না গিয়ে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে পারেন না। ব্যস, এইটুকুই গৌরচন্দ্রিকা। অথ, নারায়ণং নমস্কৃত্য—অবহিত হও!'

"ব'লে শ্যামঠাকুর গঙ্গাজলে ফের গলা ভিজিয়ে শুরু করলেন:

'তখন আমি সবে গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিয়েছি, এখানে ওখানে পাঠও দিচ্ছি বৈকি প্রাণের মায়া ছেড়ে, এমন সময়ে একদিন আমার কাছে আনন্দপুর থেকে তার এসে হাজির: সামনের গুরুপূর্ণিমায় আমাকে পাঠ দিতে হবে। নিমন্ত্রণকর্তা আমারই এক পিসতুত ভাই—আনন্দপুরে ডাক্তারি ক'রে খুব পসার জমিয়েছিলেন।

'এবার এগুবার আগে একটু পেছুতে হবে—নাটকের আগে কুশীলব চাই না?

'আমার পিসেমশাই ফণিভূষণ রায় আনন্দপুরে ডাক্তারি ক'রে খুব নাম করেছিলেন—টাকার তো কথাই নেই। একটিমাত্র কুলতিলক মণিভূষণকে তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করিয়ে আনিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার আগে ব'লে যান: বাবা, টাকা যা রেখে গেলাম কিছু না করলেও হেসে খেলে কেটে যাবে; কেবল দুটি কথা ব'লে যাই। প্রথম, শুধু টাকাই সব নয়, সুনাম তার চেয়ে বড়—তাই ডাক্তারি ছেড়ো না। দুই, গৃহদেবতার সেবা যেন কোনো দিন বন্ধ না হয়—তাহ'লে আমি ম'রেও শান্তি পাব না।

'মণিদা পিসেমশাইয়ের কথা অমান্য করেনি, আনন্দপুরে সুচিকিৎসক হ'য়ে

উঠে যশ ও অর্থ দুইই উপার্জন করেছিল প্রচুর। পিসেমশায়ের দেহান্তের পরে মস্ত বাগানের ঠিক মাঝখানে রাধাশ্যামের মন্দিরটি নূতন ক'রে গড়িয়ে পূজারী রেখে নিয়মিত পূজো করাত—নিজের তেমন কোনো বিশ্বাস না থাকা সত্বেও। মাঝে মাঝে মন্দিরে উৎসবও হ'ত যথাবিধি—ভাগবত পণ্ডিত, কথক, কীর্তনিয়া এদেরো ডাকা হ'ত—ঘটা ক'রে কাঙালি-ভোজনও বাদ যেত না।

'মণিদার প্রথম পক্ষের স্ত্রী—বিমলা বৌদি ছিলেন সেকেলে মেয়ে, কাজেই মন্দির পেয়ে শুধু যে ব্রত পার্বণ পূজো আচ্ছায় মেতে উঠলেন তাই নয়, দেখতে দেখতে ঠাকুরকেও ডাকতেও শিখলেন। আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তাঁর একটিমাত্র সন্তান মেয়ে, আর কালো ব'লে প্রথম দিকে তাঁর মনে একটু খেদ ছিল বৈকি। কিন্তু দিনে দিনে মেয়ে এমন সুশ্রী ও মনোরমা হয়ে গ'ড়ে উঠল যে বৌদির মনের আঁধার কেটে গেল—আরো এইজন্যে যে মেয়েও দেখতে দেখতে হয়ে উঠল ভক্তিমতী—মার দেখাদেখি। বৌদি আদরিণী নয়নতারার জন্যে বাহাল করলেন তিন তিনটি শিক্ষক। একজন শেখায় ইংরাজি, একজন সংস্কৃত, আর একজন গানবাজনা। কিছুদিন পরে এক মণিপুরীকে দিয়ে ওকে নাচও শিখিয়েছিলেন। শুধু এই নয়, ছেলেবেলায়ই ওর মনে কাব্যলক্ষ্মী ছুঁইয়েছিলেন তাঁর আগুনের পরশমণি, ফলে চোদ্দ পেরুতে না পেরুতে ও চমৎকার গান বাঁধা শুরু করল। গানগুলি ও গাইতও এমন সুন্দর সুন্দর সুরে যে বৌদির উপাধি মঞ্জুর করতেই হ'ত—মেয়ে আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!

'কিন্তু ভগবানের মার ঠেকাবে কে? মন্দিরার বয়স যখন পনেরো তখন বৌদির হ'ল নিউমোনিয়া। মণিদা আমাকে তার করলেন। আমি যখন আনন্দপুরে পৌঁছলাম তখন বৌদির অর্ধঅঙ্গ গঙ্গাজলে—মানে, অন্তর্জলি। আমাকে দেখে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন: ঠাকুরপো, মেয়েকে আমার তুমি একটু দেখো—ব'লে মণিদার দিকে চেয়ে: আর তুমি···শুধু দেখো, যেন আমার রূপে-লক্ষ্মী-গুণে-সরস্বতী মেয়ে সৎমার হাতে কষ্ট না পায়। ব'লে রাধাগোবিন্দ নাম জপতে জপতে চোখ বুঁজলেন।

'কিন্তু ঠাকুরের লীলা বোঝা সাধ্য কার? মণিদা বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিয়ে ক'রে ঘরে তুললেন এমন এক সৎমা—কিন্তু—না—বলি যথাপর্যায়ে।

'নতুন বৌদির নাম মঞ্জুশ্রী। দেখতে যেমন সুন্দরী, স্বভাবে ঠিক তেমনি দারুণ। ভীষণ রাগী, লোভী আর কৃপণ। তার উপরে সামনে সতীনের মেয়ে সঙ্গীতকারিণী পল্লবিনী লতেব—লোকের মুখে প্রশংসা ধরে না। ফল যা হবার—দেখতে দেখতে মন্দিরা হ'য়ে উঠল নতুন বৌদির চক্ষুশূল। নানা সূত্রেই তিনি

দিতেন ওকে গঞ্জনা—এমন কি সময়ে সময়ে ওর গায়ে হাত তুলতেও ছাড়তেন না। বিমলা বৌদির কথা মনে ক'রে মাঝে মাঝে আমি যেতাম ওকে দেখতে। কিন্তু গরিব পাড়াগেঁয়ে কাকার সাধ থাকলেও সাধ্য কতটুকুই বা? মনের কষ্ট মনেই চেপে ঘরে ফিরে ঠাকুরের কাছে শুধু প্রার্থনা করতাম ওর কল্যাণের জন্যে।

'কিন্তু ক্রমশ নতুন বৌদি হ'য়ে উঠলেন—কী বলব? সাক্ষাৎ উগ্রচণ্ডী। চাকর-চাকরানীরা তাঁর নাম দিয়েছিল রায়বাঘিনী। মন্দিরার লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিনে দিনে বেড়েই চলল! শেষে একদিন আর পারলাম না, মণিদাকে বললাম। কিন্তু মণিদা তখন বৌদির কথায় ওঠে বসে, মেয়েকে ভালোবাসলেও প্রকাশ্যে তার হ'য়ে একটা কথা বলবারও সাহস পেত না। তাই ঘরে নিত্য নতুন অশান্তি ফেঁপে উঠলেও মণিদা নিশ্চুপ! ভাবতাম: মোহ মানুষকে এমনি ভেড়াই বানায় বটে?

'কিন্তু ক্রমশ মণিদা যে মণিদা—সেও উশখুশ সুরু করল। কারণ বৌদি শেষটায় এমন কঞ্জুষ হ'য়ে উঠলেন যে, বাজার খরচের দু'চার পয়সার হিসাব নিয়েও চাকর দাসীর সঙ্গে বাধাতেন কুরুক্ষেত্র! কোনো চাকরানীই টিঁকত না দু'তিন মাসের বেশ। বৌদির হিসেবিয়ানা দেখে সময়ে সময়ে হাসব না কাঁদব ভেবে পেতাম না। হাসি আসত সেই কৃপণের কথা ভেবে যে বলেছিল: একি প্রাণ যে এক কথায় দিয়ে দেব? এ টাকা! কান্না আসত মণিদার দশা দেখে—যে কর্তা হ'য়েও হ'য়ে উঠল বাড়ির-কেউ-না—অমানুষ! কিন্তু এবার ইতিহাস রেখে গল্পটাই বলি—দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

'আমাকে যে টেলিগ্রামে পাঠ দিতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাতে স্বাক্ষর M. কাজেই আমি ভেবেছিলাম মণিদাই তার পাঠিয়েছে। কিন্তু তার করেছিল মন্দিরাই, মণিদাকে না ব'লে। এই ছোট্ট তুচ্ছ এম্ স্বাক্ষরটির ফল কী দারুণ হ'ল শোনো। সেই বলে না একটি স্ফুলিঙ্গে—না না, হাল আমলে জুটে গেছে আরো জুৎসই উপমা—অ্যাটম্ বম্ব্! কেবল ফাটল কী ভাবে—বলি।

'আনন্দপুরে পৌছলাম বেলা চারটেয়। মণিদার ওখানে পৌছে দেখি—তিনি আর বৌদি তাদের শোবার ঘরে সামনের বারান্দায় ব'সে চা খাচ্ছেন। আমি বাগান থেকে উপর পানে চেয়ে—মণিদা!—ব'লে হাঁক দিতেই তিনি খুশি হ'য়ে ডাকলেন: আরে! শ্যাম যে! হঠাৎ—না ব'লে ক'য়ে!

'আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ভাবছি কী ব্যাপার, মণিদা তার ক'রে এরকম ব'লে কেন? তখন মনে পড়ল তারে স্বাক্ষর ছিল শুধু একটি অক্ষর M: বুঝতে দেরি হ'ল না আর—মন্দিরাই আমাকে তার করেছিল

কাউকে না ব'লে। মনের কোণে একটা আবছা ভয় ঘনিয়ে উঠল। বৌদিকে তো চিনেছিলাম হাড়ে হাড়ে: আনন্দপুরে কেউ সকালে উঠে ওর নাম নিত না—সংসারের অকল্যাণের ভয়ে। পাঠ দেওয়া মানেই তো লোকজন নিমন্ত্রণ, প্রসাদ-বিতরণ, শেষে কাঙালি-ভোজন। বৌদি গৃহের কর্ত্রী হ'য়ে বসতে না বসতে—বছর ঘুরতে না ঘুরতে এসবই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন—টাকার শ্রাদ্ধ, বারো ভূতে লুটে-পুটে খাওয়া—এই সব মন্তব্য ক'রে। তার উপর আমার 'পরেও ছিল তাঁর হাড়ের রাগ—যদিও মুখে কিছু বলতে পারতেন না—দেবর সাক্ষাৎ লক্ষ্মণ না হ'লেও সাধুপুরুষ ব'লে একটু নামডাক হয়েছিল তো! কিন্তু এ-যাত্রা—মনে হ'ল আমার—শুধু মা-হারা মেয়েটারি নয়, তার পাড়াগেঁয়ে কাকাটারো অদৃষ্টে হয়ত—কে জানে কী আছে?

'ভাবতে ভাবতে উপরে উঠছি এমন সময়ে সিঁড়িতেই মন্দিরা পিছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল—কাকাবাবু—কাকাবাবু গো! ব'লে লাফাতে লাগল। আমি আদর ক'রে বললাম: তার বুঝি তুই করেছিলি? ও খিল খিল ক'রে হেসে বলল: কেমন বুদ্ধি করলাম বলুন তো? মিথ্যে কথাও হ'ল না এম্ সই করে—অথচ আপনি ভাবলেন বাবাই তার করেছে। আমি তার করলে কি আর আসতেন কাকাবাবু!

'আমি হাসলাম—কিন্তু নাম মাত্র! কী জানি কেন, আমার মন এক অনামা আশঙ্কায় ভারী হ'য়ে উঠল!

'যাহোক উপরে উঠে মন্দিরার সঙ্গে মণিদার শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরের গাড়ি-বারান্দার ছাদে পৌঁছতেই মণিদা উঠে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে হাসিমুখে বলল: বেশ বেশ!—না ডাকলেও আসা—এইই তো চাই। সাধু-পুরুষে আবার কবে ডাকার অপেক্ষা রাখে?

'আমি উত্তর দিতে না দিতে মন্দিরা বলল: কাকাবাবু না ডাকতে আসেননি বাবা! আমি তার করেছিলাম কাউকে না ব'লে। পরশু গুরুপূর্ণিমা—কতদিন পাঠ-টাঠ কিছুই হয়নি—কাকাবাবু করবেন গুরু-গুণগান—বেশ হবে, না বাবা? কতদিন লোকজন খাওয়ানো হয়নি—না কাঙালি-ভোজন—

'বলতে না বলতে বৌদি দপ্ ক'রে জলে উঠলেন: আমাকে না ব'লে তুই তার করতে গেলি কেন পোড়ারমুখী?

'মন্দিরা বোধ হয় ভাবেনি—আমার আসার পরে আমারি সামনে বৌদি রাগারাগি করবেন। হয়তো এমনো মনে হ'য়ে থাকবে যে, একবার আমি এসে পড়লে মণিদা ওর হ'য়ে দাঁড়াবেনই দাঁড়াবেন—বৌদি মনে মনে আগুন

হ'য়ে উঠলেও মুখে কিছু বলতে পারবেন না। যাই ভেবে থাকুক, আমাদের সামনে ধমক খেতেই ওর মুখ এতটুকু হ'য়ে গেল। বলল কেঁপে-ওঠা সুরে: ভেবেছিলাম বাবা খুশীই হবেন, তাই।

'বৌদি চেঁচিয়ে উঠলেন: বটে! বাবাই সব, না? মা কেউ নয়? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে! ভেবেছ যে একবার কাকাবাবু এসে পড়লে আমি আর কিছুই বলতে পারব না, না?—না, পাঠ-টাঠ কিছু হবে না। লোক খাওয়ানো, কাঙালি-ভোজন—প্রসাদ—শুধু টাকার শ্রাদ্ধ। এক্ষুনি যা তুই বেরিয়ে—দূর হ বজ্জাত মেয়ে।

'মন্দিরা কেঁদে ফেলল। বৌদির রাগলে আর জ্ঞান থাকত না, আগুন হ'য়ে উঠে বললেন: এর উপর আবার নাকে কান্না! ডুবে ডুবে জল খেয়ে—ব'লেই উঠে ওর চুলের মুঠি চেপে ধ'রে সজোরে ওর গালে ঠাস ঠাস ক'রে মারলেন দুই প্রচণ্ড চড়। ও ঘুরে পড়ল মাটিতে।

'আমি আর সইতে পারলাম না, বললাম মণিদাকে: মণিদা! তুমি কী হ'য়ে গেছ বলো তো?—ব'লেই মন্দিরার মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললাম: ধিক্ গিন্নির গোলাম!

'বৌদি চেঁচিয়ে উঠলেন: এত বড় আস্পর্ধা? আপনি—

'মণিদা হঠাৎ কেঁপে উঠে মন্দিরাকে আমার কাছ থেকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বললেন: কেঁদো না মা! আমার আজ চোখ খুলে গেছে। হ্যাঁ, হবে বৈ কি মা, পাঠ হবে। আমি এখনি নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি লোকজনকে।

'বৌদি অসহ্য বিস্ময়ে তারস্বরে বললেন: কী?

'মণিদা উঠে দাঁড়ালেন, দেখি রাগে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে। বললেন: আমি ঢের সয়েছি মুখ বুঁজে—আর নয়—না, মেয়ে বেরিয়ে যাবে না—কোলের মেয়ে থাকবে বাপের কোলে। শুনেছিলাম তুমি ওকে মারধোর করো, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি এতদিন! মোহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, নৈলে কি বাড়ির কর্তা গিন্নির গোলাম হ'য়ে বাপের কথা পর্যন্ত ভুলে যায় স্ত্রীর ভয়ে? মরবার সময় বাবা ব'লে গিয়েছিলেন পুজো আচ্চা যেন বন্ধ না হয়! বিমলা ব'লে গিয়েছিল—আমার রূপে-লক্ষ্মী-গুণে-সরস্বতী মেয়ের যেন সংমার হাতে অনাদর না হয়। আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম—মতিচ্ছন্ন হয়েছিল ব'লে। কিন্তু শেষে এত বড় আস্পর্ধা! আমার সামনে আমার মেয়ের গায়ে হাত? বলতে বলতে মণিদা কেমন যেন ক্ষেপে গেলেন, রক্তের চাপ ওঁর বেশি ছিল, মুখ হ'য়ে উঠল টকটকে লাল, মন্দিরাকে বুকে টেনে নিয়ে বৌদিকে বললেন রুক্ষস্বরে: যাও,

যাও তুমি যাও—যাও—বেরিয়ে কালই যাও চ'লে বাপের বাড়ি—বেরিয়ে যাও—যাও আমার সামনে থেকে—যাও বলছি—ব'লেই হঠাৎ নিজের মাথা ধ'রে টলতে লাগলেন—আমি গিয়ে ধরতে না ধরতে পড়লেন এলিয়ে। মন্দিরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল—বাবা বাবা! ধরাধরি ক'রে মণিদাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হ'ল।

'ডাক্তার এসে মুখ মেঘলা ক'রে বললেন: অ্যাপপ্লেক্সি! সীরিয়াস! একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে মাথায় শুধু আইসব্যাগ ব্যবস্থা ক রে চলে গেলেন।

'এদিকে আতঙ্কে নতুন বৌদির স্বরু হল বুকের কষ্ট। সত্যিই তাঁর হার্ট দুর্বল ছিল। মাঝে মাঝেই নিঃশ্বাসের কষ্টে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতেন। অ্যাপপ্লেক্সি শুনেই তিনি মন্দিরার ঘরে গিয়ে শয্যা নিলেন। তাঁর শিয়রে এক দাসী মজুদ করে মণিদাকে নিয়ে পড়লাম—আমি আর মন্দিরা। সমস্তক্ষণ মাথায় শুধু বরফ দেওয়া—ওতে আমাতে।

'শেষ রাত্রে মন্দিরা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল—বিছানার এক পাশে। ওপাশে আমি মণিদার মাথায় আইসব্যাগ ধ'রে ঠায় ব'সে—এমনি সময়ে—তখন সবে ভোর হয়েছে—মণিদার সম্বিৎ ফিরে এল। আমাকে বললেন ক্ষীণকণ্ঠে: ভাই, আমি বাঁচব না, পক্ষাঘাতে বাঁদকটা প'ড়ে গেছে—আর একটা স্ট্রোক হ'তে না হ'তে শেষ হ'য়ে যাবে—উঃ! মাথার মধ্যে—

'ব'লেই মণিদা ফের চোখ বুঁজলেন। মিনিট পনের পরে ফের চোখ মেলে আমাকে বললেন: ভাই, আমার পাপের শাস্তি ঠিকই হয়েছে, কেবল একটি অনুরোধ···আমার অন্তিম অনুরোধ···শোনো···ঐ লোহার সিন্দুকটা খোলো··· আমার বালিশের নিচে চাবি···হাঁ···ঐ বাঁদিকে পনেরখানি এক হাজার টাকার নোট আছে নিয়ে এসো···না···আমি কী করব এ নিয়ে:···এ তোমার কাছে রইল ভাই···মন্দিরার যৌতুক, তুমি ওর বিয়ে দিও।

'বলতে বলতে মণিদার দু'গাল বেয়ে অবিশ্রান্ত জল গড়িয়ে বালিশে পড়তে লাগল। আমি মুছিয়ে দিয়ে বললাম: মণিদা! তুমি সেরে উঠে নিজেই ওর বিয়ে দেবে ভাই!

'মণিদা ম্লান হাসল: কাকে বোঝাচ্ছ ভাই!···আমি নিজে ডাক্তার—জানি তো আমার কী হয়েছে···না, আমার আশা নেই। কিন্তু সে যাক্···শোনো···আর সময় বেশি নেই···এই পনের হাজার টাকার কথা কাউকে বোলো না এখন··· মন্দিরার পাত্র ঠিক হ'লেই যখন তুমি ওকে সম্প্রদান করবে তখন···দিও ওর হাতে—এই বলা রইল। ওর এ ছাড়া আর কিছুই নেই আজ। অন্ধ আমি···

আমার যা কিছু আছে সবই তোমার নতুন বৌদির নামে লিখে দিয়েছি দানপত্রে—লক্ষ্মীপ্রতিমা মেয়েকে বঞ্চিত ক'রে—সেই পাপেই বুঝি আমার···ব'লেই মণিদা হাউমাউ ক'রে শিশুর মতন কেঁদে উঠেই উঃ! ব'লে নেতিয়ে পড়ল।

'খানিক বাদে ডাক্তার এসে মাথা নেড়ে চ'লে গেলেন। তখন নতুন বৌদির সে কী মড়াকান্না!—কিন্তু যাক এসব ফালতো কথা—যাকে নিয়ে গল্প তার কথায়ই আসি।

'মন্দিরার কাতর অনুরোধে মণিদার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত থেকে যেতে হ'ল—আরো এইজন্যে যে, ওর যৌতুকের ব্যবস্থার কথা শ্রাদ্ধশান্তির আগে ওকে বলা সম্ভব ছিল না, অথচ কথাটা ওকে না বললেও নয়।

'কিন্তু এক দুই ক'রে যতই শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে আসে ততই আমার মনে ফেঁপে ওঠে অশান্তি। পাড়াগেঁয়ে মানুষ আমি—লক্ষপতির মেয়ের বিয়ে দেব কেমন ক'রে? তাছাড়া এ যৌতুকের টাকা রাখিই বা কোথায়? সব ছাপিয়ে জেগে উঠল এক মিশকালো উদ্বেগ—বৌদি যে-লোভী, এ-টাকার কথা যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন তবে মেয়েকে কি আর আস্ত রাখবেন? এখন তো আর মণিদা নেই!

'যাহোক দিন দশেক পরে শ্রাদ্ধ শেষ হ'লে ঠিক করলাম সেইদিনই রাত্রের ট্রেনে ফিরব। সন্ধ্যার আবছা আলোয় একলাটি বাগানে বেড়াচ্ছি এমন সময়ে দেখি মন্দিরে আলো জ্ব'লে উঠল।

'এখানে থেমে মন্দিরের বিগ্রহের একটু বর্ণনা না করলেই নয়।

'পিসেমশাই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুটি মস্ত বিগ্রহ। একটি শ্রীকৃষ্ণের—বাঁশি হাতে, অন্যটি শ্রীরাধার—নীল শাড়ি-পরা। বিগ্রহ দুটি যাকে বলে লাইফ-সাইজের। কৃষ্ণেরটি মাথায় সাড়ে পাঁচ ফুট, রাধারটি পাঁচ ফুট। নিত্য পূজার জন্যে স্থাপন করা বিগ্রহ সচরাচর এত বড় হয় না, কিন্তু পিসেমশাই বলতেন হেসে: ঠাকুর-ঠাকরুণ কেউই তো বামন ছিলেন না—তাদের খাটো করব কী দুঃখে? এ ছাড়া তিনি ভালো পটুয়াকে দিয়ে চমৎকার রঙ করেছিলেন বিগ্রহ দুটির: কৃষ্ণের রঙ নীল, রাধার ধবধবে সাদা। মন্দিরে একটি মস্ত জয়পুরী সাদা পাথরের বাক্সে কৃষ্ণের পীতাম্বর ও রাধার নানারঙা বেনারসী শাড়ি মজুত থাকত—নানা উৎসবের সময়ে তাঁকে নানা শাড়ি পরানো হ'ত। এ বাক্সটির চাবি থাকত মন্দিরার কাছে। এসব বর্ণনা কেন এত খুঁটিয়ে করছি—গল্পটি এগুলেই বুঝবে।

'মন্দিরে আলো জ্ব'লে উঠতে বুঝলাম মন্দিরা এসেছে রোজকার মতন আরতি দিতে। বৌদি টাকার শ্রাদ্ধ বাঁচাতে মাইনে-করা পূজারীকে বছর দুই আগেই

বরখাস্ত ক'রে দিয়েছিলেন—সেই থেকে মন্দিরাই নিয়েছিল গৃহদেবতার নিত্য-পূজার ভার। আমি মন্দিরের দিকে এগুলাম দীর্ঘশ্বাস চেপে: কে জানে—এই হয়ত শেষবার বসা ঠাকুরের পায়ে—বৌদি হয়ত দারোয়ানকে ব'লে দেবেন আমাকে আর যেন বাড়ি ঢুকতে না দেওয়া হয়—কে বলতে পারে?

'সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের রোয়াকে উঠতেই দেখি কি, ও বিগ্রহের পায়ের কাছে ব'সে হাতজোড় ক'রে তন্ময় হ'য়ে গাইছে। আমি নিঃশব্দে ঢুকে বসলাম এক কোণে, শুনতে লাগলাম ওর গান চোখের জলের সঙ্গতে—' ব'লেই শ্যামঠাকুর চোখ বুঁজে হাতজোড় ক'রে ধ'রে দিলেন:

'সেই রূপ ধরি এসো আজ হরি, জীবনের কারাগারে,
ঝংকারে,
যুগে যুগে যার টানে অনিবার ধায় হিয়া অভিসারে—
মায়া-পারে।
প্রাণে—জয়গানে,
এসো হে ডঙ্কা বাজায়ে—শঙ্কা ঘুচায়ে অভয় তানে,
বরদানে।

*　　*　　*

'যে-মধুমুরলী উঠিলে উছলি', বাসিতে ভালো সবারে
হিয়া পারে,
দুখ সুখ হয় স'বি চিন্ময় অমৃতময় আসারে—
শত ধারে—
পারী—ভয়হারী!
অকূল পাথারে ভিড়াও সে পারে, তনুতরী যে তোমারি,
কাণ্ডারী!

*　　*　　*

'মরণ-ডমরু বাজে গুরু গুরু যবে—এসো উল্লাসি'
অমা নাশি'
ঝলি' অম্বর হে দীপঙ্কর, চিররবি পরকাশি'—
ভালোবাসি'।
শোকে—দুর্ভোগে
এসো হে অকায়া, ধরি' প্রেমকায়া এ-নিরানন্দ লোকে,
দুর্যোগে॥'

"যোগমায়া চোখ মুছল। শ্যামঠাকুর ওর দিকে চেয়ে গাঢ়স্বরে ব'লে চললেন: ওর গান শুনতে শুনতে আমিও চোখের জল রাখতে পারিনি মা! কিন্তু সেই সঙ্গে মনের মধ্যে বিষম অভিমান এল: ঠাকুরের এ কী লীলা! এমন ভক্তি যে-লক্ষ্মী-প্রতিমা মেয়ের, তাকে কি এম্‌নি ক'রেই বেঁধে মারতে হয়—যার জ্বালায় সে এই বয়সেই জীবনকে কারাগার মনে ক'রে কান পেতে শোনে মরণের ডমরু? সব বুঝেও মা, ঠাকুরকে আমার ছি ছি না ক'রে পারলাম না, বললাম মনে মনে: নিজের কর্মফলে মানুষ ভোগে—বোঝা যায় ঠাকুর। কিন্তু যার ভোগান্তি শুধু স্বৈরণ বাপের কর্মফলে, তার দুঃখ দেখে তুমি কোন্ প্রাণে হাত গুটিয়ে ব'সে থাকো—বোঝা দায়! যাক গে।

'গান থামলে ও মাটিতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল—চাপা কান্না—কেবল তার তোড়ে দেহ উঠছে কেঁপে কেঁপে। আমি আর থাকতে পারলাম না—ওর কাছে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বললাম: কাঁদে না মা। ঠাকুরকে যে এমন সুরে ডাকতে শিখেছে তার ভয় কী?

'ও মুখ তুলল। আমি চম্‌কে গেলাম! কালো মুখে সে কী আলো! মনে হ'ল—কাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম!—যার বুকে ঠাকুর নিজে এসে জ্বালিয়েছেন ভক্তির আলো তার কিসের অভাব? এই সব উল্টো-পাল্টা ভাবছি কত কী—এমন সময়ে ও আমাকে প্রণাম ক'রে বলল: কাকাবাবু! আপনি সাধুপুরুষ, মিথ্যে বলতে পারেন না, তাই বুঝি ঠাকুর আপনার মুখ দিয়ে কথা কইলেন, দিলেন ভরসা··· তবু আর একবার বলুন কাকাবাবু, আপনার দুটি পায়ে পড়ি বলুন আর একটিবার যে, ঠাকুর আমাকে নেবেন—দেবেন তাঁর রাঙা পায়ে ঠাঁই—দেবেন, দেবেন, দেবেন। আমার যে আজ তিনি ছাড়া আর কেউ নেই কাকাবাবু—তিনি আশ্রয় না দিলে দেবে কে?

'আমি ওর মাথা বুকে চেপে ধ'রে বললাম: নিশ্চয় দেবেন মা! ঠাকুর আমার মুখ দিয়েই এ-ভরসা দিচ্ছেন কি না জানি না। তবে এটুকু জানি যে তিনি আছেন—আর আছেন দূরের আকাশে নয়—আমাদেরই বুকের মাঝে। তবু সব জেনেও আমি এতদিন বুঝতে পারিনি মা—কেন তিনি তোমার এত দুঃখ সইছেন: আজ তোমার গান শুনে আমার চৈতন্য হ'ল—আমাকে ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন যে তোমাকে তিনি দুঃখ দিচ্ছেন শুধু আরো আপন ক'রে নিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা, যার কেউ নেই তার ভগবান্ আছেন। এর মানে: যে মনে প্রাণে জেনেছে যে তার আপন বলতে ঠাকুর ছাড়া কেউ নেই—ঠাকুরও তাকে আপন ক'রে নেন। অথচ এম্‌নিই আমাদের অবোধ মন মা যে, তিনি ভক্তাধীন,

মঙ্গলময় জেনেও একটু আগে আমিই তাঁকে দুষছিলাম—তোমাকে এত কষ্ট দিলেন কেন ব'লে! কিন্তু তোমার একটি কথায় ঠাকুর যেন আমার চোখ খুলে দিলেন—দেখিয়ে দিলেন অভিশাপের ছদ্মবেশে তাঁর বরদান আসে কেমন ক'রে। ধরো, যদি তুমি শুধু বড়মানুষের মেয়ে হ'য়ে বরাবর বিলাস ও আদরের কোলে টইটুম্বুর সুখেই মানুষ হ'তে তাহলে ঠাকুরের পায়ে ভক্তি তোমার হয়ত একটু-আধটু হ'ত—যেমন আর পাঁচজন আদরিণীর হয়—কেবল এমন প্রাণকাড়া সুরে কখনই আজ বলতে পারতে না যে, তোমার ঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই। মা, তিনি তাঁর ভক্তকে প্রায়ই রিক্ত করেন বটে, কিন্তু সে তো নিঃস্ব করতে নয়—বিশ্ব দান করতে। আর এ আমার পুঁথিপড়া বুলি নয় মা—হাজারো ভক্তের জীবনে এ-সত্যের এজাহার সোনার আখরে লেখা আছে। ব'লে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম: কেবল এই সঙ্গে একটি কথা তোমাকে বলি—তুমি কিন্তু কাউকে বোলো না এখন, তোমার বাবার মানা। তোমার মা-টিকে তো জানো না, তিনি জানতে পারলে আর রক্ষা রাখবেন না। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মণিদা আমাকে দিয়ে গেছেন দশের হাজার টাকা—তোমার বিয়ের যৌতুক হিসেবে। কাজেই তুমি একেবারে নিঃস্বও নও। ব'লেই চমকে উঠলাম—যেন কার পায়ের শব্দ। ভয় হ'ল—কেউ আড়ি পেতে শুনছে না তো? কিন্তু উঠে দেখতে পারলাম না, কারণ এ কথা বলতে-না-বলতে ও আমার মুখ চেপে ধরল, বলল: অমন কথা মুখেও আনবেন না কাকাবাবু! এরো পর বিয়ে? ও টাকা আপনি বিলিয়ে দিন—ঠাকুরের দাসী আর কারুর দাসী হবে না, হবে না, হবে না.—বললাম এই তিন সত্যি ক'রে। না, না, না, কাকাবাবু! কোনো কথাই শুনব না। আপনারা যদি এরো পরে জোর ক'রে আমার বিয়ে দিতে যান তবে—এই ঠাকুরের পা ছুঁয়ে বলছি—আমি বিষ খেয়ে মরব গায়ে-হলুদের আগেই। ব'লেই সে কী কান্না মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'আমি ওর পিঠে হাত রেখে বললাম: মা, কী ক'রে বোঝাব তোমার কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে কী উচ্ছ্বাসের জোয়ার জেগে উঠেছে? বিমলা বৌদি তোমার উপাধি দিয়েছিলেন রূপে-লক্ষ্মী, গুণে-সরস্বতী। কিন্তু আমার মনে পড়ছে কেবল একটি গান—মহিমাময়ী মীরার: মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো না কোঈ। গর্বে মা, আমার বুক উঠেছে দশহাত হ'য়ে যে, এমন মেয়ে এ-যুগেও জন্মায় এদেশে যে প্রাসাদে মানুষ হয়েও চায় শুধু ঠাকুরের প্রসাদ—আর আমি তার কাকা! ঠাকুরের এ-হেন কৃপাদাসীকে জোর ক'রে বিয়ে দেব আমি? কেমন ক'রে তুমি ভাবতে পারলে একথা?

'ওর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল: তবে কাকাবাবু, আমার আরো একটু সহায় হোন—যাবার আগে দিয়ে যান আমার কানে গুরুমন্ত্র—না না কাকাবাবু! আজই দিতে হবে দীক্ষা। মা আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন যে, গুরু করা চাই-ই চাই। আমি কোনো কথা শুনব না—আমি মনে মনে যে আপনাকেই গুরু করেছি কাকাবাবু। কেবল বলিনি এতদিন।

'সানন্দে ওর কানে আমি কৃষ্ণমন্ত্র দিয়ে বললাম: মা, এখন থেকে মনে রেখো তোমার নবজন্ম হ'ল—তুমি আর কারুর নও, শুধু তাঁর। তবে আর একটি কথা শুধু বলি—তোমাকে সাবধান করার জন্যে। গুরুমন্ত্র নিতে-না-নিতে নানা দিক্ থেকে আসে নানা আক্রমণ। তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি মা, যে, তোমার সাবালিকা হ'তে এখনো মাস ছয়েক বাকি। এ কয়টা মাস কোনোমতে মুখ বুঁজে থাকো। তারপর—মানে, যদি এখানে তুমি টিঁকতে না পারো—তবে এসো তোমার গরিব গুরুর ঘরে কন্যাকুমারী হ'য়ে। তোমার কাকাবাবু দরিদ্র বটে মা, কিন্তু, যদি আমার দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোটে, তবে তোমারো জুটবে॥

'ওর চোখের জলের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল এক অপরূপ হাসির ইন্দ্রধনু। মন্দিরের পঞ্চপ্রদীপের স্নিগ্ধ পবিত্র আলোয় কালো মেয়ের মুখ দেখে গান মনে পড়ে গেল: কে বলে মা আমার কালো? যার রূপে তিন ভুবন আলো!

'ও খানিকক্ষণ বিহ্বলের মতন এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে: তবেই দেখুন কাকাবাবু, ঠাকুরের কৃপার আর একটি ভঙ্গি: তিনি দুঃখ দিয়ে শুধু যে নিজের কোলে টেনে নেন তাই নয়—সেই সঙ্গে এ-সংসারে সবচেয়ে আপন জনকে চিনিয়ে দিতেও ভোলেন না যাঁর নাম গুরু। কী আনন্দ, কী আনন্দ! ব'লে ও হাততালি দিয়ে উঠল শিশুর ম'ত। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ওর মুখের ভাব বদলে গেল, বলল: কিন্তু কাকাবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি: আপনি আমার গুরু যখন—আমার দায় তো আপনারই। কথাটা এই যে, মা যদি আমাকে তাড়িয়ে, দেন, তবে ধনসম্পত্তি বাড়ি বাগান সব ছেড়ে যেতে পারি—কেবল ঠাকুরকে ছেড়ে যাব কেমন ক'রে?

'আমি হেসে বললাম: দুর্ভাবনার বোঝা আর নিজে বইতে যাবে কী দুঃখে মা, যখন ঠাকুর স্বয়ং এসেছেন তোমার তল্পি বইতে?—কিন্তু শোনো মা, আজ রাতের ট্রেনেই আমি ফিরছি—এখন এখানকার সর্বময়ী কর্ত্রী বৌদি—আর একদিনও থাকা চলে না। শুধু একটা কথা: আমার এক উকিল বন্ধু এখানে

আছেন, তাঁর কাছেই টাকাটা রেখে গেলাম সব কথা ব'লে। যদি বৌদি তোমাকে মারধোর করেন তবে তাঁর কাছে আশ্রয় নিতে সঙ্কোচ কোরো না। মণিদা একবার তাঁকে একটা খুব কঠিন অসুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বিশেষ ক'রেই বলেছেন তোমাকে জানাতে যে, তুমি তাঁকে একটু খবর দিলেই তিনি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। ব'লে বন্ধুর নাম ঠিকানা দিয়ে সেই রাত্রেই ট্রেন ধরলাম।'

"গঙ্গাজলে ফের গলা ভিজিয়ে যোগমায়ার দিকে চেয়ে শ্যামঠাকুর বললেন: 'কিন্তু মা, লীলাময়ের লীলার অন্ত পাওয়া ভার। গুরু নানকের একটি গান মন্দিরা প্রায়ই গাইত: হরিকী গতি কোঈ নহি জানে! কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাই না অভয়ের পরেও ফের আসে ভয়, সান্ত্বনার পরেও ফেঁপে ওঠে অশান্তি, বিপদ কাটতে না কাটতে হাজিরি দেয় আপদ! তবে কি জানো মা? ঠাকুর এই ভাবেই আমাদের—মানে তাঁর ভক্তদের—পরীক্ষা করেন দিনে দিনে, পলে পলে, যাতে ক'রে প্রতি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়েই আমরা সোনালি হ'য়ে উঠি—আরো, আরো, আরো। ঠাকুর যে কোন্ তুফানের মধ্যে দিয়ে কাকে কোন্ বন্দরে উত্তীর্ণ করেন—কিন্তু ভনিতা রেখে গল্পটাই বলি—তাহলেই মিলবে এ-সূত্রের সেরা ভাষ্য।

'আমার গ্রামে ফিরে আসার পরে প্রথম প্রথম মন্দিরার চিঠি পেতাম দু'তিন দিন অন্তর। সে যে কী চমৎকার চিঠি—রেখে দিয়েছি যত্ন ক'রে—দেখবার মতন। প্রতি চিঠিতেই লিখত ওর সুন্দর সুন্দর ধ্যান দর্শনের কথা—ঠাকুরের কৃপা পাওয়ার কথা—নিত্য নতুন পথে।

'কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতে ওর চিঠির সুর কেমন যেন একটু বদ্‌লে গেল। তারপর হঠাৎ আর চিঠি নেই। মনে উদ্বেগ জ'মে উঠল—দু'মাস গেল, তিন মাস গেল শেষে যখন ছ'মাস পেরিয়ে সাত মাস হ'তে চলল—ওকে চিঠি লিখেও উত্তর নেই—তখন আমার সেই উকিল বন্ধুকে লিখলাম। উত্তরে তিনি লিখলেন: সে কি? মন্দিরার যে বিয়ের সব ঠিক—এখানকার সাবজজ সুনীলবাবুর আই-সি-এস ছেলের সঙ্গে—তুমি খবর পাও নি? পত্রপাঠ চ'লে এসো, সামনের সপ্তাহেই পাকা দেখা···ইত্যাদি।

'আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি পরদিন ছুটলাম আনন্দপুর। উঠলাম আমার বন্ধুরই ওখানে। মন্দিরার সঙ্গে দেখা হ'ল মন্দিরেই। সে আমাকে দেখে প্রণাম ক'রে মুখ নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইল। তারপর সব শুনলাম।

'ও বলল : আপনি গিয়ে অবধি আপনার একটি চিঠিও পাইনি—তাই শেষটায় চিঠি-লেখা বন্ধ করেছিলাম ভেবে যে, হয়ত আমি আপনার শিষ্যা হবার অযোগ্যা, তাই আপনি আর আমার কোন সংস্রবেই থাকতে চান না। ফলে এল শুধু নিরাশাই নয়—সারা জগতের উপরে অবিশ্বাস। মনে হ'ল—গুরুও যখন ত্যাগ করতে পারেন, তখন আর ভরসা কোথায়? যা হবার হোক। আপনি বলেছিলেন গুরুবরণের পরই নানাদিক থেকে আঘাত আসে—অভিমানে, দুঃখে সে-কথাও তখন আর আমার মন নিল না। ঠিক এমনি সময়ে মা আমার হঠাৎ বিষম আদর-যত্ন শুরু ক'রে দিলেন, বোঝাতে লাগলেন রাতদিন যে সাধুরা কেউ সংসারীর সঙ্গ চায় না, চাইতে পারে না—সংসারীর আশ্রয় হ'তে পারে শুধু সংসারী, মেয়েমানুষের শুধু স্বামী—এই রকম কত সব চমৎকার যুক্তি! মন তখন আমার ভেঙে গেছে, কাজেই রাজি হলাম বিয়ে করতে—আরো এই জন্যে যে মা বললেন—আমাকে না জানিয়েই ইতিমধ্যে তিনি আমার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলেছেন—পাকা-কথাও হ'য়ে গেছে। তারপর বললেন খুব আদর ক'রে: মনে রেখো মা, যে, আমি তোমার মা—আর পাকা-কথা হ'য়ে গেছে—এখন সে-কথা ভাঙলে কেলেঙ্কারি—তোমার বাবার আত্মা স্বর্গেও শান্তি পাবে না। সবশেষে আমাকে বললেন: সেদিন মন্দিরে তিনি আড়ি পেতে শুনেছিলেন সব কথা। কিন্তু যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন সে-যৌতুকের টাকাটা চাইই চাই।

'আমি স্তম্ভিত হ'য়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: তা'হলে তুমি বিয়েতে মত দিয়েছ? ও মুখ নিচু ক'রে বলল: পাকা-কথা যখন হ'য়েই গেছে আর উপায় কি? তাছাড়া সবাই বলছেন—বিয়ে ক'রে কি আর ধর্মকর্ম হয় না? আমার মা কি ঠাকুর-সেবায় কারুর চেয়ে কম ছিলেন? ব'লেই আমার মুখের দিকে চেয়ে কেঁদে বলল: কিন্তু অমন মুখ করবেন না, কাকাবাবু! আপনার শিষ্যা হবার যোগ্য আমি নই। তাইতো আরো চাই আপনাকে নিষ্কৃতি দিতে। আপনি আমার কথা ভেবে আর মন খারাপ করবেন না—মাকে ফেলে দিন টাকাটা। যার যেমন অদৃষ্ট, কাকাবাবু! মানুষ কী করতে পারে বলুন? আপনি অনুমতি দিন—লক্ষ্মীটি।

'আমি ঘা খেলাম বৈকি: এই কি সেই মেয়ে যে দু দিন আগেও তিন সত্যি ক'রে বলেছিল—ঠাকুরের দাসী আর কারুর দাসী হবে না, হবে না, হবে না—বিগ্রহের পা ছুঁয়ে শপথ করেছিল যে, জোর ক'রে তার বিয়ে দিতে গেলে আত্মহত্যা করবে? অবিশ্যি ওর তরফের কথাটাও বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে, বড় বেশি দেরি হ'য়ে গেছে—এখন

আর ওকে বোঝাতে যাওয়া নিষ্ফল! তাছাড়া কেনই বা এসব কথা তুলে অকারণ ওর মনে দুঃখ দেওয়া—যখন ও বিয়ে করবে স্থিরই ক'রে ফেলেছে গুরুর অনুমতির অপেক্ষা না রেখে? একটা সূক্ষ্ম অভিমানও এল বৈকি: আমাকে একটা তার করতেও তো পারত! তাই বললাম জোর ক'রে হেসে: আমার অনুমতি তো বাহুল্য মা, বিয়ে করবে তুমি—সাবালিকা মেয়ে, এতে বাইরের লোকের কীই বা বলার থাকতে পারে? কেবল একটি কথা আমি তোমাকে ব'লে রাখছি: তোমার সৎমার হাতে আমি কিছুতেই তোমার যৌতুকের টাকা দেব না। পরশু দিন—মানে, তোমার পাকা দেখার দিন—সবার সামনে তোমার ভাবী শ্বশুরের হাতেই দেব। বলতে না বলতে বৌদির অভ্যুদয়—একেবারে অগ্নিমূর্তি, বললেন ঝাঁজালো স্বরে: আমার বাড়িতে আমার মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা ক'রে আমারই দুর্নাম করেন এতবড় আস্পর্ধা আপনার?

'আমি চম্‌কে উঠেছিলাম বৈকি, কিন্তু ঝড় আসন্ন দেখে পাল গুটিয়ে নিলাম, শান্ত স্বরেই বললাম: দুর্নাম তো করিনি বৌদি, শুধু—মণিদার অন্তিম অনুরোধ আমাকে রাখতেই হবে। বৌদি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন: অন্তিম অনুরোধ? মানে? তিনি কি অনুরোধ করেছিলেন—কুটুমের সামনে আমাকে অপমান করতে? মা থাকতে পাকাদেখার দিন সবার সামনে মেয়ের যৌতুকের টাকা তার শ্বশুরের হাতে ধ'রে দেবে কোথাকার কে এক পাড়াগেঁয়ে কাকা—এ কোথাও হয়? না, এর পরে সমাজে আমি মুখ দেখাতে পারব?

'আমি বললাম মৃদু হেসে: বৌদি, আপনার সব কথা সত্যি না হ'লেও এ কথার মার নেই যে এ-রকম বড় একটা হয় না। কেবল একটা কথা আপনি ভুলে গেছেন: যে সৎমা নামে সৎ হলেও আচরণে প্রায়ই হয় অসৎ, আর হয় ব'লেই মেয়ের বাপ মরবার আগে ডাক দিয়েছিলেন তার পাড়াগেঁয়ে কাকাকেই, শহুরে সৎমাকে নয়।

'বৌদি খানিক গুম্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তার পরে মন্দিরার দিকে চেয়ে ব'লে উঠলেন: এই কালামুখী! ওঠ্! চাষার সঙ্গে ভদ্দর ঘরের মেয়ে ঠাকুরের মন্দিরে ব'সে সোহাগ করে না। ব'লেই ওর হাত ধ'রে হেঁচকা টান দিয়ে ওকে উঠিয়ে আমার দিকে চেয়ে আঙুল তুলে শাসালেন: বেশ! তবে আমিও যা পারি করব—যেমন কুকুর তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা। ব'লে, মুখ বিকৃতি ক'রে: এরই নাম গুরুদেব বটে—পরের মেয়ের টাকা নিয়ে দাদার বিধবা বৌ-এর সঙ্গে কোঁদল। ব'লেই মন্দিরাকে: আয় কালামুখী! বলে না—যেমন নিখুঁৎ

চেলি—তেম্‌নি গুরু পেলি! সাধুপুরুষ নয় তো—মহাপুরুষ! পুজো আচ্চা গেল—জপতপ গেল—রইল কেবল টাকা, আর টাকা! তাও যদি নিজের টাকা হ'ত ব'লেই ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বৌদির তীরন্দাজি লক্ষ্যভেদী ছিল—মানতেই হবে। আমাকে দেখতে দেখতে পেয়ে বসল দুর্নামের ভয়। মনে হ'ল: সত্যিই তো—পরের মেয়ের টাকা নিয়ে কেন মিথ্যে ঝামেলার মধ্যে যাওয়া?—দুর ছাই, ফেলে দিই টাকাটা—যখন ও বিয়ে করবেই স্থির করেছে।

'ফিরে এসে বললাম বন্ধুকে সব খোলাখুলি। তিনি ভেবেচিন্তে বললেন: চলুন যাই সোজা সুনীলবাবুর ওখানে। তিনি পাকা লোক—সুপরামর্শই দেবেন।

'সুনীলবাবু অতি আদর ক'রে বসালেন। তাঁকে বললাম সব কথাই। তিনি শুনেই চমকে উঠলেন: বললেন: সে কি? পনের হাজার? আপনার বৌদি তো আমাদের বলেছেন—মেয়ের জন্য বাপ যৌতুক বরাদ্দ ক'রে গেছেন মাত্র পাঁচ হাজার। ব'লেই হেসে: আপনার বৌদির দেখছি কোনো গুণেই ঘাট নেই—মেয়ের বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন ঐ পনের হাজার আপনার কাছ থেকে হাতিয়ে পাঁচ হাজারে মেয়ে পার করা! বা বা বা! সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতাঃ—এখানে তো মাত্র এক-তৃতীয়াংশম্ ছাড়তে হচ্ছে। উনি দেখছি পণ্ডিতারও বাড়া—ফন্দিতা!

'আমার সব অশান্তি কেটে গেল, বললাম হেসে করজোড়ে: তবে ফন্দিতার ফন্দি ফাঁসিয়ে আমাকে আপনিই দায়মুক্ত করুন সুনীলবাবু! টাকাটা হাতে হাতে নিয়ে অধীনকে বিদায় দিন—আমি ফিরে যাই যেখানে আমার স্থান। কাল সারারাত আমি ঠাকুরের কথা ভাবতে পারিনি মশাই, ভেবেছি শুধু ভাইঝির টাকার কথা। ব'লেই বললাম: আমার গুরুদেব এখানে থাকলে হয়ত বলতেন: সর্বনাশে সমুৎপন্নে ভাইঝিং ত্যজন্তি শঙ্কিতাঃ।

'সুনীলবাবু তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে বললেন একগাল হেসে: আপনি ভাববেন না ঠাকুর, ফন্দি কি আমরাই আঁটতে জানি না? শুনুন বলি: আমার স্ত্রী কাল দুপুরে ডাকবেন আমাদের ফন্দিতা দেবীকে—আপনি আচম্বিতে পর্বতের চুড়ার মতন সহসা প্রকাশ হ'য়ে—টাকাটা তাঁর ও আমাদের সামনে আমার হাতে দিয়েই দায়মুক্ত হবেন। তারপর দেখি উনি কি ক'রে ঠেকান এ-বিয়ে। হেঁ হেঁ—ঠাকুর, বুনো ওল জব্দ বাঘা তেঁতুলের কাছে!

'আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বন্ধুর ওখানে ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম:

ঠাকুর! মুস্কিল আনতেও তুমি, তার আসান হ'তেও তুমি—আমরা কেবল মিথ্যেই মাথা বকাই ভুলে গিয়ে যে কর্তা আমরা নই। যা' হোক, অশেষ দয়া তোমার যে শেষটায় নিষ্কৃতি দিলে!

'বললাম বটে, কিন্তু মনের কোথায় তবু কী একটা যেন খচখচ করতে থাকে! রাতে সে-খচখচানি হ'য়ে উঠল টনটনানি। কিছুতেই ঘুমুতে পারি না। কেবলই মনে হয় মেয়েটার কথা যে ঠাকুরের কৃপা পেয়েও হারাতে বসেছে। কেবলই প্রশ্ন জাগে: এর নাম কি নিষ্কৃতি পাওয়া, না রণে ভঙ্গ? সত্যিই কি ঠাকুরের এই ইচ্ছা হ'তে পারে যে, যে-মেয়ে তাঁর বিগ্রহের সামনে তাঁর সেবাদাসী হবার শপথ করেছে, সে শপথ ভেঙে সংসারী হোক? কর্মফল কি নেই? সংসারীরা যাই বলুক না কেন—ঠাকুরের কাছে কথা দিয়ে সে-কথা না-রাখার ফল তো ফলবেই ফলবে। ভাবতে ভাবতে ওর অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন আমার কালো হ'য়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলল আমাকে: করছিস কী রে? সংসারীরা জোট বেঁধে ঠাকুরের-পায়ে-নিবেদিতাকে মায়ার ফাঁদে ফেলতে ছুটল—আর তুই গুরু হ'য়ে থাকবি চুপ ক'রে? মন্ত্র দিয়েই গুরুর কাজ ফুরোয় না কি? ঠাকুরের তরফের কথাটা যে শিষ্যাকে একবার বোঝাবারও চেষ্টা করবে না? শুনতে না শুনতে হঠাৎ আমার অভিমান ভয় সঙ্কোচ সব কেটে গেল, মন স্থির ক'রে ফেললাম যে ওকে একবার অন্তত ব'লে দেখতেই হবে—তারপরও যদি ও বিয়েই করতে চায়—ভালো, গুরুর আর দায়িত্ব রইল না। আর আশ্চর্য, সঙ্কল্প করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে আমার হারানো শান্তি এল ফিরে—আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

'পরদিন ভোরে উঠেই ছুটলাম মন্দিরে। এত সকালে বৌদি ওঠেন না—কাজেই ওকে মন্দিরে একা পাবই পাব। কিন্তু মন্দিরে পৌঁছতেই অবাক। দেখি কি—মেয়ে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে শ্রীরাধার একটি নীল বেনারসী শাড়ি প'রে নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে গাইছে:

ভুলবে সে কি বাসতে ভালো—আলো তোমার পেয়েছে যে?
যেথাই সে যাক—তোমারি তাল চরণে তার উঠবে বেজে।

'এ শাড়িটি থাকত মন্দিরের সেই পাথরের বাক্সে—পাড়ে শ্রীরাধার নাম লেখা। একটু আশ্চর্য হ'লাম বৈকি: শ্রীরাধার শাড়ি ওর গায়ে? তারপর মন করুণায় ভ'রে উঠল: বেনারসী শাড়ি তো ওর একটিও নেই, তাই হয়ত লোভ সামলাতে পারে নি বেচারি মেয়ে—একলা একলা প্রতিমার শাড়িই বার ক'রে প'রেছে উচিত অনুচিতের কথা ভুলে।

'তবু আমার মনে একটু কিন্তু কিন্তু ভাব ছিল—কিন্তু মন্দিরের বাহিরে থেকে

ওর নাচ দেখতে দেখতে সব ভুলে গেলাম। কী সুন্দর ভক্তিতন্ময় নাচ, কী চমৎকার ভাববিহ্বল গান!

'হঠাৎ দেখি—বৌদির মন্দিরের ঠিক সামনেই। আমাকে বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে গেলেন। এত ভোরে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না কোনোদিনও। কে জানে আজ হয়ত উঠেছিলেন ইচ্ছে ক'রেই ওর উপর চোখ রাখতে। হয়ত এসেছিলেন ফের আড়ি পেতে শুনতে—আমাকে দেখে বাধ্য হ'য়েই সরে গেলেন—কে জানে ওঁর মনে কী আছে?

'এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি—এমন সময়ে হঠাৎ ওর নাচ থেমে গেল। শ্রীরাধার শাড়ি খুলে পাট ক'রে বাক্সে রেখে নিজের শাড়ি প'রে বিগ্রহের সামনে ও গড় হ'য়ে প্রণাম করল। তারপর জলভরা চোখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখে আমি দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য হ'য়ে বলল: একি কাকাবাবু! আপনি? এত ভোরে!

'আমি বললাম: একটা কথা বলা হয়নি মা, তাই—

'কথাটা আমার শেষ হ'ল না বৌদির খনখনে চিৎকারে: এই কালামুখী! এদিকে আয়—এক্ষুনি!

'চমকে ফিরেই দেখি অদূরে একটা আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বৌদি!

'মন্দিরা ভয় পেয়ে ছুটল। না ভেবে চিন্তে আমিও ছুটলাম ওর পিছু-পিছু! বৌদি আমাকে দেখে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন: কালামুখী! শেষে রাধারাণীর শাড়ি প'রে মন্দিরে বেলেল্লামি! চল্ তো ঘরে—আজ তোরি একদিন কি আমারি একদিন!

'আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম: বেলেল্লামি কিসে বৌদি! মন্দিরে ভক্তিভাবে নেচেছে তো কী হয়েছে?

'বৌদি মুখঝামটা দিয়ে ব'লে উঠলেন: ভক্তি? এর নাম ভক্তি? ম'রে যাই—ব'লেই ওর দিকে তাকিয়ে—অলক্ষ্মী। আয়! তোর বিয়ে-টিয়ে কিছুই হবে না। দেখি তোর বিয়ে দেয় কোন্ ভক্তিমন্ত! সারা শহরে রটিয়ে দেব তোর কীর্তি—হবে ঢিঢিকার! তখন দেখব কে বিয়ে করে এমন নটীকে! ছি ছি ছি! শেষে কিনা ঠাকুরের শাড়ি চুরি ক'রে প'রে ঠাকুরেরই মন্দিরে—বেহায়া মেয়ে! তুই লজ্জার মাথা খেয়ে ব'সে আছিস। ব'লেই ওর হাত চেপে ধ'রে বললেন: চল্‌তো ঘরে, তোর দুঃখে যদি আজ কুকুর শেয়াল না কাঁদে—

'আমি আর থাকতে পারলাম না, এগিয়ে গিয়ে রুক্ষস্বরে বললাম: বৌদি, ওকে ছেড়ে দিন—ওকে আমি নিয়ে যাব আমার সঙ্গে ক'রে।

'বৌদি হাত ছেড়ে দিয়ে দু'পা পেছু হ'টে থমকে দাঁড়ালেন, তারপরে বললেন: নিয়ে যাবে? আমার মেয়েকে? বটে! আচ্ছা —ব'লেই চিৎকার ক'রে ডাকলেন—এই মালি! দারোয়ান! বেয়ারা! এদিকে আয়—চাষাটাকে দে তো ঘাড় ধ'রে বের ক'রে!

'চিৎকার শুনে চাকর চাকরানী মালি দারোয়ান সবাই হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এল। আমি সুর না'ময়ে নিয়ে বললাম: বৌদি, কী করছেন কেলেঙ্কারি বলুন তো—গেটের বাইরে রাস্তায়ও যে লোক জ'মে গেল দেখছেন না—আজ বাদে কাল মেয়ের পাকা দেখা —শান্ত হোন্।

'কিন্তু বৌদি প্রায় ক্ষিপ্তপ্রায়, শান্তি পাঠের মন্ত্রণা শোনে কে? বললেন চেঁচিয়ে: কেলেঙ্কারির কথা সাধু-পুরুষের মুখেই শোভা পায় বটে—যে সোমত্ত মেয়ের নাচ দেখে হাঁ ক'রে! বলেই ওর দিকে চেয়ে—কালামুখী! চাকর দাসীর সামনে বল্ তো—তুই ভদ্দর ঘরের মেয়ে, না সেবাদাসী যে ধেই ধেই ক'রে নাচছিলি ঠাকুরের মন্দিরে?

'ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ও বলল: আমি তো নাচিনি মা!

'বৌদি চিৎকার ক'রে উঠলেন: হারামজাদি। এর উপর আবার মিথ্যে কথা? তোর আদরের কাকাবাবুকেই আমি সাক্ষী মানছি: যদি তিনি সাধুই হন—বলুন তোর গা ছুঁয়ে যে তুই নাচিসনি! ইশ।—আমি স্বচক্ষে দেখলাম—তুই রাধারাণীর নামলেখা নীল বেনারসী শাড়ি প'রে ধিঙ্গি হ'য়ে—

'মন্দিরা বলল: না মা! সে রাধারাণী। হয়ত দূর থেকে তাঁকে দেখেই ভেবেছ আমি। নীল শাড়ি প'রে তো তিনিই দাঁড়িয়ে।

'বৌদি বললেন: বটেই তো। আর কালামুখীও তিনি, না? স্বচক্ষে দেখলাম—কালোমুখ, রাধারাণীর রঙ কি মিশকালো, না দুধসাধা?

'মন্দিরা না ভেবেচিন্তে ব'লে বসল: রাধারাণী কখনো কখনো রং বদ্লান—যেমন আজ ভোরে বদ্লেছিলেন।

'বৌদি বললেন: রং বদ্লেছিলেন? রাধারাণী কি বহুরূপী নাকি?

'মন্দিরা বলল: জানি না মা, তবে আজ সকালে তাঁর রং কালোই ছিল—স্বচক্ষে দেখা।

'বৌদি গ'র্জে উঠলেন: বটে! ব'লেই জজিয়তি সুরে আমার দিকে চেয়ে বললেন: সাধু-পুরুষ! আপনি সাক্ষী—ও বলেছে কিনা আজ সকালে

রাধারাণীর রং কালোই দেখেছে—স্বচক্ষে? ব'লেই চাকর চাকরানী মালী দারোয়ান সবার দিকে চেয়ে বললেন: আয় তোরা সবাই—সাক্ষী দিবি—মা রাধা সাদামুখী না কালামুখী। ব'লেই আতঙ্কে-বিবর্ণ বেচারী মেয়ের হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে তুললেন মন্দিরের সামনের রোয়াকে। আমরাও সবাই গেলাম পিছু-পিছু—কারুর মুখে কথাটি নেই! কে কী বলবেই বা এর পরে? কেবল আমার মন হায় হায় করতে থাকে—ভয় পেয়ে ও এ কী কাণ্ড ক'রে বসল! আহা, কী হাল হবে ওর চাকরবাকর পাড়াপড়শী সবার সামনে! অভিমানিনী মেয়ে হয়ত বিষ খেয়েই মরবে সইতে না পেরে—কে বলতে পারে?

'একবার ভাবলাম মন্দিরের দোরের সামনে দাঁড়াই—বলি: না কাউকে ঢুকতে দেব না এখন। কিন্তু একে পরের বাড়ি, তার উপর অত লোকের সামনে একা দাঁড়াব কী করে? হায় রে, হাতে যদি একগাছা লাঠিও থাকত!

'এই সব আথাল-পাথাল ভাবছি—এমন সময় বৌদি দোর খুলে ঢুকলেন মন্দিরাকে টানতে টানতে—সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে চাকর চাকরানী পাড়াপড়শী সবাই ঢুকে পড়ল, হঠাৎ কানে এল ওদের একজনের কথা: চ—চ—দেখাই যাক না তামাশা!

'কিন্তু তারপরই—' বলতে বলতে শ্যামঠাকুরের কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এল—'সে কী দেখলাম মা, এই চর্মচক্ষে—আহা! সে কি ভুলব কোনোদিনো? দেখি কি, সামনে দাঁড়িয়ে মা রাধা—কেবল দুগ্ধধবলা গৌরী নন—করুণাকোমল শ্যামাঙ্গিনী!'

"যোগমায়া চম্‌কে উঠল: 'সত্যি দেখলেন?'

"শ্যামঠাকুর ধরা গলায় বললেন—'শুধু আমিই নই মা, সবাই দেখল—এক-ঘর লোক। কেবল আমি আরো দেখলাম—যা হয়ত তারা কেউ দেখতে পায়নি: দেখলাম—মার দু'চোখে দু'বিন্দু অশ্রু টলটল করছে, আর…আর মা হেসে উঠলেন…কিন্তু মৃন্ময়ী মা নন—চিন্ময়ী, মূর্তিমতী বরাভয়া! সঙ্গে সঙ্গে চম্‌কে উঠলাম—সবাই উঠল জয়ধ্বনি ক'রে: জয়, রাধা মাঈকী জয়!

'ফের চেয়ে দেখলাম—ওরাও দেখল সবাই মুগ্ধনেত্রে—অবাক্ হ'য়ে…এখনো যেন সে মূর্তি চোখের উপর ভাসছে মা…সেই সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী কৃষ্ণময়ী রাধা—পরণে নীল শাড়ি, কানে দুল, কালো চোখে করুণার আলো, আর প্রসন্ন মুখে বরাভয় হাসি…ভক্তিমতীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে হাসছেন ঠিক যেমন মা হাসে দুষ্টু মেয়ের দিকে চেয়ে—তার দুষ্টুমিতেও আনন্দ!

"যোগমায়া রুদ্ধনিশ্বাসে বলল: 'তারপর?'

"শ্যামঠাকুর বললেন: 'তারপরই হঠাৎ শোরগোল—ধরো, ধরো, ধরো।

চেয়ে দেখি বৌদি বিগ্রহের দিকে পাগলের মত ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে কাঁপছেন। দু'জন চাকরানী গিয়ে দু'দিক থেকে তাঁকে ধরতেই পাতালফাটা চিৎকার ক'রে তিনি এলিয়ে পড়লেন। ওরা সবাই ধরাধরি ক'রে তাকে নিয়ে গেল। আমি বাকি সবাইকে দোর দেখিয়ে ইঙ্গিত করতে তারা একে একে বেরিয়ে গেল। মন্দিরের মধ্যে রইল শুধু কাকা আর ভাইঝি—গুরু আর শিষ্যা।

'ও হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে—মুখে হাসি চোখে জল। আমি ফের চোখ মুছে আবার চেয়ে দেখলাম: না, চোখের ভুল নয় তো—শ্রীরাধাই বটে, অথচ পরিষ্কার ঘন শ্যামবর্ণ—তাতে গৌরবর্ণের ছিটে-ফোঁটাও নেই! মন্দিরা লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদে—মুখে আর কোনো কথা নেই—শুধু থেকে থেকে অশ্রুরুদ্ধ সুরে: রাধারানী…রাধারানী…

'আমি গড় হ'য়ে প্রণাম করলাম…রাধারানী…রাধারানী!

* * *

"শ্যামঠাকুর চোখের জল মুছে ব'লে চললেন: 'খানিক বাদে মন্দিরা উঠে ব'সে গাঢ়স্বরে বলল: কাকাবাবু, আমাকে এবারে নিয়ে চলুন। সংসারে আর আমি থাকব না। রাধারানী যাকে ডাক দিয়েছেন তার ঠাঁই শুধু তাঁর রাঙাপায়ে, ব'লেই ভাবের আবেগে গান ধ'রে দিল:

'পায় যে তোর ঐ হাসির প্রসাদ, আঁখির আলো,
চায় না কি সে শুধুই তাকে বাসতে ভালো?
মিটালি যার যুগের তৃষা
চায় কি সে আর সুখের দিশা?
ভাঙা ঘর কি রয় ভাঙা তার শ্রীহীন, কালো—
যেখানে তুই আপনি আসিস, চাঁদের আলো!

"পুলিন প্রথম কথা কইল: 'আর আপনার বৌদি?'

"শ্যামঠাকুর চোখ বড় বড় ক'রে বললেন: 'সে আর এক কাহিনী—বলতে গেলে আর একটা গল্প হ'য়ে দাঁড়াবে।' ব'লে মৃদু হেসে: 'ঠাকুরের আমার কি কেউ অন্ত পেয়েছে দাদা! কত লীলাই জানেন তিনি! কখন বা দেন রণে ভঙ্গ, কখনো মারেন এক ঢিলে একশো পাখি, এখানে তো মাত্র দুটো। তবে এতটাই যখন বললাম তখন উপসংহারটা করি: শোনো, বলি সংক্ষেপে।

"গঙ্গাজলে ফের গলা ভিজিয়ে শ্যামঠাকুর শুরু করলেন: 'বলেছি বৌদির হার্টের অসুখ ছিল। হঠাৎ সেই শক খেয়ে আতঙ্কে সে অসুখ হ'য়ে উঠল প্রায় কালব্যাধি…শেষটায় এখন যান তখন যান। মন্দিরা সে সময় তাঁর কী সেবাটাই

করল! মাস দুই বাদে একটু ভালো হ'লে ডাক্তার বললেন: এখনো বেশ কিছুদিন বৌদিকে খুবই সাবধানে রাখা চাই, আর বিশেষ ক'রে চাই প্রফুল্ল রাখা, নৈলে পাগল হ'য়ে যেতেও পারেন। কাজেই আমি তাঁকে নানা গল্প বলে হাসাতাম—ভাগবত থেকে, চরিতামৃত থেকে, মহাভারত রামায়ণ থেকে নানা কাহিনী প'ড়ে প'ড়ে শোনাতাম। শুনতে শুনতে বৌদি একটু একটু ক'রে বদ্‌লে যেতে লাগলেন। আমি ও মন্দিরা এ নিয়ে মাঝে মাঝেই বলাবলি করতাম। মন্দিরা বলত: দেখুন কাকাবাবু, নামের শক্তি—মা যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেছেন, না? যেন ওঁর মুখের চেহারাও গেছে বদ্‌লে—রাগ, লোভ, টাকা-টাকা—কোথায় এসব? মন্দিরে যখন ধ্যান করেন—মুখে ফুটে ওঠে কী শান্তি বলুন তো?

সত্যিই তাই—দেখে শুধু আমরা না, সবাই অবাক। শেষে একদিন বৌদি বললেন: মন্দিরা! সামনে দোলপূর্ণিমা—লোকজন ডাক—কাঙালি-ভোজন হোক—প্রসাদ বিতরণ—সব।

'মন্দিরা আনন্দে নেচে উঠল। বলল: আর একটি কথা মা! এখানে কয়েকটি অনাথা মেয়ে আছে, আমাদের মস্ত বাড়ির একদিকে তারা এসে থাকুক না মা, বাড়ি তো প'ড়েই আছে—আহা, তাদেরো মাথা গুঁজবার একটা জায়গা হয়। বৌদি হেসে বললেন: বাড়ি তো তোমার মা—আমি কী বলবো বলো? তুমি যা ভালো বোঝো করো।

'দোলপূর্ণিমার দিন মন্দিরা সকালবেলায়ই নবদীক্ষিত মেয়েদের নিয়ে মন্দিরে গিয়ে কীর্তন শুরু ক'রে দিল—ও গায়, মেয়েরা দোয়ার দেয়। তারপর ভোগ দেওয়া, প্রসাদ বিতরণ, কাঙালি ভোজন—কিছুই বাকি রইল না।

'সন্ধ্যাবেলা আমি পাঠ দিলাম চরিতামৃত থেকে; তখন সবাই চ'লে গেছে, মন্দিরে শুধু আমি, বৌদি আর মন্দিরা। ভক্ত হরিদাসের কাহিনী। উপমা, শ্লোক, গান, আঁখর দিয়ে পল্লবিত ক'রে ব'লে চলেছি—কেমন ক'রে পতিতা নারী হরিদাসকে প্রলুব্ধ করতে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল: আমাকে ক্ষমা করো ঠাকুর, আমি চিনতে পারিনি; কেমন ক'রে হরিদাসের কথায় সে তার গণিকাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে হ'ল বৈরাগিনী; কেমন ক'রে সারা শহরে র'টে গেল ঠাকুরের এই অপূর্ব কৃপার কথা—এমন সময়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম বৌদির কান্না শুনে: ঠাকুরপো, তবে কি শুধু আমিই পাব না কৃপা?

'মন্দিরা বৌদির গলা জড়িয়ে ধরল: কী বলছ মা? কৃপা যদি তুমি না পেতে তবে বাবার এ-বাড়ি আজ আশ্রমের মতন হ'য়ে উঠত কি? জানো? সবাই মিলে এর নাম দিয়েছে করুণা-আশ্রম।

'বৌদি শুনেই যেন চম্‌কে উঠলেন, তারপর বললেন: মা তুমি একটি কাজ

করবে? আমার লোহার সিন্দুক খুলে সাম্‌নেই যে একটি মোটা নীল খাম আছে নিয়ে এসো তো। ব'লেই ঝনাৎ ক'রে চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আমি ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম: ঠাকুর, দেখালে বটে ভানুমতীকা খেল! দু'দিন আগে যে গিন্নি দু'চার আনার জন্যেও চাকর দাসীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্র করত—সে কি না আজ তার লোহার সিন্দুকের চাবি সরাসর ফেলে দেয় সতীনের মেয়েকে—যে ছিল তার পথের কাঁটা, চোখের বালি! তবু লোকে বলে ঠাকুর, তুমি ঠুঁটো জগন্নাথ! এমনি সময়ে চোখ পড়ল বৌদির মুখের উপর। দেখি তিনি হাতজোড় ক'রে চোখ বুঁজে ব'সে, কেবল ঠোঁট দুটি নড়ছে: হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে!...

'একটু বাদে মন্দিরা এসে তাঁর হাতে খামটি দিল। বৌদি চম্‌কে উঠে হেসে বললেন: মা, এটি তোমার বাবার দানপত্র। এতে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি, বাড়ি-বাগান, মন্দির—সবই আমাকে দিয়ে গেছেন। ব'লেই দানপত্রটি খাম থেকে বের ক'রে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন। আমরা অবাক্ হ'য়ে চেয়ে! বৌদির চোখের জলে ফুটে উঠল সে কী মিষ্টি হাসি! তারপর বিগ্রহের পায়ে গলবস্ত্র হ'য়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে মুখ তুলে মন্দিরার দিকে চেয়ে বললেন: মা গো! এই ঠাকুরের সামনে বলছি তিন সত্যি ক'রে যে আজ থেকে এ-আশ্রম একা তোমার—তোমার—তোমার। কেবল—মা, একটি মিনতি: আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে, বেশিদিন নেই—না শোনো মা, আমি জানি যে—কেবল...বলতে বলতে চোখের জল ঝ'রে পড়ল অঝোরে তাঁর দুগাল বেয়ে ··কেবল যে-দুটো দিন আর আছি রেখো তুমি ঠাকুরের পায়ে। ব'লেই বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাতজোড় ক'রে বললে: আর তোমাকে শুধু এইটুকু বলা যে ঠাকুর, কৃপা যখন করেছ একবার, আর ফিরিয়ে নিও না। টাকা-টাকা ক'রে এতদিন শুধু অশান্তিই কুড়িয়ে এনেছি ঠাকুর শুধু তোমার অহেতুক কৃপায় সব হারাবার মুখে ফিরে পেয়েছি হারানিধি—আমার দয়াময়ী ছোট্ট মা-কে। কেবল দিয়ে কেড়ে নিও না ঠাকুর, চোখ ফুটিয়ে কোরো না ফের অন্ধ! সব তোমার হোক ঠাকুর। কেবল...কেবল আমাকেও তোমার ক'রে নাও পতিতপাবন!

'মন্দিরা বৌদির গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে উঠল: মা মা মা! বৌদিরও ওর গলা জড়িয়ে যে কী কান্না!...মা...মা...মা! ঠাকুর! ঠাকুর!'

বার্বারা চোখে রুমাল দিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে থাকে। তারপর অসিতের দিকে চেয়ে হাসে আনমনা হাসি। শেষের দিকে ও ক্রমাগতই চোখ মুছছিল। ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।

প্রথম বার্বারাই কথা কইল : "দাদা, একটা কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছিল, বলব ? মনে হচ্ছিল—আমরা না জেনে কত রকম মনগড়া থিওরিই না খাড়া ক'রে থাকি—যার জন্যে পরে আসে লজ্জা !...একটু খুলে বলি।" ব'লে সুর একটু নামিয়ে : "আমার আগে আগে মনে হ'ত যে প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে তারাই যারা দুর্বল। আপনি কেমন যেন আমার চোখ খুলে দিলেন ! কারণ আমার আজকাল মনে হয় ঠিক উল্টো ; মনে হয়—জড় পাষাণকে ভালোবেসে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারে শুধু তারাই যাদের বিশ্বাসকে প্রেমকে কিছুতেই টলানো যায় না ! শুধু তাই নয়, আপনার গল্প শুনতে শুনতে আজ আমার মনে হচ্ছিল আরো একটি কথা : যে, ডাকলে ভগবান সাড়া দেন সব দেশেই বটে, কিন্তু আপনাদের দেশে প্রতিমার মধ্যে দিয়ে তিনি যেভাবে ভক্তের কাছে আপন হ'য়ে ঘরোয়া হ'য়ে ধরা দেন, সে-ভাবে কই ধরা দেন না তো আমাদের দেশের পাণ্ডা পুরুত সন্ন্যাসীদের কাছে ! লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিক বিশ্বাসী আজও প্রতিমা পুজো করেন—ভার্জিন মেরির প্রতিমার সামনে ধূপদীপ জ্বালান, যীশুর মূর্তির সামনে প্রার্থনা করেন নতজানু হ'য়ে, এমন কি পোপের লকেট গলায় ঝুলিয়ে তাকে সাধেন দেবগুরুরই মত। কিন্তু তবু আমাদের আরাধনায় তো কই প্রতিমা জেগে ওঠেন না, খেলার সাথী হ'য়ে ধরা দেন না ! বড় জোর বলেন—তুমি আমার, কিন্তু বলেন না তো—আমি তোমার—অন্তত এ-যুগে !"

তপতী হেসে বলে : "কথাটা তোমার মুখে বড় মিষ্টি শোনাল ভাই। কেবল আমারো লোভ হচ্ছে একটা পাল্টা মিষ্টি কথা বলতে—to return the compliment."

বার্বারা সকৌতূহলে বলে : "কী দিদি ?"

তপতী ওর কণ্ঠালিঙ্গন ক'রে বলে : "যে, তোমাদের দেশেও যে সত্যি দেখতে চায় তার চোখ ফোটেই ফোটে, আর ফোটান সেই একই প্রেমের ঠাকুর যিনি প্রেমের ডাকে প্রতিমায় জেগে ওঠেন—তোমার ভাষায়—'আপন হ'য়ে, ঘরোয়া হ'য়ে ধরা দিতে।"

বার্বারা সলজ্জে রাঙা হ'য়ে উঠে বলে : "চোখ ফুটল আর কই দিদি ?"

তপতী ওর গালে চাপড় মেরে বলে : "না ফুটলে কি আর ভাই তুমি এমন আষাঢ়ে গল্প শুনে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে—যা দুদিন আগে শুনলেও দিতে হেসে উড়িয়ে।"

তপতী বলল : "আর বসা নয়—আজ একটু সময় পাওয়া গেছে—টেলিফোন বাজেনি সকাল সাতটা থেকে..." ব'লে থেমে উজ্জ্বল মুখে, হাতঘড়ির দিকে চেয়ে—"বেলা নটা। এমন অঘটন এই প্রথম ঘটল। আর দেরি করা নয়—চলো দেখে আসি ঝট ক'রে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। নৈলে আর হয়ত..."

ক্রিং......ক্রিং......ক্রিং......

তপতী মুখ ভার ক'রে : "যাঃ! আজও হ'ল না।" টেলিফোন ধরে : "হ্যালো!......হ্যাঁ......কে?......মিস ব্রাউন?......নিচে লাউঞ্জে বসে?...... আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও উপরে।"

অসিত মুখ তুলে তাকায়।

তপতী বলে : হ্যাঁ, বার্বারা। কাল বলছিল না যে আর তিন চার দিনের মধ্যেই ওকে ইতালি রওনা হ'তে হবে? তাই হয়ত এসেছে।" বলেই ফিক্ ক'রে হেসে : "আজও হল না স্টেট বিল্ডিং-এর একশো-দু'তলায় ওঠা।"

অসিত হেসে বলে : "তুমি যে এতে খুব দুঃখিত তা তো মনে হচ্ছে না।"

তপতী কিন্তু হাসল না এবার : "আহা, ও মেয়েটিকে আমার সত্যি বড় ভালো লেগেছে...তোমাকে শুধু যে দাদা ব'লে ডাকে তাই নয়—সত্যিই গভীর শ্রদ্ধা করে।"

অসিত ফের হাসে : "আমাদের বাংলায় বলে—'ধোঁয়ার ছলনা করি' কাঁদি।' ভালো লেগেছে হয়ত আমাকে দাদা বলার জন্যে তত নয়—যত তোমাকে দিদি বলার জন্যে। একটু হার্ট-সার্চিং করলেই বা!"

তপতী রাগ করল এবার : "যা—ও কালই বলছিল না—যাবার আগে তোমাকে আরো কী কী জিজ্ঞাসা করতে চায়? ওকে সময় দাও না একটু—ও সত্যি জিজ্ঞাসু।"

অসিত তবু হাসবে : "ত্বাদৃং নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা—ভো নচিকেতা—তোমার মতন জিজ্ঞাসু যেন আমাদের ভাগ্যে জোটে—বলেছিলেন সাক্ষাৎ যমদেব—আমি তো কোন্ ছার।"

ক্রং......ক্রং......ক্রং......বেজে ওঠে দোরের ঘণ্টা।

তপতী দৌড়ে গিয়ে দোর খুলে দেয়।

অথ বার্বারার গলা জড়িয়ে ওদিক থেকে সখীযুগলের পুনঃপ্রবেশ।

বার্বারা অসিতকে নত হ'য়ে ভারতীয় কেতায় নমস্কার করে: "না ব'লে কয়েই এসে পড়েছি, দাদা! তবে যদি সময় না থাকে আপনার—সোজাসুজি দোর দেখিয়ে দিতে সঙ্কোচ করবেন না এই অনুরোধ।"

অসিত হেসে বলল: "তোমাকে সেদিন বলেছিলাম না আমাদের নচিকেতার গল্প, সে যমের কাছে গিয়েও অকুতোভয়ে কেবলই বলে—বলো আরো তত্ত্বকথা! শেষে যম যে যম তিনিও করলেন তাকে আশীর্বাদ, বললেন: 'বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসং মন্যে'—কিনা নচিকেতাকে পথের দিশা পাওয়া থেকে ঠেকাবে কে?—না না, ঠাট্টা নয়—বোসো, বোসো। তুমি এসে কী ভালো যে করেছ—নৈলে আজ আর কেউ কি তোমার দিদিকে ঠেকাতে পারত—" বাইরের জানালা দিয়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্‌ডিং-এর অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়ে—"ঐ শিখরে ওঠা থেকে? একটু কফি?—না না, গল্পের সঙ্গে কফির সঙ্গত না হ'লে চলে—বিশেষ এ বরফের দেশে? তপতী! ব্রহ্মবাদিনী! টেলিফোন ক'রে দাও—আর এক পট কফি।"

বার্বারা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল: "কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি দাদা! কেবলই ভেবেছি শ্যামঠাকুরের আর মন্দিরার কথা। কেবল একটা কথা মনে হচ্ছিল: আপনাদের দেশে ধরুন যদি মন্দিরার মতন কোনো মেয়ে সংসার ছেড়ে যায় দূরে—কোনো গুরুর কাছে—তাহ'লে গুরু কি তাকে দীক্ষা দিয়ে কাছে রাখেন?"

তপতী ঢুকল: "বা রে বা! যদি না রাখেন তাহ'লে আমি আমার গুরুর কাছে…"

বার্বারা হাসিমুখে বলে দেয়: "আপনার কথা ছেড়ে দিন দিদি, দাদা তো বলবেন না আপনার ইতিহাস।"

অসিত তপতীর পানে তাকায়: "বলব না কি?"

তপতী এ-প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়: "দাদা! ওকে বলো না সতীর কথা।"

অসিত বলে: "আহা, আজ তোমার কথাই বলি না একটু—"

তপতী বাধা দিয়ে বলে: "ফে—র?"

অসিত হেসে বলে: "আচ্ছা আচ্ছা, সতী সতী-ই সই। হ'লই বা নামটা সেকেলে—নাম্নীটি তো একেলেই বটেন।"

অসিত কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে শুরু করে: "বাপ ওর নাম রাখতে চেয়েছিলেন অণিমা না মঞ্জিমা। কিন্তু ওর মা ধিক্ ধিক্ ক'রে উঠলেন: "কী সব অলক্ষ্মী নাম—মাথা-মুণ্ডু নেই।" ব'লে ওর নাম রাখলেন—সতী!

তোমাদের ভাষায় এ-নামের প্রতিশব্দ নেই, তবে যদি চেস্ট, পিওর আর ফেথফুল—এই তিনটি শব্দ নিয়ে একটা তাল পাকাও তাহলে হয়ত একটু আভাস পাবে—সতী বলতেই আমাদের মনে কী ভাব জাগে। মানে ঐ যে বললাম—একান্তই অনাধুনিক। কিন্তু ওকে যতই দেখতাম ততই মনে হ'ত—এ যেন ওর নাম নয়—উপাধি, আর দিয়েছিলেন ওর মা না—স্বয়ং বিধাতা। কারণ ও ছিল আশ্চর্য পবিত্র—ছেলেবেলা থেকেই। এত পবিত্র যে অনেকেই—বিশেষ ক'রে মেয়েরা—ওকে ভুল বুঝত, ভাবত—ঢঙ। তবে—" অসিতের মুখে তির্যক হাসি ফুটে ওঠে—"এ হল সেই সনাতন বিরোধ—চ'লে আসছে সৃষ্টির সূর্যোদয় থেকে—অসাধারণদের সঙ্গে সাধারণদের গরমিল। ওকে খুব কাছ থেকে জেনে আমার একটা মস্ত লাভ হয়েছিল আরো এই জন্যে যে গড়পড়তা মেয়েদেরও এই সূত্রে যেন একটু বেশি চিনতে পেরেছিলাম কেন না দেখতে ভারি মজা লাগত যে তারা কী ফ্যাসাদেই না পড়েছে ওকে নিয়ে! ছেলেবেলায় গয়াতে একবার আমি একটি খাঁচায় কোকিল পুরে আমাদের বাংলার সামনে একটি গাছে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম—এমনি হঠাৎ শৌখিন খেয়াল হ'ল—গাছ থেকে কোকিলের কুহুধ্বনি শুনলে মন্দ কি? কিন্তু কি হ'ল যে ভারি মজা—দেখি কি, ওর খাঁচার চারদিকে এ-ডালে ও-ডালে বসেছে কাকের পার্লামেণ্ট। কোকিল যে-ই কু-উ কু উ করে ওঠে—কাকেরা দারুণ উজিয়ে ওঠে—ধরে, কা—কা—কা! ভাবটা দেখতে আমাদের মতন অথচ এ কুহু কুহুর বুডাক ডাকে কেন সর্বনাশী?"

বার্বারা হেসে বলে: "আপনি কি কাক-তত্ত্বেও বিশারদ নাকি দাদা?"

তপতী হাসিমুখে বলে: "তোমার দাদাটি যে কত কী তত্ত্বের তাত্ত্বিক ততই জানবে যতই তাঁকে চিনবে।" ব'লে অসিতকে: "কিন্তু উপস্থিত তত্ত্বকথা ছেড়ে তথ্যের আখড়াতেই নামো দাদা, লক্ষ্মীটি! বলো সতীর কথা—একেবারে গোড়া থেকে কিছুই বাদসাদ না দিয়ে।"

অসিত মাথা হেলিয়ে নটভঙ্গিতে "জো হুকুম" ব'লে খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে থেকে চোখ মেলে বার্বারার দিকে তাকিয়ে শুরু করে: "সব দেশেই বলে—অর্থের সঙ্গে পরমার্থের অহি-নকুল সম্বন্ধ। তোমাদের খৃষ্টদেবও বলেছেন গুরুগম্ভীর স্বরে: 'It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the Kingdom of Heaven': কাজেই একে ঠিক আচারগত বা সামাজিক সংস্কার ব'লে বাতিল ক'রে দেওয়া যায় না—এ-বিধান দিচ্ছেন তোমাদের পরম পিতার প্রিয়পুত্র

যাঁর ভাবধারার উপর তোমরা আজো দাঁড়িয়ে। আমাদের দেশেও ঐ কথা: আমাদের কৃষ্ণ ঠাকুর বললেন তাঁর রাণী রুক্মিণী দেবীকে—যেন একটু মৃদু হেসে:

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েন ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে।

মানে, আমি বেচারি গরিব কিনা, তাই গরিবরাই আমার আপন জন, ধনীরা প্রায় আমার দিকে ঘেঁষেন না।

"কিন্তু ঐ 'প্রায়' ক্রিয়াবিশেষণটি দিয়ে আমাদের দয়াল ঠাকুর একটু ফাঁক রেখে দিলেন ধনী বেচারিদের জন্যে! তাই বিত্তশালীদের মধ্যে ও কালেভদ্রে এক আধটা জনক, অম্বরীষ, ঋষভ, যুধিষ্ঠির, রামানন্দ, প্রতাপরুদ্রের মতন পরম ভাগবতের দেখা মেলে। নৈলে কি আর ধনীর ঘরে সতীর মতন মেয়ের আবির্ভাব হতে পারত? জনক অম্বরীষের বাল্যকাহিনী জানি না, তবে কল্পনা করতে পারি তাঁদের অভ্যুদয়ে বিজ্ঞ বয়স্কদের উৎকণ্ঠা। কিন্তু এ-ধরনের ব্যতিক্রম যখনি কেন না চোখে পড়ুক, চাক্ষুষ করি একটা জিনিস: বিধাতার দুষ্টুমি, তোমরা যাকে বলো—'round peg in a square hole': অর্থাৎ ধরো, সতী যদি হ'ত গড়পড়তা ফ্যাশনেবল আধুনিকা তাহলে ওকে বলা যেত—হ্যাঁ, বাপকী বেটী বটে! কিন্তু বিধাতা কী করলেন? না, ধনীর কন্যা ও ঘরণীর ছাঁচে ঢালাই করলেন এক জন্মবৈরাগিনীকে। ড্রামার উদ্ভব এইখানে—যেখানে যা সাজে না ঠিক সেইখানেই তার আবির্ভাব। কিন্তু এবার ভূমিকা রেখে প্রথমাঙ্কে নামি—তাহলেই বুঝবে কী কাণ্ড ঘটল এ-হেন অঘটনে;"

অসিত কফিতে চুমুক দিয়ে শুরু করে: "সতীর বাবার নাম রামপদ বাকৃচি। আসামে চায়ের ব্যবসা ক'রে বিস্তর টাকা উপায় করেন। ভাগ্যবান পুরুষ—ধুলোমুঠি ধরতেন, হ'ত সোনামুঠি। বিলেত-ফেরত—থাকতেও জানতেন বৈকি? চমৎকার বাগানবাড়ি, সুইমিং পুল—তাছাড়া দান ধ্যানও ছিল কম নয়। এক-কথায়, দেশের দশের একজন—যাকে বলে।

"কিন্তু বিধাতা সব দিয়েও রাখলেন চাপা কিস্তিতে—দিলেন না সন্তান। স্ত্রী মহামায়া দেবীর বুক ছেয়ে কেবল বিষাদ আসে ঘনিয়ে। শেষটায় তিনি কাশী গিয়ে এক সন্ন্যাসীর কথায় ব্রত নিলেন—কঠোর ব্রত। রামপদবাবু হেসে বললেন: 'যত সব মিডীভাল—!' কিন্তু অবাক কাণ্ড—বছর ঘুরতে না ঘুরতে এল কোল জুড়ে ঘর-আলো-করা মেয়ে—রূপ যেন ফেটে পড়ছে! রামপদবাবু ঘটা ক'রে সারা শহরের মান্যগণ্যদের ডেকে ডিনার দিলেন। ওদিকে মহামায়া দেবীও পিঠ-পিঠ

দশ হাজার কাঙালি ভোজন করিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আশ্রমে পাঠালেন বিশ হাজার টাকা প্রণামী। সন্ন্যাসী ঠাকুর আশীর্বাদ পাঠালেন। মহামায়া দেবী মেয়েকে নিয়ে গেলেন কাশী, বললেন: 'গুরুদেব, এর কোষ্ঠী ক'রে দিতে হবে।' সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিলেন কাশীর একজন নামকরা জ্যোতিষী—যথাকালে কোষ্ঠী পেশ করলেন। মহামায়া দেবীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল: 'ধনপতির মেয়ে হবে কি না সন্ন্যাসিনী!' রামপদবাবু গর্জে উঠলেন: 'যা যাঃ—যত সব! মেয়ে আমার রাজরাণী হবে—আর তখন ঐ ইডিয়ট গণৎকারকে ডেকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে—' মহামায়া দেবী আতঙ্কে শিউরে উঠলেন: 'চুপ চুপ—মস্ত সাধু'—ব'লে ফের প্রণামী পাঠালেন গুরুদেবকে সব কথা জানিয়ে: 'হোম করুন গুরুদেব। স্বামীর আমার যেন অকল্যাণ না হয়—উনি মানুষ ভালো, কেবল সাহেব-সুবোর সঙ্গে মিশেই যা মতিভ্রম'—ইত্যাদি।

"রামপদবাবু সাহেবি স্বভাবের আর স্ত্রী সেকেলে পতিব্রতা হ'লেও দুজনের মধ্যে ছিল গভীর ভালোবাসা। রামপদবাবু সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখতে পারতেন না, পুজাপার্বণে বিশ্বাস করতেন না—এক কথায় যাকে বলে রগচটা র‍্যাশনালিস্ট। কিন্তু এমনিই বিচিত্র মানবচরিত্র—সেকেলে পতিব্রতাকে শুধু ভালোবাসাই নয়, করতেন শ্রদ্ধা, পারৎপক্ষে তাঁর মনে কষ্ট দিতে চাইতেন না। তাই তাঁর জন্যে নিজের সুন্দর বাগানে—শোবার ঘরের পাশেই—একটি চমৎকার মন্দির তুলে দিলেন যেখানে মহামায়া দেবী ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধি করতেন জপতপ, জানাতেন প্রার্থনা—স্বামীর ও মেয়ের যেন অমঙ্গল না হয়। গৃহবিগ্রহটি ছিল কিশোর কৃষ্ণের—সাদা মার্বেলের—এক হাত উঁচু—ওজনে বিলক্ষণ ভারি, নিজ হাতে তুলে রোজ ঝাড়পোঁচ করতে তাঁকে বেগ পেতে হ'ত বৈকি, তবু আর কাউকে ছুঁতে দিতেন না ঠাকুরকে।

"এ সবই রামপদবাবুর গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রমাদ গণলেন যখন আদরিণী মেয়েও মার সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া শুরু করল। শুধু মন্দিরে যাওয়া তো নয়—দেখতে দেখতে আট বছরে পা দিতে না দিতে মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের সামনে ঠায় ব'সে শুনবে ঠাকুরের স্তব, দেখবে আরতি, মা-র সঙ্গে গুনগুন করে আওড়াবে সংস্কৃত মন্ত্র। ভাবনার কথা বৈকি!

"স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কত ক'রে মেয়েকে পাঠালেন তিনি কলকাতায়—তাঁর ব্যারিস্টার ভাই কালীপদর কাছে। কালীপদর ইতিমধ্যে হাইকোর্টে বেশ পসার হয়েছিল—আমাদের বাড়ির পাশেই ওর বাড়ি। আমার সঙ্গে তার বনিবনাও হয়েছিল সহজেই—আরো কালীপদর স্ত্রী মোহিনী দেবীর

গুণে। তিনি আমাকে ডাকতেন ঠাকুরপো—মানে স্বামীর ভাই—আমি তাঁকে ডাকতাম বৌদি ব'লে! সত্যি বড় মিষ্টি মানুষ ছিলেন বৌদি। আর কী যে গল্প! তাঁর কাছেই শুনি—সতী রামপদবাবুর ঘরে জন্মিয়ে কী বিভ্রাট বাধিয়ে দিয়েছিল—অজান্তে।

"সতী কালিপদর ওখানে যখন প্রথম আসে তখন সে সবে আট পেরিয়ে ন-য়ে পা দিয়েছে। দেখতে দেখতে সে আমার ভারি নেওটা হ'য়ে উঠল। কালিপদকে সে ডাকত কাকাবাবু, আমাকে—মামাবাবু।

"কী অপরূপ মেয়ে! শুধু কি দেখতে ফুটফুটে?—ওর প্রতি ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে সুষমা ঝ'রে পড়ত। গালে একটি কালো তিল—হাসলে তাকে কেন্দ্র ক'রে যখন টোল ফুটে উঠত তখন এমন কোনো চোখ ছিল না যে বাহবা না দেবে বিধাতার কারিগরিকে। সবার উপর ওর রং—ঠিক যেন কাশ্মীরী মেয়ের—সাদা ও রাঙার জোড় মিলেছে। কিন্তু আরো একটু বলতে হবে। রূপ নিখুঁৎ হলেও মন ভরে না যদি না তাকে আভাময় ক'রে তোলে বুদ্ধি। ওর ছিল তীক্ষ্ণ মেধা। বাপের কাছ থেকে পাওয়া বুদ্ধি, মায়ের রূপ—দুয়ে মিলে ও—ঐ যে বললাম—অপরূপা হ'য়েই ফুটে উঠেছিল।

"যখন তখন মেয়ে আমার ঘরে এসে হানা দেবে। আমি হয়ত একমনে গান গাইছি—ও শুনবে চুপ ক'রে ব'সে গান—কীর্তন—ভজন। ক্রমশ ও যেন ডুবে যেত যখন আমি গাইতাম কৃষ্ণ-কীর্তন বা শ্যামাসঙ্গীত। আমি মাঝে মাঝে সত্যিই অবাক্ হ'য়ে যেতাম। জল্পনা-কল্পনা করতাম—এমন তন্ময় হ'য়ে ও কী শোনে এ-সব ভাবের গানে?

"কিন্তু ক্রমশই আমার চোখ ফুটতে লাগল। না লেগে উপায়? এ-মেয়ে তো সামান্যি নয়—যে আমার ঘরে নিঃশঙ্কে যখন তখন এসে এ-বই ও-বই টেনে নিয়ে চুপটি করে ব'সে পড়বে—আর কী সব বই সে? নাটক নভেল গল্প রূপকথা তো নয়!—কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভক্তমাল, চৈতন্য-চরিত, রামকৃষ্ণ-কথামৃত—কখনো দেখি ওমা! বিষ্ণুপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, দেবীভাগবত নিয়ে মশগুল! ভাবি অবাক্ হ'য়ে এসবে এইটুকু মেয়ে কী রস পায়? কী বোঝে? কিন্তু বুঝুক বা না-বুঝুক রস যে ও কিছু অন্তত পেত—ওর মুখের চেহারা দেখলে সন্দেহ করার অবকাশ থাকত না।

"বছর দু তিনের মধ্যেই—তখন ওর বয়স এগারো-বারো হবে— ও আমাকে প্রশ্ন করা শুরু করল—বিশেষ ক'রে রামকৃষ্ণ-কথামৃত নিয়ে। 'আচ্ছা মামাবাবু, ঠাকুর মা কালীকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন —একথা তুমি বিশ্বাস করো?'

'অবিশ্বাস করছিস কেন?'

—'না না, অবিশ্বাস ঠিক নয়, তবে এ-ও তো হতে পারে যে শ্রীম বানিয়ে বানিয়ে লিখেছেন। আমি দেখেছি অনেক পাণ্ডা-পুরুত বানিয়ে বানিয়ে বলে—কিংবা শোনা কথাকে এমনভাবে বলে যাতে অপরের মনে হয় কেন চোখেদেখা।"

"চম্‌কে উঠি। ঠিক যে আমার ছেলেবেলাকার কথা। ওকে বললাম কোমলকণ্ঠে: 'তুই যা বলছিস তা ঠিক। তবে শ্রীম-কে আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি রে। তিনি রোজ টাটকা টাটকা লিখে রাখতেন ঠাকুরের কথা—সে-ডায়েরি আজো আছে। তাছাড়া শ্রীম ছিলেন সত্যবাদী—ভক্ত—মহাপুরুষ। মিথ্যা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়নি কোনো দিনও। তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তো তোকে নিয়ে যেতাম তাঁর কাছে—তিনি কী খুশীই হতেন! কিন্তু তুই যে ভুল ক'রে ফেললি ছাই দেরিতে জন্মিয়ে।'

"ওকে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছিল কলকাতার এক ফ্যাশনেব্‌ল্ মেয়েদের স্কুলে। বৌদির কাছে শুনেছিলাম যে. ওর মনকে ওর অজান্তে ঘুরিয়ে নেবার জন্যেই রামপদবাবু ওকে কলকাতায় পাঠান —ঠাকুর দেবতার আবহাওয়ার ছোঁয়াচ কাটাতে চেয়ে। কিন্তু ওস্তাদের মার দেখ—হবি তো হ—ও এসে পড়ল এমন এক পাতানো মামাবাবুর কাছে—যার জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ওরই বয়সে। মাঝে মাঝে ভাবতাম এই বিচিত্র যোগাযোগের কথা আর মনে মনে হাসতাম—লীলা বটে ঠাকুরের! কারণ ও যদি গৌহাটিতে থাকত, তবে ওর ধারালো মন পাণ্ডাপুরুতদের দেখে দেখে হয়ত ক্রমশ ধর্মের নামে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কেন না সব বিশ্বাস ক'রে সটান মেনে নেও শোনা কথায় ভর ক'রে—এই ধরণের বাণীতে ওর স্বাবলম্বী মন কোনো দিনই সাড়া দিতে পারত না। বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল ও রোখালো বলিষ্ঠতা। না বুঝে কিছুই নেয় না। দারুণ এঁচড়ে-পাকা মেয়ে—যাকে তোমরা বলো precocious.

"কিন্তু বিচিত্র এই যে অন্যদিকে ও ছিল কি ঠিক তেমনি অজ্ঞ! নরনারীর পরস্পরের প্রতি টান ও যে ওর কৈশোরে লক্ষ্য করেনি তা নয়—কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামাবার ওর কোনো প্রবৃত্তিই ছিল না। স্কুলের মেয়েদের সঙ্গেও ও মিশত না—কারণ তারা যে ধরণের হাসি গল্প ইয়াকি করত তাতে ওর স্বভাব-শুচি মন প্রতিহত হ'ত। হয়ত বা এরই প্রতিক্রিয়ায় ও ছুটে ছুটে আসত ওর মামাবাবুর ঘরে—যার কাছে ওর মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত।

"সময়ে সময়ে ও আশ্চর্য আশ্চর্য সব মন্তব্য করত নানা লোকের সম্বন্ধে। ভয়-

ভয় কাকে বলে জানত না, যা মনে আসবে ব'লে ফেলবে। এই জন্যে স্কুলে ওর সুনাম ছিল না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদিন আমার কাছে এসে হঠাৎ বলল : 'জানো মামাবাবু? মিস বোস না?—আমাদের হেডমিস্ট্রেস? মোটে ভালো লোক না।' আমি হেসে বললাম : 'কী বাধালি রে আবার তাঁর সঙ্গে?' ও বলল, উত্তেজিত মুখে—গাল দুটি হ'য়ে উঠল আরো লাল : 'আমার সঙ্গে কিছু বাধেনি—তিনি হাসাহাসি করছিলেন এক স্যুট-পরা ফোতো সাহেবের সঙ্গে। বলছিলেন, আমাদের দেশে কী যে সব কুসংস্কার নিয়ে আছে সবাই—ভগবান্ ভগবান্!' আমি থাকতে পারলাম না, বললাম : 'কুসংস্কার? ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বচক্ষে দেখেছিলেন—' মিস বোস তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন : 'ননসেন্স। ভগবানকে চোখে দেখা যায় নাকি?' আমি বললাম : 'আপনি কী বলছেন মিস বোস? যাঁরা চোখে দেখছেন তাঁদের কথাই বড়, না যারা দেখতে পায়নি তাদের কথাই বড়?' মিস বোস ভুরু কুঁচকে বললেন : 'তুমি এ-সবের কী বোঝো পাকা মেয়ে যে, অমন ইম্পার্টিনেণ্ট সুরে কথা কইছ? তোমার বাবা আমাকে কী লিখেছেন জানো?—যে, তোমাকে ভালো ক'রে ইংলিশ এডুকেশন দিতে—যাতে ক'রে তুমি সত্যি এন্‌লাইটেন্‌ড হ'য়ে উঠতে পারো। এসব সেকেলে মিডীভাল সুপার্স্টিশন এযুগে অচল টাকা। তাই বলি—তুমি এসব বাজে লিজেণ্ড ছেড়ে সেন্সিব্‌ল হ'য়ে বাপ-মার ইচ্ছা মেনেই চলা শুরু করো যদি ভালো চাও।' এ-সময়ে ও পড়ছে ম্যাট্রিক ক্লাসে বয়স তখন ওর চোদ্দ হবে। তখন ইংরিজি ও ভালো ক'রেই শিখেছে, কাজেই এসব বিলিতি বুকনির মর্ম ও বিলক্ষণ গ্রহণ করতে পারত।

"শুধু ইংরিজিই বা বলছি কেন—ইতিহাস, ভূগোল, কোনো কিছুতেই ও পেছিয়ে ছিল না। প্রতি পরীক্ষাতেই হ'ত ফার্স্ট—প্রাইজগুলো ছিল যেন ওর পোষা খরগোশ। কাজেই মিস বোসদের দল ওকে নিয়ে যে বেশ একটু মুস্কিলে পড়েছিলেন একথা সহজেই কল্পনা করতে পারবে। কিন্তু আদিপর্ব থেকে এবার সরাসর উদ্যোগপর্বে আসি—নৈলে এ-মহাভারত আজ সারাদিনেও শেষ হবে না।

"আমি মাঝে মাঝে গানের নিমন্ত্রণে বা বড় বড় ওস্তাদের খোঁজে আমাদের দেশে নানা শহরে টুঁ মেরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতাম—কখনো কখনো দু'তিন মাস বাদে। এই অদর্শনের ব্যবধানের দরুন আরো চোখে পড়ত ওর দ্রুত বিকাশ। দেখতে দেখতে শুধু ওর মুখের ভাব বদলে যাওয়াই নয়—বালিকা থেকে কিশোরীর বয়ঃসন্ধি-কালে যেমন হয়—ওর কথাবার্তার মধ্যেও

ফুটে উঠতে থাকে আশ্চর্য চিন্তাশীলতা—হয়ত আরো এই জন্তে যে, ও একলা একলাই থাকত বেশির ভাগ সময়ে। না যাবে থিয়েটারে, সভাসমিতিতে, না যোগ দেবে পার্টি পিকনিক খেলাধুলোয়। স্কুল থেকে এসে ফের বই নিয়েই বসবে। ওর সখী একটিও ছিল না, সখা তো নয়ই। কালিপদর বাড়িতে যুবকদের দল ওর আশ্চর্য রূপ দেখে ওর দিকে ঝুঁকবে তার জো কি? ও মেয়ে গনগনে আগুন—একটু এগুতে ওর তাপে তারা পিছু হটত। মোহিনী বৌদি থেকে থেকে ওকে ধম্‌কাতেন—কুনো ব'লে। ও বলত: 'কুনো মানে কী? এরা কেউ ভালো কথা বলে? গ্রেটা গার্বো আর মেরি পিকফোর্ড আর থিয়েটার, ম্যাচ্‌—এসব আমার ভালো লাগে না—কী করব?'

"ওর একমাত্র দরদী ছিলাম আমি। মামাবাবুকে ওর মনে ধরেছিল। মোহিনী বৌদি বলতেন মাঝে মাঝে হেসে: 'ও কী বলে জানো ঠাকুরপো? বলে: 'কলকাতায় মানুষের মতন মানুষ আছে ঐ একটি—আমার মামাবাবু। কী অগাধ পড়াশুনো—অথচ কী বিশ্বাস!' আমি শুনে তো অবাক্‌! শুধু আমিই যে ওকে লক্ষ্য করেছি তা নয়—ও মা! ও-মেয়েও আমাকে যাচাই করছে—ওর মনের নিকষে! কিন্তু তবু ভাবি—বিশ্বাস বলতে কী বোঝায় সত্যিই কি জানে ঐটুকু মেয়ে? হাজার প্রিকোশাস হোক, তবু বয়সে তো বালিকা এখনো—মানে চতুর্দশী। মোহিনী বৌদি থেকে থেকে ওর নামে নালিশ জানাতে আমার কাছে ছুটে আসতেন। বলতেন: 'ওকে একটু বুঝিয়ে বলো ঠাকুরপো—এ কী কাণ্ড! ঐটুকু মেয়ে—না খেলাধুলো, না গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, থিয়েটার, সিনেমা —কেবল বই মুখে করে থাকা? এ কি ভালো?' আমি মনে মনে হাসতাম 'আর যদি জানতে বৌদি কী সব বাঘা বই? ধর্মের বই—তত্ত্বকথা। শুধু থেকে থেকে মনে হ'ত বেচারি একলা মেয়ে, কোথাও পায় না ব্যথার ব্যথী—কাজেই আসে আমার কাছে ছুটে ছুটে সাধুসন্তদের কথা শুনতে—ওকে যতটা পারি বাঁচাব আঘাত থেকে। হায় রে, মানুষের শক্তি কতটুকু! কিন্তু সে-দুর্দৈবের কথা বলবার আগে আর একটা কথা ব'লে নিই।

"এই সময়ে ওর মনের আর একটা দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'ল। হ'ল কি, মোহিনী দেবীর ছিলেন এক গুরুদেব। তাঁকে দেখেই ও আগুন হ'য়ে উঠল। একদিন হঠাৎ আমার কাছে তুলল গুরুবাদের প্রসঙ্গ। এতদিন আমি এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কখনো আলোচনা করিনি ওর সঙ্গে—কারণ আমার মনে এ-প্রশ্ন উঠেছে। তৃষ্ণা না পেলে জলের মর্ম বোঝা যায় না, এ আমি জানতাম। কিন্তু হঠাৎ এই প্রসঙ্গে দেখতে পেলাম ও গুরুবাদ নিয়েও কিছু কম মাথা

ঘামায়নি তো! আমি ওকে বললাম যে সদ্গুরু পাওয়া জীবনের এক মহালাভ। ওর মুখ লাল হ'য়ে উঠল। আমাকে ও ভক্তি করত বটে, কিন্তু তা' বলে তর্ক করতেও কখনো পেছপাও হ'ত না—সরলভাবে ব'লে ফেলত যা ওর মনে আসে। তর্কে হারলে বলত হেসে—'হার মেনেছি।' কিন্তু যতক্ষণ না কোনো মত ওর কাছে গ্রহণীয় মনে হবে ও কিছুতেই বরণ ক'রে নেবে না অন্ধভাবে। তাই আমাকে বলল রোখালো সুরে: 'এ কি কখনো হ'তে পারে মামাবাবু, যে গুরুর খোসামোদ না করলে ভগবানের কাছে পৌঁছনো যাবে না? তা ছাড়া গুরু ভগবান্—এ কেমন কথা? মানুষ হাজার বড় হোক—কখনো ভগবান্ হ'তে পারে? তারপর ফের সেই তর্ক আর তর্ক! কিছুতেই আমার কথায় সায় দেবে না যে, ভগবান্ গুরুকে পাঠাতে পারেন তাঁর সঙ্গে ঘটকালি করতে। বলল শেষে: 'যদি কোনোদিন দেখি তেমন কাউকে তবে সে আলাদা কথা। কিন্তু গুরুগিরি আমার একটুও ভালো লাগে না মামাবাবু!' বলতে বলতে ওর চোখ উঠল ছল ছল ক'রে; বলল: 'মামাবাবু, আমাকে ভুল বুঝো না। খাঁটি সাধুসন্ত আমাদের অনেক কিছু দিতে পারেন এ আমার মন নেয়। কিন্তু যদুবাবু গুরুঠাকুরটি হ'য়ে বললেন আমি মধু চেলাকে হুজুরালির কাছে হাজির ক'রে দেব—এ অহংকারের কথা। ভগবান্ আমার মন টানেন কিন্তু তিনি সোজাসুজি না এসে এমন ঘোরালো পথে আসতেই বেশি ভালোবাসেন একথায় আমার মন সাড়া দেয় না, কী করব?'

"আমি কিছু বললাম না। ওকে আদর ক'রে শুধু বললাম: 'তবে ঠাকুর রামকৃষ্ণের লেখা কী পড়লি? তিনি বলতেন না—যত মত তত পথ? তুই তোর মত নিয়েই ঘর কর্ না রে—স্বভাবেই থাক্ না। ভগবানকে ভালোবাসাই হ'ল আসল কথা—বাকি সব তো কথার ফেনা। তাঁকে ভালবাসতে পারলে তিনিই তোকে দেখিয়ে দেবেন, তোর পথে আলো ধরতে গুরুকে ডাক দিতে হবে কি না।' ও একটু ভেবে শান্ত হ'য়ে বলল: 'এ বেশ কথা।' কী বুঝল ও-ই জানে।

"ভাবতে সত্যি আমার অবাক্ লাগত: কী অদ্ভুত মেয়ে! দেখতে 'সঞ্চারিণী লতা' কালিদাসের উপমা মনে প'ড়ে যেতো—অপরূপ মোহিনী ললিতা সবই—অথচ মনটির মধ্যে মাখনের কোমলতার সঙ্গে জড়িয়ে ইস্পাতের কাঠিন্য: বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে! তোমাদের ভাষায়—প্যারাডক্স। নৈলে গুরুবাদের নামেই যার মুখে হাসি যায় নিভে, সে কি না প্রহ্লাদ ধ্রুব অম্বরীষের কাহিনী শুনতে না শুনতে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

আমার মুখে এইসব ভক্তদের কাহিনী ও শুনত দিনের পর দিন। আমি ভাগবত থেকে সংস্কৃত শ্লোকগুলি প'ড়ে প'ড়ে বুঝিয়ে দিই আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে জল! সময়ে সময়ে বলবে: 'উঃ! ঠাকুর তাঁর ভক্তদের কেন এমন ক'রে কষ্ট দেন মামাবাবু?' ব'লেই তৎক্ষণাৎ: 'তবে বুঝি দুঃখ না পেলে ভক্তি জাগে না—এই না? কিন্তু না, তাই বা বলি কেমন ক'রে মামাবাবু? কাকাবাবুর বন্ধু মহিমবাবু না? তাঁর ছেলে মারা গেল, মেয়ে মারা গেল, স্ত্রী মারা গেল। কী কান্নাই না কাঁদলেন তিনি কাকাবাবুর কাছে এসে—এই সেদিন—এক বৎসরও হয়নি। ও মা! কাল শুনলাম তিনি হৈ হৈ করতে করতে পাটনায় গেছেন ফের বিয়ে করতে—ভাবতে পারো?' বলতে বলতে বিতৃষ্ণায় ওর মুখ মেঘলা হ'য়ে আসে, বলে: 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন একটি লাখ কথার এক কথা—উট কাঁটা ঘাস না খেয়ে পারে না—হাজার কেন না মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ুক।' চমকে উঠলাম, মনে পড়ে গেল ওর কোষ্ঠীর কথা—এ মেয়ে সংসারী হবে না। মুখে বললাম হেসে: 'কিন্তু সতী, তুই যাকে বলছিস কাঁটা ঘাস, উটের কাছে যদি মিষ্টি হয়?' ও পিঠ-পিঠ জবাব দেয়: মিষ্টি? কোনো কিছু মুখে নিলে যদি জিভ জ্ব'লে যায় তখনো কি সে মিষ্টিই থাকে? না মামাবাবু, বাবা মা যতই বলুন না কেন—বিয়ে আমি করছিনি।' ব'লেই একটু থেমে: 'আচ্ছা মামাবাবু, সকলকেই বিয়ে করতে হবে কেন? আর বিয়ে মানে কী—বলবে আমাকে খুলে? বিপদে প'ড়ে এড়িয়ে গেলাম: 'বর যখন আসবে তখন বুঝবি—এখন বললে যে-তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবি।' ও টপ্‌ ক'রে বলল: 'তবে তুমি নিজে কেন বিয়ে করলে না?'

বার্বারা হেসে গড়িয়ে পড়ে: "সোজা মেয়ে নয় দাদা! Live wire!"

অসিত বলল: "সে আর ব'লে! কিন্তু এখনি হয়েছে কী—এ তো সবে কলির সন্ধ্যে। শোনোই আগে।"

আর এক পেয়ালা কফি ঢেলে নিয়ে অসিত ব'লে চলে: "পনের বছর বয়সেই ও ম্যাট্রিক পাস করল—মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট আর সব জড়িয়ে ফোর্থ।

"খবর যখন বেরুল তখন ও গৌহাটিতে পিতৃগৃহে। ওকে আমিই প্রথম খবর দিই তার ক'রে। উত্তরে ও এক মস্ত চিঠি লিখল। তাতে প্রথম দিকে একটু নামমাত্র আনন্দ ক'রেই শুরু করল ফের সেই একই প্রশ্নাবলী নানা সুরে। 'ভগবানের কাছে পৌঁছতে হ'লে কী করতে হবে? যদি গুরু না করা যায় তবে কি পথ বিপথ হ'য়ে উঠবে? তা কখনো হ'তে পারে? ভগবানকে যে সত্যি

চায় সে তাঁকে পাবে না কেন সোজাসুজি? শাস্ত্র? কিন্তু শাস্ত্রের সব কথাই তো মানা চলে না। একযুগে শাস্ত্র এক কথা বলছে, পরের যুগে আর এক কথা—এ তো তোমার মুখেই শুনেছি, মামাবাবু! আমার প্রশ্ন: এযুগে কী করতে হবে ভগবানকে পেতে হ'লে? না, প্রশ্নটা আরো তীক্ষ্ণ: আমার মতন মন যে মেয়ের—তাকে কী করতে হবে?'

"আমি গুছিয়ে উত্তর লিখতে বসেছি এমন সময়ে এল দারুণ খবর—গৌহাটিতে ভূমিকম্প। খবরের কাগজে পড়লাম—এরকম ভূমিকম্প আসামেও নাকি কখনো হয়নি—বহু লোক মারা গেছে, বহু বাড়ি প'ড়ে গেছে ইত্যাদি।

"সতীর কথা মনে হ'ল প্রথমেই—সে বেঁচে আছে তো! ছুটে গেলাম পাশের বাড়িতে—কালিপদ নিশ্চয় বলতে পারবে। পৌঁছতে না পৌঁছতে শুনলাম মেয়েদের কান্নার শব্দ। চাকরকে দিয়ে খবর পাঠালাম। বৌদি এলেন, কিন্তু কথা বলতে পারেন না। কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে সতীদের বাড়িতে কেউ বাঁচেনি এক সতী ছাড়া—ওর বাবা মা আত্মীয়রা সব বাড়ি চাপা প'ড়ে মারা গেছে। তার এসেছে ওখানকার ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ সান্যালের কাছ থেকে। তাঁর বাড়িটা খানিকটা ধ্বংসে পড়লেও দাঁড়িয়ে আছে—সতী ও আরো অনেকে সেখানেই আশ্রয় পেয়েছে।

"কালিপদ এল, বলল, তার মাথার মধ্যে কেমন করছে। বলতে বলতে মাটিতে প'ড়ে গেল। ডাক্তার আনতে ছুটলাম। ডাক্তার এসে বলল: 'ভয় নেই, তবে পূর্ণ বিশ্রাম।' বৌদি আমাকে মিনতি ক'রে বললেন: 'ভাই, এখন তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা—গিয়ে সতীকে নিয়ে এসো এক্ষুনি।'

"আমি সতীকে তার ক'রে দিয়েই ছুটলাম শেয়ালদা ষ্টেশনে।

"ট্রেনে কী ভিড়! কান্নাকাটি করছে যে কত যাত্রী! কারুর বাপ-মা মারা গেছে, কারুর স্ত্রী-পুত্র, কারুর ভাই-বোন—সে এক অবর্ণনীয় কাণ্ড! ট্রেনে জায়গা পাওয়া ভার। অতি কষ্টে একটি কামরায় এক কোণে ঠাঁই পেলাম। মন বিষাদে কালো হ'য়ে গেছে। তবু সর্বরক্ষে, সতী অন্তত বেঁচে আছে! ঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করলাম।

"পাণ্ডুঘাটে পৌঁছে ষ্টীমারে ক'রে নদী পেরিয়ে গৌহাটি পৌঁছিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। এর আগে ছোটখাটো ভূমিকম্প দেখেছি, কিন্তু নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের এ-রূপ কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। চারদিকে গর্ত, জায়গায় জায়গায় মাটির নিচে থেকে কালো জল উঠে পুকুরের মতন হ'য়ে গেছে, এখানে ওখানে ভিজে বালি, রাস্তাঘাটে গাড়ি চলা অসম্ভব, পুলগুলির একটিও স্বস্থানে

নেই, চারিদিকে ধ্বংসে পড়া বাড়ির স্তূপ, এক একটি বাড়ি দেখলে মনে হয়... যেন কোনো বিরাট দৈত্য মহাকায় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। দু'ধারে লোকলস্কর, উর্দিপরা পুলিশ স্তূপ সরাচ্ছে আর টেনে টেনে বার করছে মরা গরুবাছুর, থেঁতলে-যাওয়া মানুষ, আধমরা নারী, অঙ্গহীন শিশু...সে চোখে না দেখলে ভাবাই যায় না। অথচ মাত্র দু'দিন আগে এখানে ছিল সাজানো বাগান···এই সব ছেলেমেয়েরাই হাসতে হাসতে খেলা করেছিল, পথিক গান গেয়ে পথ চলেছিল নির্ভাবনায়, মায়ের কোলে শিশু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল—আনন্দের হাট ছিল এ-সুন্দরী নগরী!

"ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ সান্ন্যাল চমৎকার যুবক। আমাকে সাদরে ঠাঁই দিলেন। তাঁর বাড়িটি যে কী ক'রে বেঁচে গিয়েছিল কে বলবে। সতীর আমাকে জড়িয়ে সে কী কান্না: 'বাবা নেই, মা নেই, মামাবাবু! আমার কেউ নেই—তুমি ছাড়া।'

বার্বারা চোখ মোছে: "আহা।"

অসিত ব'লে চলে: "সতীকে নিয়ে সেইদিনই কলকাতায় রওনা হলাম। ট্রেনে ওর মুখে সব শুনলাম—সব কথা বলার সময়ও নেই, দরকারও দেখি না। কেবল ওর একটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলব যার দরুন ও বেঁচে গেল মরতে মরতে। ওর জবানিতেই বলি:

"সতী বলল: 'পরশু মাঝ রাতে এক দারুণ স্বপ্ন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নে দেখছি কি, চারিদিক কাঁপছে—গুম্ গুম্ শব্দ—আর সঙ্গে সঙ্গে আশ-পাশে যেন একের পর এক সাজানো তাসের বাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে। ঘুম ভাঙতেই বিপর্যয় ভয় আমাকে পেয়ে বসল। তুমি জানো মামাবাবু, আমি স্বভাবে ভয়কাতুরে নই, কিন্তু মনে হল ছুটে বেড়িয়ে পড়ি—কেন জানি না। না, মনে পড়েছে—কী একটা স্বর যেন কানের কাছে বলল: এক্ষুনি বাইরে চ'লে যাও—মাঠে—তবে নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না সত্যি কোনো স্বর শুনেছিলাম, না আতঙ্কের দরুণ মনের ভুল। পাশে মা ও বাবার ঘরে দুম্ দুম্ ক'রে ঘা দিয়ে বললাম: বাবা! মা গো! এক্ষুনি বাইরে এসো। দেরি কোরো না।' মা চেঁচিয়ে বললেন: কী পাগলামি করছিস? এই মাঘী শীতে মাঝরাতে বাইরে যাব কী! —শোগে যা। শুনতে পেলাম ভিতরে পায়ের শব্দ, বোধ হয় বাবা উঠে জামা পরছেন দোর খুলবেন ব'লে, কিন্তু আর সেখানে তিষ্ঠুলাম না—বা তিষ্ঠুতে পারালম না বলাই ভালো—কে যেন আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে

দিল বাইরে। বাইরে এসে আমাদের টেনিস-কোর্টে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মাটির বুক ফেটে সে কী আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলোয় দেখি কি শুধু আমাদের বাড়ি নয়—সামনেই আমাদের মন্দিরটিও দুলছে। আর দুলতে না দুলতে গর্জন। আমি হতভম্ব হ'য়ে দেখি, পায়ের নিচে মাটি কাঁপছে। দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ি ঘোর শব্দ ক'রে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আর্তনাদ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, গরু বাছুরের হাম্বা...আরো সে কত রকম শব্দ।

'আমি দাঁড়িয়ে আছি...মাথার মধ্যে কেমন যেন সব খালি হ'য়ে গেছে—ভাবতে পারছি না স্পষ্ট ক'রে—এমন সময়ে দেখি হঠাৎ আমাদের গৃহমন্দিরটির চূড়া আমার পায়ের সামনে দড়াম ক'রে পড়ল—আমাদের গৃহ-বিগ্রহটিকে নিয়ে। আশ্চর্য এই বিগ্রহটির গাঁয়ে আঁচড়ও লাগেনি—আশপাশের মখমলের পর্দা জড়িয়ে সে অক্ষত দেহেই ভূমিশয্যায় শুয়ে।

'বিগ্রহটিকে দেখে আমার সাড় এল। মনে হ'ল—হাসি পায় ভাবতে—যেন ঠাকুর আমার কাছেই আশ্রয় চাইছেন। অদ্ভুত চিন্তা না? কিন্তু সত্যিই আমার মনে হ'ল এখন ঠাকুরের ভার একা আমারই। আমার কানে কানে কে যেন বলছিল: আমার দেখাশোনা করবার আর কেউই রইল না রে, তুই ছাড়া। এ নিশ্চয়ই কল্পনা—জানি—কিন্তু কেন এ-ধরনের কল্পনা জাগল আমার মনে, কে জানে? কারণ বিগ্রহটিকে আমার দেখতে ভালো লাগলেও কোনোদিনও মনে হয়নি যে জীবন্ত, কি আমার আপন জন। ভক্তি এসেছে সময়ে সময়ে ঠাকুরের মূর্তি দেখে—যেমন আর পাঁচজনের আসে তেমনি। অথচ তারপরই মনে হয়েছে: বিগ্রহ পূজা হয়ত ভালোই, কিন্তু ভগবানকে তো পাওয়া যাবে না এর মধ্যে দিয়ে। আর সব ছাড়িয়ে সেদিন রাতে কানে বেজে উঠল তোমার গাওয়া একটি গান:

আমাদের এই দেহ প্রাণ মন
সুখ দুখ এই জীবন মরণ
এও বিধাতার পুতুল খেলা—
শুধু গড়া আর ভাঙিয়া ফেলা!
শুধু দু'দিনেরি খেলা'।"

বাবারাই প্রথম কথা কইল, বলল: "আমার জীবনে দাদা, মাত্র একবার ঘটেছে এই ধরনের অঘটন। আমার মার মোটর একটা ব্রিজ থেকে উল্টে প'ড়ে যায় নদীতে—ড্রাইভার ও তিনি উভয়েই মারা যান। আমি স্বপ্ন দেখে-ছিলাম একটা মোটর উল্টে পড়ছে, তার মধ্যে আমার মা। আমি সোমবার

রাতে স্বপ্ন দেখছিলাম সানফ্রান্সিস্কোয়, মার মোটর উল্টোয় মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলায় শিকাগোতে। আমার এক বিদ্বান্ প্রফেসর বন্ধু ছিলেন, তিনি প্রফেটিক ড্রীম, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি নিয়ে অনেক দিন ধরে চর্চা করেছেন, বইও লিখেছেন দু-তিনখানা। মন দিয়ে পড়লাম সে-সব, কিন্তু তার ব্যাখ্যার বিশেষ কিছুই মর্মগ্রহণ করতে পারিনি। অথচ আশ্চর্য এই যে, তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এসব ঘটনায় যে-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন নানান্ বড় গালভরা শব্দের তাল পাকিয়ে—তাতে ক'রে অঘটনগুলি কেন জলের মতন সাফ হ'য়ে গেছে।"

অসিত সায় দিয়ে হাসল: "এঁরা বেশ থাকেন এই জাতীয় কথা দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে—আমার এক বিজ্ঞ ফরাসী বন্ধু আছেন তিনিও এই জাতীয় ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। তাঁর বিশ্বাস—যেখানে যাই কিছু ঘটুক না কেন, মানুষ বুঝতে পারবেই পারবে বুদ্ধি দিয়ে। তাই যেখানে বুদ্ধি পড়ে অথই জলে সেখানে তাঁরা বলেন, এসব হয় বানানো, নয় ভাববিলাসের কুয়াশা। কিন্তু নিশুত রাতে ঐ যে ভূমিকম্প হ'ল ও সতী বেঁচে গেল এ তো চোখে-দেখা সত্য? আচ্ছা। তারপর ওর বাবা, মা, তিন চার জন আত্মীয়, সাত আটটা চাকর সবাই বাড়ি-চাপা প'ড়ে মারা গেল এ-ওতো ভাববিলাস নয়? আচ্ছা। অথচ সতী বেঁচে গেল কেন ভূমিকম্পের স্বপ্ন দেখে? বাইরে ওকে ঠেলে পাঠিয়ে দিল কে? আরো দেখ, যদি ধরো ও এ-স্বপ্ন আর দু'মিনিট বাদেও দেখত তাহলে ঘুম ভাঙার আগেই ঘর চাপা প'ড়ে মরত তো—আর সবাইয়ের মতন? এখন আমি জানি—ওকে বাঁচিয়ে দিল ভগবানের কৃপা। কেন ঘটল এ অঘটন জানি না, তবে যাদের ধর্ম-প্রবণতা গভীর হয় তাদের তিনি এভাবে বাঁচান বা সাবধান করেন এ আমি একাধিকবার স্বচক্ষে দেখেছি। এমন কি, আমার মতন স্বভাবসংশয়ীর জীবনেও এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে একবার। হ'ল কি, দিল্লী থেকে আমেরিকা রওনা হব ব'লে ৬ই জানুয়ারী একটি প্লেনে আমার ও তপতীর জন্যে দুটি সীট রিজার্ভ করেছি, এমন সময় ৪ঠা জানুয়ারি নিষেধ এল—যেও না এ-প্লেনে। নানা অসুবিধে সত্ত্বেও সে-প্লেন ছেড়ে ৮ই জানুয়ারি আমরা একটি প্লেনে রওনা হই। হংকং-এ পৌঁছে চা খাচ্ছি, এমন সময় খবরের কাগজে পড়লাম আমাদের আগের প্লেনটি forced landing করতে বাধ্য হয়েছে—মানে, মরতে মরতে বেঁচে গেছে প্লেনের আরোহীরা। আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন এক বৈদেহী স্বর! এখন, পণ্ডিতেরা বলবেন—ধ্যেৎ, বৈদেহী আত্মা তোমাকে বাঁচাতেই বা আসবে কেন ধাওয়া ক'রে? কেন এল জানি না, তবে এসেছিল—জানি। কিন্তু প্রমাণ করব কেমন ক'রে?"

তপতী বলল: "তাইতো তোমাকে কেবল বলি দাদা, তোমার যা বলবার আছে ব'লে যাও, বুদ্ধিমন্তদের মধ্যেও তো সুবুদ্ধি থাকেন দু'চারজন—তাঁদের উদ্দেশ ক'রেই বলো, সবজান্তাদের দিয়ে কেন মাথা বকানো? তাছাড়া তুমিই তো বলো গীতার একটি কথা যে, প্রতি মানুষই চলে নিজের স্বভাবে। এই সব প্রাজ্ঞরা চলুন না নিজের বুদ্ধির নির্দেশে। কে জানে—এই ভাবে চলতে চলতে হুমড়ি খেয়েই হয়ত তাঁরা একদিন বুঝতে শিখবেন—যাকে বলে ঠেকে শেখা—আর তখন বুঝবেন তাঁদের স্বভাবের অভাব কোথায়। তাই আমিও বলি—আমরা যা বিশ্বাস করি সেই অনুসারেই চলি এসো—পণ্ডিতেরা থাকুন পাণ্ডিত্যের ব্যাখ্যানন্দে ম'জে।"

অসিত হেসে বলল: "তীরন্দাজি করেছ ভালো। মনে পড়ছে আমাদের কঠোপনিষদের একটি শ্লোক:

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানা পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

বার্বারার দিকে চেয়ে: "অর্থাৎ যম নচিকেতাকে বলছেন যে, যারা কিছু না জেনেও পাণ্ডিত্যের মোহে 'আমরা সব জানি' এই অভিমানের নির্দেশে চলে, তারা অন্ধচালিত অন্ধের মতনই বারবার পড়ে আর ঘা খায়। তাই তপতীর ও-কথা মিথ্যে নয় যে মানুষের পরম শেখা হল ঘা খেয়ে শেখা—বেশির ভাগই ঠেকে শেখে, দেখে শেখে আর কজন বলো—বিশেষ ক'রে অঘটনের রাজ্যে! তবে তর্ক ছেড়ে গল্পের রাজ্যে ফিরে আসি।"

অসিত বলল: "ট্রেনে অরুণ-ম্যাজিস্ট্রেটের কৃপায় আমরা একটা 'কূপে' পেয়ে গিয়েছিলাম। এতে কথাবার্তায় বড় সুবিধা হ'ল। আর সতী সে কত কথাই যে বলল! ওর যেখানে একটু কুণ্ঠামতন ছিল এই বিপদে কেটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মুখ গেল ওর খুলে। সব কথা বলার সময় নেই—তাছাড়া সব মনেও নেই—কেবল একটি কথা না বললেই নয়। ও বলল: 'কিছুদিন থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল মামাবাবু যে আর না, এবার ঠাকুরকে বরণ করতেই হবে—কীভাবে—তিনিই বুঝিয়ে দেবেন যদি তাঁর শরণ নিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়ই আমি সবচেয়ে বল পেয়েছিলাম। তিনি বলতেন না—মাকে তিনি বলতেন, মা, আমি কিছুই জানিনা বুঝি না তুই দেখিয়ে বুঝিয়ে দে—অমনি মা আমায় সব দেখিয়ে দিতেন। আমি জানতাম না বেদ গীতা পুরাণে কী আছে—মা আমায় সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হলে হবে কি, মামাবাবু, বাবা মাকে আমি বড় ভালোবাসতাম—বিশেষ ক'রে বাবাকে। তিনি ক্রমাগতই বলতেন—আমি

বিয়ে না করলে তিনি মনে শান্তি পাবেন না—তা'ছাড়া বিয়ে না করা মানে কী? সন্ন্যাসিনী হওয়া তো। বাবা বললেন, যেদিন আমি সন্ন্যাসিনী হব সেদিন তিনি আত্মহত্যা করবেনই করবেন। এই সময়ে গৌহাটিতে অরুণ সন্ন্যাল এলেন ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে। এই প্রথম একটি যুবক দেখলাম যে আমার দিকে ঝুঁকেও কাঙালপনা করল না। একবারও পীড়াপীড়ি করেনি আমাকে। কি জানি কেন, মানুষটিকে আমার ভালো লেগে গেল। ওকে আমি বললাম কাল রাতে আমার ঠাকুরের কথা। ও বলল আমার ধর্ম আমারই, সে বিষয়ে কোনো কথাই কইবে না। তবে একথা বলল সঙ্গে সঙ্গে যে, প্রথম দিন থেকেই আমাকে ও ভালবেসেছে এবং কামনা করেছে। তাই যদি আমি ওকে একটা ট্রায়াল দিই তবে হয়ত আমাকে খুব পস্তাতে না হ'তেও পারে। ব'লে একটু হাসল। আমি ওর টোনে একটু আঘাত পেলেও বুঝলাম ওর ব্যথা আমার ব্যথা দিয়ে। তাই শেষ রাতে ওকে বললাম, আমাকে একটু সময় দাও। তখন ও বলল যে আমার বাবার একটি চিঠি ওর কাছে আছে। তিনি ওকে লিখেছিলেন যে, যদি তিনি হঠাৎ মারা যান, যেন, অরুণ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। অরুণ তাঁকে কথা দেয়! এ-চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি কাল শেষ রাতে ভেঙে পড়লাম! যে বাবা আমাকে এত ভালোবাসতেন তাঁর অন্তিম ইচ্ছার মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে—আমি করব বিবাহ।'

"কলকাতায় ওর কাকার ওখানেই বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ের পর অরুণ ওকে নিয়ে গেল শিলঙে। সেখান থেকে ওর খবর অনেকদিন পাইনি। হঠাৎ বছর পাঁচেক বাদে ওর এক চিঠি। লিখল—ওর একটি ছেলে হয়েছে, তার বয়স এখন চার বছর, কিন্তু ওর জন্মের পর থেকেই সতী বুঝতে পেরেছিল যে, বিবাহিত জীবন-যাপন করা ওর পক্ষে অসম্ভব। ও লিখল, বিয়ে বলতে কী বোঝায় ও সত্যিই জানত না। কিন্তু জানার সঙ্গে সঙ্গেই ও টের পেয়েছে যে এ-পথ ওর জন্যে নয়। অথচ কী করবে, কোথায় যাবে ও?—জিজ্ঞাসা করল চিঠির শেষে। তার পরে এক পুনশ্চ দিয়ে লিখল: সব কথাই তোমাকে খুলে লিখলাম মামাবাবু—না লিখে পারলাম না ব'লে। আজ আমি বড়ই বিপন্ন অথচ কেউ নেই আমাকে পথ দেখাতে। সঙ্কটও বিষম। আমার স্বামী সত্যিই ভদ্র ও দরদী, আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আমিও তাঁকে ভালোবাসি—তবে যেভাবে তিনি চান, সেভাবে নয়। সবার উপর এই যে এল শিশু, এর জন্যে তো আমি দায়ী? অথচ সংসারে আমি টিঁকতে পারছি না—কেবলই কানে বাজে আজকাল তোমার একটা গান:

তুমি, আপনার হ'তে হও আপনার
যার কেহ নাই তুমি আছ তার···

এ অবস্থায় তুমি যদি আমাকে পথের নির্দেশ না দাও, আর কে দেবে বলো' ?"

অসিত বলল : "ও বিপন্ন হ'য়ে আমার কাছে উপদেশ চাওয়াতে আমি হ'য়ে পড়লাম যেন আরো বিপন্ন। সব কথা বলব না···শুধু এইটুকু বলি যে, ঠিক সে-সময়ে আমিও পড়েছি এম্‌নি এক উভয়সঙ্কটে। গুরুদেবকে তুমেলে দেখে এসেছি, কিন্তু তুমেলের যোগাশ্রমে তিন চারশো শিষ্যের ভিড়ের মধ্যে পড়তে মন নারাজ। অথচ গানেও পাই না শান্তি। এখানে ওখানে নানান্ সাধুর দেখা পাই—তাঁদের মুখে শুনি একই কথা—যে, ভগবান্‌কে পেতে হ'লে সব ছাড়তে হবে, দু'নৌকায় পা দিয়ে চললে মুক্তি নৈব নৈব চ। ভেবেচিন্তে ওর প্রশ্ন খানিকটা এড়িয়েই ওকে লিখলাম যে, যে নিজেই পথ খুঁজছে সে আর একজনের পথের নির্দেশ দিতে পারে না। তা'ছাড়া বিবাহ ও শিশুর দায়িত্ব যে ঠিক কী বস্তু আমি কল্পনায় কিছু জানলেও সে-জানার উপর ভর ক'রে অপরের দিশারি হবার দায়িত্ব নিতে ভরসা পাই না। উত্তরে ফের এল এক মস্ত চিঠি। আমি তখন কাশীতে শ্যামঠাকুরের কাছে! ও লিখল আগাগোড়া শুধুই বিগ্রহের কথা। লিখল—যতই দিন যাচ্ছে এই বিগ্রহ ওকে টানছে। অথচ এ-টান কিসের ও বোঝে না, কেন বিগ্রহকে এমন ভালোবাসল তারও কোনো তল পায় না। সবচেয়ে মুস্কিল এই যে, ওর কেবলই মনে হয় যে, এই পাষাণবিগ্রহ কিছু সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী ভগবান্ নয়। তবে? উপায় কি? শেষটায় সে তো চিঠি নয়—কান্না—'তোমার কী মনে হয় আমাকে বলতেই হবে মামাবাবু। তুমি এভাবে স'রে দাঁড়ালে আমি কার কাছে যাব বলো? আমার আর কে আছে যে ব্যথা দিয়ে আমার ব্যথা বুঝবে? আর যদি গুরু ছাড়া পথ না-ই থাকে, তবে কোথায় আমার গুরু মিলবে এটুকু অন্তত তোমাকে ব'লে দিতেই হবে।'

শেষটায় ভেবেচিন্তে শ্যামঠাকুরকে সব কথা ব'লে দেখালাম এ-চিঠি! তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠল, তিনি বললেন : 'আমি কী বলব ভাই? কী জানি আমি? এ হ'ল বড় ঘরের শিক্ষিতা মেয়ের কথা—তাদের মনের রঙ-ঢঙ, মতিগতি আমার অজানা। আমি শুধু জানি যে গুরু ইষ্টদেবের প্রতিনিধি হ'য়েই দেখা দেন—কেবল সময় হ'লে তবে। তাই শুধু এইটুকুই বলতে পারি নির্ভয়ে যে, ও যদি ওর ইষ্টকে ডাকার মতন ডাকতে পারে তবে তিনি গুরু মিলিয়ে দেবেনই দেবেন—মানে, যদি গুরুবাদের পথ ওর স্বধর্ম হয়। কারণ গুরুদেবের শ্রীমুখে এও শুনেছি যে, সবাইকে ঠাকুর এক ছাঁচে ঢালাই করেন না,

কেউ ইষ্টকে পায় গুরুর মাধ্যমে, কেউ বা সোজাসুজি। তবে একথা বলতে পারি ভাই—কারণ এ আমি ঠেকে শিখেছি যে, এই যে মনের বিমুখতা এ কিছুই নয়। মনে আলোর বান ডাকতে না-ডাকতে এ-জাতের যুক্তিতর্কের জাঙাল যায় ভেসে। আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রথম যেদিন গুরুদেবের মুখে শুনলাম যে, আকাশবৃত্তি যে-সাধক নিয়েছে তার পক্ষে সঞ্চয় সাবধানতা বিধর্ম। শুনে, ভাবো একবার, আনন্দগিরির মতন গুরুর কথায়ও মন আমার শিরপা তুলেছিল। হয়েছিল কি, আমি আকাশবৃত্তি নেওয়ার পরেও আমার স্ত্রী ও মেয়ের জন্যে দশ হাজার টাকার যে-একটা বীমা করেছিলাম তার টাকা পাঠাতাম মাস মাস! গুরুদেব বললেন, এ হ'ল ভাবের ঘরে চুরি—পলিসির টাকা পাঠানো বন্ধ করতেই হবে। আমি মুখে কিছু, বললাম না বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম—এ যে জুলুম, জবরদস্তি। গুরুদেব হেসে বললেন: একটা গল্প শোন বাবা। এক যে ছিলেন মেমসাহেব। সবাই বলত: আহা হা, কী ভক্তি রে, কী বিশ্বাস! গির্জায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেন! মেমসাহেবের ছিল একটি আট বছরের ছেলে। একদিন আকাশে খুব মেঘ করেছে ব'লে ছেলে বলল: আজ গির্জায় যাব না' মা। মা বললে হেসে: বৃষ্টির ভয় করছিস? ওরে, আমি যে প্রার্থনা করেছি এইমাত্র—যেন ঘণ্টা দুই-এর মধ্যে বৃষ্টি না আসে। ঈশ্বর শুনেছেন সে-প্রার্থনা—বৃষ্টি আজ হবে না দেখিস যতক্ষণ না আমরা গির্জা থেকে ফিরি। ছেলে বলল: তবে তোমার হাতে ছাতা কেন মা?' শ্যামঠাকুর বললেন হেসে: 'তখন আমার চৈতন্য হ'ল, গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাক ম'লে তবে আপৎশান্তি। হয়েছে কি ভাই, আমাদের এই ফাজিল মনটির গড়নই এম্‌নি—সে ভাবে আজ যা ভাবছি ও যেভাবে ভাবছি, তার আর মার নেই। কিন্তু যখন ঘরছাড়া বাঁশি ডাকে রে দাদা, তখন কী যে ওলটপালট হ'য়ে যায় চক্ষের নিমেষে!' ব'লে মুচকে হেসে: 'মনে পড়ে গ্রামে সে কী তোলপাড় যখন আমি বীমার টাকা পাঠানো বন্ধ করলাম—সবশুদ্ধ হাজার দুই টাকা পাঠানোর পরে। গ্রামের মোড়লরা হাঁ-হাঁ ক'রে এসে পড়লেন: করলে কী শ্যামলাল! এক বুড়ো শালিকের পাল্লায় পড়ে কি না দু দু হাজার টাকা খোয়ালে! কিন্তু তাদের কী ব'লে বোঝাবো বলো যারা কল্পনাও করতে পারে না সাধক ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবের দিকে উধাও হয় কিসের টানে, কেন? মীরাবাঈয়ের সেই যে গানটা, মনে নেই—ঘায়েলকী গতি ঘায়েল জানে ঔর না জানে কোই?'

"আমি সতীকে এসব কথাই লিখে দিলাম, শেষে পুনশ্চে জুড়ে দিলাম যে, বাইরের লোকের উপদেশ বেশি না নেওয়াই ভালো—মহাভারতে বলেছে

'কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা'—বিধাতার বিধান ফলে সময় হ'লে তবেই। ঘোলা জলকে থিতিয়ে যেতে দিলে অনেক সময়েই সে তার স্বচ্ছতা ফিরে পায়।

"উত্তরে সতী খানিকটা শান্ত হ'য়েই লিখল যে, ওর মন একথা নিয়েছে, আর ওর স্বামীর সঙ্গে খুব খোলাখুলি কথা হ'য়ে শেষে এই স্থির হয়েছে যে, এক বৎসর ও কোথাও গিয়ে একলা থাকবে—শুধু বিগ্রহ নিয়ে। ওর স্বামী অগত্যা সম্মতি দিয়েছেন, কেবল অনুরোধ করেছেন যে, তাঁর ভগিনীপতি, মা ও বোনের সঙ্গে রাওলপিণ্ডিতে গিয়ে থাকতে। এ-এক বৎসর তাকে কেউ বিরক্ত করবে না—এমন কি শিশু রজত থাকবে বাপের কাছেই—শিলঙে। সবশেষে ও লিখল: 'কিন্তু মামাবাবু, একদিকে আমার শাশুড়ী-ননদ ঘোর সংসারী, অন্যদিকে আমার ডাক্তার নন্দাই ঘোর মডার্ন সায়েন্টিফিক, তর্কবুদ্ধিবাদ ছাড়া কিছুই মানেন না। কাজেই এঁদের সঙ্গে ঘর করতে হবে—ভাবতেও আমার বুক কেঁপে না উঠুক, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ-ছাড়া উপায়ই বা কী? আমার কাকা ও কাকিমার অবস্থাও যে তথৈবচ। অবিশ্যি হয়ত এ মন্দের ভালো যে, আমার কাকিমা গুরুবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি মামাবাবু এঁরা—সবাই হয়ত নয়, কিন্তু বেশির ভাগ গুরুবাদীই—গুরু গুরু ক'রে গদ্‌গদ্ হ'য়ে উঠলেও ভগবানের জন্য গুরু এতটুকু ছাড়তে বললেই শিরপা তোলেন। কিন্তু যখন সংসারের দিকে চেয়ে দেখি তখন কি দেখতে পাই ত্যাগ না ক'রে কেউ পাওয়ার মতন কিছু পেয়েছে? অথচ কাকিমার মতন উচ্ছ্বাসিনীরা—(বোধ হয় মেয়েদের মধ্যেই এঁদের দেখা বেশি মেলে, না?)—ভাবেন যে, সংসারকে প্রাণপণে আঁকড়ে থেকে শুধু গুরু গুরু ক'রে গলদশ্রু হ'য়ে উঠলেই ভগবান্ সরাসরি এসে বলবেন—এই যে, এসেছি বৎসে।

'অবশ্য গুরুর মতন গুরু পেলে হয়ত অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে—বলতে পারি না। কিন্তু সেদিকেও অথৈ জল! কোথায় তেমন গুরু? আমি পরচর্চা করতে ভালোবাসি না—তুমি জানো, কিন্তু শুধু মনের দুঃখে তোমাকে জানাতে চাই ব'লেই বলছি—কাকিমার এই গুরুদেবটি একদিন আমাকে কী বলেছিলেন শুনবে? তখন আমি কলকাতায়। কাকিমা হঠাৎ আমাকে এসে বললেন: তোর কী ভাগ্যি রে! গুরুদেব বলেছেন তুই বড় সুলক্ষণা মেয়ে, তোকে ডাকছেন আশীর্বাদ করতে। কী করি? গেলাম। তিনি আমাকে নানান্ যোগবিভূতির কথা ব'লে শেষে বললেন যে, তিনি ধ্যানে দেখেছেন আমি তাঁর শিষ্যা, তা আবার শুধু এ জন্মের নয়, জন্মজন্মের—সোজা কথা নয়! আমি স্রেফ ব'লে দিলাম মুখের উপর যে তিনি দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু আমি

যতক্ষণ না দেখছি ততক্ষণ কারুর শিষ্যা হ'তে পারব না। তিনি করুণার হাসি হেসে বললেন: অন্ধ অজ্ঞানেরা কি কিছু দেখতে পায় মা, যতক্ষণ না জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দিয়ে গুরু তাদের চোখ ফুটিয়ে দেন? ব'লে গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ—জাতীয় একগঙ্গা গালভরা সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে আমি ক্ষমা না চাইতেই আমাকে ক্ষমা ক'রে ফেলে বললেন: ত্রিকালদর্শী মুনিঋষিরা কি সাধে বলেছিলেন মা, যে গুরু বিনা ভগবান্ মিলতেই পারে না? আমি বললাম: কেন? রমণ মহর্ষি? শুনে তিনি একটু হকচকিয়ে গেলেন, বললেন: এখন থাক্ এসব আলোচনা, তুমি বুঝবে না—তোমার এখনো সময় হয়নি—দুঃখের আগুনে পুড়ে চিত্তশুদ্ধি হ'লে তখন বুঝবে, যেমন বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন রামকৃষ্ণকে। আমি পিঠ-পিঠ উত্তর দিলাম: গুরু কী বস্তু না বুঝতে পারি, কিন্তু একটু বুঝেছি ছেলেবেলায়ই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছিলেন মহাপুরুষ—যাঁদের জুড়ি হাজার বছরেও দু-একটির বেশি মেলে কিনা সন্দেহ। হেসে মরি, মামাবাবু! কার সঙ্গে কার তুলনা! যেন গুরুবাদের ময়ূরপুচ্ছ পরতে না পরতে দাঁড়কাক গুরু রামকৃষ্ণ ময়ূর বনে যায়! না মামাবাবু, গুরুবাদের ভড়ং ঢের শুনেছি—ক্ষ্যামা দাও। কিন্তু ঐ দেখ, কী ধান ভানতে শিবের গীত এসে গেল! বলছিলাম কি, ভেবেচিন্তে শেষটায় স্থির করলাম—বরং আমার শাশুড়ী, ননদ, নন্দাই-এর সঙ্গেই থাকব—কেননা কাকা-কাকিমার সঙ্গে থাকলে এই গুরুটি গায়ে প'ড়ে এসে নানা ছাঁদে নিজের মহিমা প্রচার করবেন আর আমার মুখ বুঁজে শুনতেই হবে। কাজ কি ঝামেলায়? তাই আমার শাশুড়ী-ননদকে উনি লিখে দিলেন যে, আমি সেখানে নিজের ব্যবস্থায়ই থাকব—আমার সঙ্গে যাবে আমার চাকর, দাসী ও আমার মোটর ড্রাইভার। মোটর নিয়ে যাচ্ছি—কেননা, ইচ্ছা আছে একবার রাওলপিণ্ডি থেকে দুমেলে গিয়ে স্বামী স্বয়মানন্দকে দর্শন ক'রে আসব! কে জানে তাঁকে দেখলে হয়ত আমার গুরুবাদে অশ্রদ্ধা কাটবে। হ্যাঁ—বলি কি, তুমিও এসো না মামাবাবু, তোমার সঙ্গেই যাই দুমেল। সত্যি, তোমার গান শুনতে কী যে ইচ্ছে করে! কতদিন তোমার গান শু'নিনি বলো তো—ছ বছর হ'তে চলল। তুমি রাওলপিণ্ডিতে আমার অতিথি হ'য়েই থাকবে—ওঁরা কিছু বলবেন না, শুধু আমার স্বামীর মত আছে ব'লেই নয়, আমার একটা মস্ত সুবিধে আছে এই যে, আমার ননদ, নন্দাই সবাই টাকাকে বড় খাতির করেন। আমি বড় মানুষের শিক্ষিতা মেয়ে, নিজের নামে ব্যাঙ্কে টাকা রাখি—এতেই ওঁরা ভড়কে গেছেন। আমার শাশুড়ী আমাকে সেদিন লিখেছেন যে, আমি রাওলপিণ্ডিতে যেভাবেই কেন

না থাকতে চাই, ওঁরা কথাটি কইবেন না। এ ছাড়া আরো একটা ভরসার কথা এই যে, যোগাযোগটা ঘটেছে ভালো। হয়েছে কি, ওঁরা চান আমি স্বামীর কাছে ফিরে যাই। আমার স্বামীও ওঁদের সেদিন লিখে দিয়েছেন যেন ওঁরা কেউ আমার সঙ্গে আজে-বাজে তর্কাতর্কি না করেন—কেন না, আমি রোখালো মেয়ে, জোর ক'রে বা ভয় দেখিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু করিয়ে বা বলিয়ে নিতে পারবে না। তাই তোমাকে ডাকছি—এসো অকুতোভয়ে।'

"তুমেল যাবার প্রসঙ্গে আমার মন উঠল উজিয়ে। হয়ত এই ভাবেই আমার বন্ধন কাটবে—আমি আশ্রমবাসী হবার সাহস পাব। ভেবেচিন্তে ওকে কাশী থেকে লিখলাম যে, যদি ও রাওলপিণ্ডি যায়, তবে সেখানে একটু সুস্থির হ'য়ে ব'সে যেন সব কথা খুলে আমাকে জানায়—আমার অনেক দিন থেকে আর একবার তুমেল যাওয়ার সাধ আছে—ওর মোটরে বেশ আরামেই যাওয়া যাবে।

"এর উত্তর আসতে দেরি হ'ল। মাসখানেক পরে এল সতীর চিঠি কাশী ঘুরে। আমি তখন দিল্লীতে আমার এক মাসিমার ওখানে। এবার ছোট চিঠি। ও আমাকে ভরসা দিয়ে লিখল যে, রাওলপিণ্ডিতে ও বাংলোর এক ধারে থাকে—দু' তিনটে ঘর—একটা বিগ্রহের, একটা শোবার, একটা বসবার। ও বিগ্রহের ঘরেই শোয়। কাজেই একটা শোবার ঘর খালি আছে। আমি যেন পত্রপাঠ চ'লে আসি। উত্তরে ওকে আমার দিল্লির ঠিকানা দিয়ে লিখলাম যে, আমি এখন দিল্লিতে স্থির করেছি রাওলপিণ্ডি যাব! তবে বৃন্দাবন এত কাছে, একবার অমলের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে যেতে চাই। ওকে আমার বৃন্দাবনের ঠিকানা দিলাম—মানে অমলের কুঠিয়ার!"

অসিত বলল: "তিন বৎসর বাদে অমলের সঙ্গে দেখা। ও পায়ের ধুলো নিতে এগিয়ে আসে। আমি ব্যস্ত হ'য়ে পেছিয়ে গিয়ে বললাম, 'কী করো, কী করো? বয়সে ছোট হ'লে কি হয়—তুমি যে ভাই অনেক এগিয়ে গেছ।' ও হাসল, সে-হাসির মধ্যে যেন একটু বিষাদের ছোঁওয়া লেগে। বলল: 'দাদা, সুয্যিমামা থেকে টিবিটা যত দূরে গৌরীশঙ্কর কি তার চেয়ে কাছে বলেন আপনি? তাই অমন কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না। আমি ওকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম: 'কেন মিথ্যে ধোঁকা দিচ্ছ ভাই, মুখে তোমার আলোর আভা—ও বাধা দিয়ে বলল: 'তাঁর কৃপার একটু ছিটে-ফোঁটা মিলেছে মানি, কিন্তু দাদা, বলব সত্যি কথা?

'কী?'

'দাদা! ঠাকুরের কৃপা পাওয়া সহজ, কিন্তু রাখা ভার। তিনি আমাকে আর দেখা দেন না।'

'সে কি! একেবারে অদৃশ্য?'

'না—অতটা নয়—আসেন কখনো স্বপ্নে—তবে—'বলতে বলতে ওর গলা ধ'রে এল।

'কী ব্যাপার অমল?'

'না এমন কিছু নয়। তবে এখনো পথ অনেক বাকি দাদা, অভিমানের লেশ থাকলেও তো চলবে না। আমাকে পেয়ে বসেছিল এক বিচিত্র অভিমান—আমি তাঁর কৃপা পেয়েছি। অমনি তিনি অন্তর্ধান। জানেনই তো তাঁর মামুলি রীতি, গোপীদের কী হালটা করেছিলেন। আপনিই তো গান সেই মীরা-ভজন: চরণোঁমে পড়ী মৈ রোয়া করূঁ, তুম শান্ত খড়ে মুস্‌কায়া করো।' আমরা কেঁদে মরি—তিনি হেসে কুটি কুটি।'

"তারপর বলল ও কত কথাই যে। শুনতে শুনতে চমকে উঠলাম বৈ কি! সাধে কি বলেছিলেন ঋষি—দুর্গম এ-পথ ক্ষুরধারের মতন সঙ্কীর্ণ! সে-সব বলবার সময় নেই—তবে ও যা বলল তার মোট কথাটা এই যে, ভগবান্‌কে প্রতিমায় দেখা সাধনার শেষ নয়—মাত্র আরম্ভ। তাঁকে দেখতে হবে সর্বভূতে—'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ!' সেই বিশ্বাতীতকে যতক্ষণ না দেখছি কীট-পতঙ্গ থেকে মুনিঋষির মধ্যে ততক্ষণ ফিরে ফিরে জন্মাতে হবে। কিন্তু সে যাক্‌।

"ওকে বললাম সতীর কথা। শুনতে শুনতে ও কেবলই চোখ মোছে, বলে: 'আহা দাদা! যান ওর কাছে ছুটে! ওকে বলুন—ভয় নেই, যে একবার তাঁকে ভালোবাসতে পেরেছে—তার ভার তিনি না নিয়েই পারেন না।'

"আমি বললাম: 'তা বটে অমল! কিন্তু ও যে গুরুকরণের নামেই বিষম তেতে ওঠে—গুরু নৈলে পথ দেখাবে কে?' অমল হাসল: 'ঠাকুর কাকে যে কোন্‌ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যান কেউ কি জানে দাদা? ও থাকুক না ওর স্বভাবে। কে বলতে পারে—ঠাকুর ওকে হয়ত বদ্‌গুরুর ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করতে চাইছেন ব'লেই ওর মনে বেঁধে দিয়েছেন গুরুবিমুখতার রক্ষাকবচ? কারণ এ তো আপনি ভালো ক'রেই জানেন দাদা যে, ওর কথার মধ্যে অনেকখানিই সত্যি—ধরুন, এমন রূপবতী ধনবতী শিষ্যা না চাইবে কোন্‌ বদ্‌গুরু? লুফে নেবে তারা।' ব'লে একটু হেসে ঈষৎ সান্ত্বনার সুরে বলে: 'ওর কথায় তাই আপনি কিছু মনে করবেন না দাদা। গীতার কথা মনে নেই—যাকে আমরা দেখি আঁধার

নিশা সেই নিশাই জ্ঞানীর কাছে ধ্যানের উষা, আর যাকে আমরা বলি পুঁথিপড়া বই-এর জ্ঞানালোক তত্ত্ববিদ্‌রো তাকে জানেন অজ্ঞানের অন্ধকার। নারদ যে নারদ তিনিও গুরু সনৎকুমারের কাছে এসে হায় হায় করেন নি কি যে, বহুশাস্ত্রবিৎ হয়েও তিনি রয়ে গেলেন শুধু মন্ত্রবিৎ—আত্মবিৎ হতে পারেন নি? তাই আপনি সোজা যান ওর কাছে। আপনাকে ওর এখন সত্যিই দরকার।

'যাব তো ভাবছি—কেবল—'

'না না, কেবল টেবল ছাড়ুন দাদা। ওর সরল পবিত্র মন ঠিকই ধরেছে যে, এখন ওর মন যে-আলোর তৃষ্ণায় ব্যাকুল সে-আলো ও পাবে আপনার পানে।' ব'লে একটু হেসে: 'এমনি ক'রেই তো আমরা লক্ষ্যমুখে চলি দাদা—হাজারো পথে বিপথে রকমারি পাথের কুড়োতে কুড়োতে। তা'ছাড়া দাদা, সবই তো জানেন—আপনাকে আমি কি আর বলব বলুন? ধরুন না কেন, শ্যামঠাকুর গুরু পেলেন না-চাইতে, আমি পেলাম স্বপ্নে—সতী হয়ত পাবে আর কোনো পথে।' মুচকে হেসে: 'আমাদের বাঁকা ঠাকুরটির যে সবই ত্যাড়া দাদা! তাই না অমন যে অর্জুন—তিনিও কিনা কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন: 'আর উল্টোপাল্টা কথার পাঠ দিয়ে আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিও না ঠাকুর—বলো সোজাসুজি—যা করলে ভালো হয়!'

"এসব কথা শুনে একটু ভরসা পেলাম। ঠিক করলাম—যাব। লিখে দিলাম ওকে সেই মর্মে—অমলের কথা আগাগোড়া উদ্ধৃত ক'রে। এর উত্তরে এল এক তিন পাতা চিঠি। অমলকে দেখালাম, বললাম: 'ভাই তোমার মন ভগবান্—ঠিকই এঁচেছিলে। বেচারি মেয়ে বড়ই ব্যাকুল হয়েছে। না গিয়ে উপায় নেই এখন।'

"ও প্রথমে লিখেছিল ওর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা— কীভাবে ওর দিন কাটছে বিগ্রহকে নিয়ে। তারপরই কান্নার পালা। বলল: 'তুমি অমলদার কাছে আনন্দে আছো নিশ্চয়ই—কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছি নে মামাবাবু। আমার নন্দাই মানুষ মন্দ নন, কিন্তু আমার শাশুড়ী ননদ মুখভার ক'রে থাকেন অষ্টপ্রহর। যতই কেন না বলি নিজের মতন থাকব—যাদের সঙ্গে ঘর করতে হয় তাদের সঙ্গে একদম বনিবনাও না হ'লে দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসে। কিন্তু এ-ও গৌণ। আমি সবচেয়ে বিপদে পড়েছি আমার একগুঁয়ে স্বভাবকে নিয়ে। নৈলে কি ঠাকুরকে ঠাকুর ব'লে মেনেও তাঁকে লক্ষ্য ক'রে এমন তাল ঠুকি? বলি—ঠাকুর, তোমার বিগ্রহকে ভালোবেসে ফেলেছি কেন জানি না, কিন্তু যত দিন না তার মধ্যে তোমাকে চাক্ষুষ করছি ততদিন মানব না যে তুমি শরণ দিতে চাও। মানব কেবল সেই দিনে—যদিও জানি না সেদিন আমার কখনো আসবে

কি না—যেদিন তুমি সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলবে হাসিমুখে শুধু—মমৈব ত্বং নয় ত্বমৈবাহম্। সত্যি মামাবাবু, আমি যে এই ভাবেই তাঁকে না চেয়ে পারি না—তুমিও আমার, আমিও তোমার। কিন্তু হ'লে হবে কি, তোমার চিঠিতে অমলদার মতন ভাগ্যবান্ ভক্তের আশ্বাস পেয়েও যে আমার মনের কালি একটুও ফিকে হ'তে চায় না, এর উপায়? সময়ে সময়ে অন্তর অভিমানে কালো হ'য়ে আসে—বলি ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে: 'যদি স্বাধীন বুদ্ধির অভিমান ছাড়তেই হবে ঠাকুর তবে এমন মনের গড়ন আমাকে দিলে কেন যে অন্ধভাবে কিছুই মেনে নিতে পারে না? তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয়—যে-কথা অমলদা বলেছে—যে আমার এ সবই এখনকার আঁধার মনের কথা আলোর বাণী যার রপ্ত হয়নি। তাই না এত শত মায়াযুক্তি আসে। কিন্তু মামাবাবু আমরা কি এসব যুক্তির মায়া, মোহের টান কাটাতে পারি—যদি না ঠাকুর শক্তি দেন? এই দেখ না কেন, শিলঙে তো আমি ভেবেছিলাম যে স্বামিপুত্র আমার কেউ নয়? কিন্তু এখানে এসে অবধি ওদের জন্যে প্রাণ কাঁদে। মামাবাবু, স্বামী আমাকে যে-ভাবে চান সে ভাবে আমি আর সাড়া দিতে না পারলেও তাঁকে আমি শুধু যে শ্রদ্ধা করি তাই নয়, ভালোও বাসি। তাই কেবলই মনে হয়—কেন তাঁকে বিয়ে করতে গেলাম, কেন কষ্ট দিচ্ছি তাঁকে এমন ক'রে? সবচেয়ে কষ্ট হয় ভাবতে রঞ্জতের কথা। সে এখনও শিশু, কিছুই জানে না। কিন্তু যখন বড় হবে—কী ভাববে তার মাকে যে তার প্রতি কর্তব্য না ক'রেই চ'লে গেল—কুন্তীকে কর্ণ যে ভর্ৎসনা করেছিলেন মনে পড়ে আর ভয় ভয় করে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সুবুদ্ধির হাজারো যুক্তি: সংসার তো আর সত্যি মায়া নয়, দায়িত্ব তো নয় কল্পনা-বিলাস। তা ছাড়া এক দুর্ভাবনা ছায়ার মতন আমার পিছু নেয়, ছেড়েও ছাড়ে না—সংসার ছেড়ে যাব কোন্ চুলোয়? গুহাগহ্বরে বনে জঙ্গলে বাস—এ কি সত্যি ভাবা যায়—বিশেষ মেয়েদের পক্ষে—তুমিই বলো? অথচ তবু কেন ভালো লাগে না এ সংসার? কেন নিরন্তর মনের মধ্যে ডাক শুনি—চ'লে আয়, চ'লে আয়। তোমার গাওয়া সেই মহাসিন্ধুর গানটি মনে পড়ে:

কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে?
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে?
দেখ্ ঐ সুধাসিন্ধু উথ্‌লিছে
পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে
আয় চ'লে আয় আমার পাশে।

কিন্তু সুধাসিন্ধু থেকে ছেঁকে তুলে এই ভূতের বেগারে আমাদের জুড়ে দিলেনই বা কিনি মামাবাবু? কেনই বা এত শত মমতা স্নেহ দায়িত্বের বন্ধন আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধলো, আর যাকে বলছি ভূতের বোঝা তাকে সাধ ক'রে বই-ই বা কেন বলো তো? পড়ি কেন দোটানায়: মন বলে—এ কর্তব্য, প্রাণ বলে—সব ছাই, ছাই, ছাই। আমি কি একটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত কিছু, মামাবাবু? সব থেকেও যে আজ আমার কিছুই নেই! কেন এমন হ'ল? স্বামী সংসার অর্থ গৃহসুখ—সবই তো আছে আমার—তবু কেন পারি না স্বামীর ঘর করতে? কেন ছেড়ে এলাম কোলের শিশুকে যার মুখ রোজ স্বপ্নে দেখি—কানে শুনি তার আধো আধো মা মা ডাক। এ কী লীলা ঠাকুরের—আমি তো বুঝি না, তুমি কি পারো বুঝিয়ে দিতে? কেউ কি পারে? আমি যে পথ দেখতে পাই না অন্ধকারে—কে আমাকে ব'লে দেবে? মাঝে মাঝে মন বিষাদে ছেয়ে যায়, ডাকি—ঠাকুর, ভালো যদি বাসালে, দূরে থেকে আর ছলনা কোরো না ললনাকে! গোপীদের করেছিলে সে এক—তাদের শক্তি ছিল এক কথায় সব ছাড়বার। কিন্তু আমি যে দুর্বল, ঠাকুর। এইভাবে ডাকতে ডাকতে সময়ে সময়ে চোখের জলে বুক ভেসে যায় মামাবাবু—কিন্তু তার পরেই আসে লজ্জা। স্বামী আমার নাম দিয়েছেন শক্ত মেয়ে। কিন্তু এর নাম কি শক্ত—যে কথায় কথায় চোখের জল ফেলে? সবচেয়ে লজ্জা এই যে,শিলঙ থেকে রোখ ক'রে চ'লে এসেছিলাম পারবই পারব ব'লে। কিন্তু এখানে এসে কী জানি কেন—যত দিন যাচ্ছে, যত শুনছি ডাক—আয় আয় আয় রে চ'লে—ততই পিছুটানের শক্তিই যেন উঠেছে ফেঁপে—অথচ দেখতে পাই না কেন কোনো অবলম্বন যাকে আশ্রয় করতে পারি? শুধু শুনি:

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে
কী সঙ্গীত ভেসে আসে!
কে ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে—
আয় চ'লে আয় আমার কাছে।

ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে কাঁদি—কিন্তু তারপরই মনে হয়—এ-কী দুর্বলতা! ঠাকুর যে চান সব ছাড়বার কঠিন অর্ঘ—সেন্টিমেন্টাল চোখের জলের তরল নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করবেন কেন?

"কিন্তু আমার সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে কী বলব? আমি স্বামী, ঘর, ছেলে সব ছাড়তে পারি যদি রোখ চেপে যায়—কিন্তু এ বিশ্বাসকে ছাড়ি কেমন ক'রে যে, যাকে সত্য বলে না জেনেছি তাকে আগে থাকতে মেনে নেওয়া অন্যায়—

অন্তত তার কাছে আত্মসমর্পণ করা চলে না? তুমি বলতে প্রায়ই—কোনো অভিমানই ধ্রুবতারার দিশা দেয় না, কেন না অভিমানের ধর্ম মরীচিকার দিকে টানা। কিন্তু এ-কথাই বা আগে থাকতে মেনে নেব কী ক'রে বলো দেখি? অথচ হার মানতে আমার কী যে ইচ্ছে করে মামাবাবু। সত্যি বলছি—সময়ে সময়ে মনে হয়—ঠাকুর যদি আমার সব কেড়ে নেন তবেই আমি ধন্য হই—সব সব স—ব—শুধু সংসারবন্ধন টাকা-কড়ি গৃহসুখ নয়—আমার বুদ্ধি বিচার অভিমান—সমস্ত! কেবল তাঁর পায়ে আমার অশান্ত হৃদয়কে ঠাঁই দিন—তোমার গাওয়া গান ফের মনে পড়ে:

আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে বাহু দিয়ে নেও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।

কেবল, এ-প্রার্থনা কার? না, যে বলতে পারে মনেপ্রাণে:

আর কেন মা ডাকছ আমায়? এই যে এইছি তোমার কাছে।

কিন্তু আমি তো বলতে পারি না—আমি সব ছেড়ে তোমায় পায়ে এসেছি ঠাকুর, আমাকে গ্রহণ করো। আমি যে আগে ঠাঁই না পেলে সব ছাড়তে অক্ষম। বিশ্বাস করতে সত্যিই চাই, কিন্তু কিছুই না-দেখে নয়—তিনি যে আমাকে ভালোবাসেন একথা কানে শুনে যে আমার মন ভরে না মামাবাবু, চোখে দেখতে চাই তাঁর হাতছানি, প্রাণে পেতে চাই তাঁর স্নেহস্পর্শ। তোমারি একটি গান ফের মনে পড়ে—আহা, কী সব গানই তুমি বেঁধেছ মামাবাবু—শুনতে শুনতে কতবারই চম্‌কে চম্‌কে উঠেছি—এ কী! এ যে আমারি প্রাণের কথা:

শুনেছি বন্ধু, কত না কথা তোমার,
শুনেছি কাহারে বলে প্রেম অভিসার,
শুনেছি যে—মায়া কূলের ভরসা বাণী,
অকূলেই শুধু হয় মন-জানাজানি।

গেয়ে শেষ দুটি চরণ গাইতে গাইতে তুমি কতদিনই না চোখের জল ফেলেছ আমার চোখের জলের সঙ্গতে মামাবাবু—

আজিকে শ্রবণ ক্লান্ত আমার প্রাণ,
কবে দেবে নাথ, নয়নের বরদান?
সকল আশার অতীত করুণা দানে
আঁখিরে সূর্যমুখী করি' তব পানে?

কেবল আমার এ-মনটি যে কী মামাবাবু। না দেখে কিছুই মেনে নেবে না একথা

বলার সঙ্গে সঙ্গে—শুধু শোনা কথার এজাহার মেনে অদেখাকে মঞ্জুর করব না এ-শপথ করবার সঙ্গে সঙ্গে—কে যেন বলে যে, আগে কানে-শোনার এজাহারকে যে মঞ্জুর করে সে-ই পারে চোখে-দেখার কোঠায় উত্তীর্ণ হ'তে। কিন্তু কেমন ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হয়? ধরো-না আমারি কথা—কোত্থেকে এক বিগ্রহ অনাথের মতনই এসে পড়ল আমার কোলে কোন্ এক ভূমিকম্পের পর—আর দেখতে দেখতে সে হ'য়ে উঠল আমার এত আপন? আপন অথচ নিষ্প্রাণ। এ দুইয়ের সঙ্গতি কোথায়—বলবে? অমলদা ধন্য—যে তাঁর কাছে বিগ্রহ জীবন্ত হ'য়ে উঠেছিল দেখতে দেখতে—কিন্তু আমি একদিকে যেমন এ-বিগ্রহকে ভালোবেসেছি, অন্যদিকে এ কথাও তো অস্বীকার করতে পারি না যে এ-বিগ্রহের মধ্যে ঠাকুরকে একটি বারও দেখিনি আজ অবধি? অথচ তবু এ কি অদ্ভুত নয় যে, চোখ যাকে অঙ্গীকার করছে পাষাণ ব'লে—মন তাকেই বরণ করল প্রিয়তম ব'লে? কেন না আর সবই আমার ভুল ধারণা হ'তে পারে, কেবল এখানে আমার কোনো ভুল কি আত্মবঞ্চনা নেই যে, আমি এ-বিগ্রহকে যেভাবে প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছি —সেভাবে কাউকেই ভালোবাসিনি, আমার স্বামীকেও নয়, রজতকেও নয়, বাবা মাকেও নয়—এমন কি তুমি যে তুমি—যে গুরু না হ'য়েও আমাকে সর্বপ্রথম চক্ষুদান করেছিল—সে তুমিও নও। তোমার গীতায় আছে একটি লাখ কথার এক কথা যে, সেই অচিন মানুষটিকে কেউ হয় দেখে আশ্চর্য, কেউ বা তার কথা বলতে হয় আশ্চর্য, কেউ বা শুনে আশ্চর্য,—কিন্তু খতিয়ে, হায়রে হায়, হাজার দেখেশুনেও কেউ জানে না তার স্বরূপ। অথচ আমার মতন একটা নগণ্যাদপি নগণ্যার এ কী স্পর্ধা বলো তো—যে যাঁকে কেউ জানতে পারে না, তাঁকে আমি চাই শুধু কাছে পেতে নয়—বাজিয়ে নিতে? মা মামাবাবু, যতই দিন যাচ্ছে, আমার মনে দীর্ঘনিশ্বাস উঠছে ঘনিয়ে যে, এরকম মনের গড়ন যাদের—ঠাকুর তাদের ছায়াও মাড়াবেন না। কী জানি—কী আছে আমার অদৃষ্টে। আমি সাম্‌নে কী একটা যেন দারুণ বিপদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি—অথচ তার হদিশ পেতে না পেতে সে যায় মিলিয়ে।'

অসিত বলল: "হঠাৎ চিঠি এখানে শেষ—ও নাম সই করতেও ভুলে গিয়েছিল। 'বিপদের ছায়া' প'ড়েই আমি ভয় পেয়ে গেলাম—কে জানে—ঝোঁকালো মেয়ে কী ক'রে বসে। অমলকে এ চিঠি দেখালাম। সে বলল: 'তুমি এক্ষুনি যাও দাদা, আর দেরি কোরো না। ওকে নিয়ে সোজা পাড়ি দাও তুমেল আশ্রমে। হয়ত স্বয়মানন্দ স্বামীর কাছ থেকেই ও পাবে সেই আলোর আলো যার জন্যে ওর হৃদয় মাথা কুটছে ঠাকুরের পায়ে—কে বলতে পারে?'

"কথাটা আমার মনে লাগল। ভাবলাম—আর গড়িমসি করা কিছু নয়। ওকে তার ক'রে দিলাম: 'আজই দিল্লি যাচ্ছি। সেখানে দু'দিন থেকেই রাওলপিণ্ডি যাব। আমাকে মাসিমার ঠিকানায় তার কোরো।'

"দিল্লি পৌঁছলাম বিকেলবেলা। সন্ধ্যাবেলা সতীর টেলিগ্রাম এল মাসিমার ঠিকানায়: 'চলে এসো এক্ষুনি।'

"পরদিন সকালবেলা উঠে বিমানঘাঁটিতে ফোন করতে যাব রাওলপিণ্ডির প্লেনে একটি আসনের জন্যে, এমন সময় মাসিমা খবরের কাগজ হাতে এসে বললেন: সর্বনাশ! সতীকে তার করো।

"খবর প'ড়ে শিউরে উঠলাম। গত রাত থেকে মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠে—হিন্দুদের খুন করছে, বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি।

"বিমান ঘাঁটিতে টেলিফোন করতে ওরা বলল, দিল্লি থেকে রাওলপিণ্ডিতে কোনো প্লেনই যাচ্ছে না। ব্যস্, আর কোনোই খবর নেই।

"তৎক্ষণাৎ সতীকে জরুরি তার ক'রে দিয়ে আমার এক পদস্থ মুসলমান বন্ধুর কাছে গেলাম। তিনি আমতা আমতা ক'রে বললেন: খবর দারুণ বটে, তবে তাঁরা আশা করছেন দুচার দিনের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। আমি বললাম: 'আমার এক আত্মীয়া রাওলপিণ্ডিতে আছেন, আমি কোনোমতে সেখানে পৌঁছতে চাই।' তিনি মাথা নেড়ে বললেন: 'দু'তিন দিনের মধ্যে আপনি পাকিস্তানে ঢুকতে পারবেন ব'লে মনে হয় না। তবে—' ব'লে একটু ভেবে বললেন: 'আপনি যদি কালকের দিনটা অপেক্ষা করেন তবে হয়ত টেলিফোন ক'রে খবর পেতেও পারি যদি আপনি আপনার আত্মীয়ার ঠিকানা আমাকে দেন।' আমি তাঁকে ঠিকানা দিয়ে ফিরে এলাম। সন্ধ্যাবেলা তাঁকে টেলিফোন করলাম, উত্তর এলো—এখনো কোনো খবরই আসেনি।

"সারারাত ঘুম হ'ল না। পরদিন সকালে উঠে কাগজে পড়লাম—বীভৎস কাণ্ড: বহু হিন্দুকে মুসলমান গুণ্ডারা মেরে ফেলেছে, কত মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে……ইত্যাদি। মাত্র দু'টি প্লেন রেফিউজি নিয়ে দিল্লি রওনা হ'তে পেরেছে—কিন্তু তার পর থেকে প্লেন-ট্রেন-চলাচল সব বন্ধ—দুদিক থেকেই।

এমন সময়ে অমলের এক চিঠি পেলাম: 'দাদা খবরের কাগজে সব পড়লাম। কিন্তু ভাববেন না—সতীর কোনো অমঙ্গলই হবে না, হ'তে পারে না। ঠাকুরকে যে অমন প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছে তার বিপদ হ'তে পারে—কিন্তু ভয় নেই। কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—ঠাকুরের এ-শপথ চিরকালের। আর এ যদি সত্যি না হয়—তবে মিথ্যে পুজো, মিথ্যে মন্ত্র, মিথ্যে বেঁচে থাকা।'

"কিন্তু অমলের আশ্বাসেও আশ্বস্ত হ'তে পারলাম না। সারা দিনটা অশান্তিতে কাটল। রাত্রে মাসিমা ও আমি রেডিও ধরেছি রাওলপিণ্ডির খবর নিতে—এমন সময়ে সতী এসে হাজির—সশরীরে। সঙ্গে এক সুদর্শন কাশ্মীরী ড্রাইভার। ওর পরনে শুধু একটি শাড়ি, চুল উস্কখুস্ক, চোখের পাতা ফোলা, গায়ে একটিও গহনা নাই। অমন শোভনা মেয়ের যে একদিনে এ-রকম চেহারা হ'তে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

"ড্রাইভারকে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিয়ে মাসিমাতে আমাতে সতীকে নিয়ে পড়লাম। মাসিমার ওকে জড়িয়ে ধ'রে কী সে কান্না: 'বড় বেঁচে গেছিস মা।' সতীর চোখে কিন্তু বাষ্পের আভাসও নেই। গুম্ হ'য়ে ব'সে রইল।

"তারপরে ওকে স্নান করিয়ে খাইয়ে মাসিমা আমার ঘরে এনে হাজির করলেন। তখন সব ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু এ কী কাণ্ড! শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে সত্যিই সন্দেহ হ'তে থাকে—আমি জেগে, না সব দুঃস্বপ্ন? কাগজে কয়েক বৎসর আগেই হিট্‌লারের কাহিনী পড়েছিলাম অবশ্য—কিছুদিন আগে কলকাতায়ও ঘটেছে খুনোখুনি। কিন্তু কাগজে পড়া এক—আর যাকে স্নেহ করেছি তার মুখে শোনা আর। শোনো বলি—সতী যা বলল।"

অসিত বলল: "সতী আমাকে আমার বৃন্দাবনের ঠিকানায় যে-চিঠি লিখেছিল মাত্র তিন দিন আগে—সে-চিঠি লেখার পরেই ওর শাশুড়ী ওকে বলেন, এক মস্ত সাধুজি এইমাত্র সকালে হরিদ্বার থেকে এসে পৌঁছেছেন। বেলা দশটায় ওখানকার গীতাপ্রচার সভায় গীতা সম্বন্ধে কিছু বলবেন। সতী জিজ্ঞাসা করল—একটু বিরস মুখেই—সাধুজির নামটি কি? তিনি বললেন: 'আনন্দগিরি'।

বার্বারা অস্ফুট কণ্ঠে বলল: "আনন্দগিরি? শ্যামঠাকুরের গুরু?"

অসিত বলল: "হ্যাঁ, তিনিই। শ্যামঠাকুরের কাছে শুনেছিলাম মাঝে মাঝে তিনি বেরিয়ে পড়তেন—গীতা প্রচার করতে। রাওলপিণ্ডির গীতা-প্রচারের শাখা তাঁকে অনেকদিন থেকেই নিমন্ত্রণ করছিল, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি।"

বার্বারা বলল: "তারপর?"

"সতী বলল: 'আনন্দগিরি নাম শুনতেই আমি চমকে উঠলাম। কারণ তুমি আমাকে দু'তিনটি চিঠিতে তাঁর কথা লিখেছিলে—শ্যামঠাকুরের গুরু, মস্ত যোগী, মহাপুরুষ এইসব ব'লে। কাজেই আমার বিমুখতা কেটে যেতে দেরি হয়নি। আমি দশটার আগেই গীতাসভায় গিয়ে বসলাম। ঘরভরা লোক। সবাই

উৎসুক। মস্ত নামকরা সাধু! আমার বুক উঠল দুরু দুরু ক'রে—কখন তিনি আসবেন।

ঠিক দশটায় এক বালকব্রহ্মচারী শিষ্যের সঙ্গে তিনি এসে হাজির হ'লেন সভায়। তাঁর উজ্জ্বল মুখে মৃদু মৃদু হাসি ও উদাত্ত-কণ্ঠে অপূর্ব গীতার ব্যাখ্যা শুনতে-না-শুনতে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল মামাবাবু! মনে হ'ল—যেন ঠাকুর তাঁকে পাঠিয়েছেন শুধু আমার জন্যেই। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে গুরুবাদের বিরুদ্ধে যত যুক্তিতর্ক জমায়েৎ হ'য়েছিল সব ভেসে গেল এক মুহূর্তে। মনে পড়ল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় উপমা—যুগ যুগ ধ'রে যে-অন্ধকার জমা হ'য়ে আছে অন্ধকূপে—একটি বাতি জ্বালতে না জ্বালতে পালিয়ে যায়—একটু একটু ক'রে পালায় না। আমার মন অকুণ্ঠে ওঁকে বরণ ক'রে নিল।

'বক্তৃতার পরে সোজা গিয়ে ওঁকে বললাম আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে—তবে নিরালায়। উনি স্নিগ্ধ হেসে ওঁর শিষ্যকে বললেন, মাকে পাশের ঘরে নিয়ে চলো, আমি আসছি।

'একটু বাদে ঘরভরা প্রণামার্থীদের বিদায় দিয়ে তিনি এসে বসলেন আমার সামনে। বললেন: বোসো মা। আমি চোখের জল আর সামলাতে পারলাম না—সোজা লুটিয়ে পড়লাম তাঁর পায়ে। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে মৃদু স্বরে কিছুক্ষণ নারায়ণ নারায়ণ জপ ক'রে বললেন: শান্ত হও মা। কোন ভয় নেই। যে সত্যি চায় সে পায়ই পায়!'

'আমার মনে কুণ্ঠা সংকোচ ভয়ের আর লেশও রইল না। আমি উঠে, চোখ মুছে এক নিশ্বাসে ব'লে গেলাম যা মনে এল—বাছ-বিচার না ক'রে। গোড়া থেকেই বললাম সব কথা—কিছুই বাদ না দিয়ে। তিনি খুব মন দিয়ে শুনলেন। আমার কাঁদুনি শেষ হ'লে হেসে বললেন: তবে আর কি মা? আমি শুধালাম: তবে আর কি—মানে? তিনি বললেন: মানে, বাধছে তোমার কোথায়—ডাক যখন শুনেছ? আমি বললাম: আমি যে বুঝতে পারছি না গুরুদেব—কী করতে হবে আমাকে? তিনি বললেন পিঠ-পিঠ: আর কিছুই না—শুধু ঝাঁপ দিতে হবে—তীরে ব'সে ঢেউ গোনা ছেড়ে। আমি বিহ্বলকণ্ঠে বললাম: ঝাঁপ? তিনি বললেন শান্ত হেসে: ভয় কি মা? এ-ঝাঁপে ডুবে মরবে না, শুধু ম'রে বাঁচবে। তাঁকে পেতে হ'লে চাই নবজন্ম। কিন্তু নবজন্ম হয় কখন? মরার পরে তো? তাই বরণ করতে হবে তোমাকে সাংসারিক হিসেব-কিতেব, যুক্তিতর্ক, ভয়-ভাবনার মরণ। আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম: কিন্তু

কর্তব্য—দায়িত্ব? তিনি বললেন: ওসব শুধু তাদের জন্যে যারা তাঁর ডাক শোনেনি—যারা স্বভাবে সংসারী। তোমার স্বধর্ম তো সংসার নয় মা, তাই সংসারের ধর্ম তোমার পরধর্ম। আমি বললাম: একথা আমি বহুবারই শুনেছি গুরুদেব, কিন্তু মন মানে না। কিম্বা হয়ত আমি কিছুই জানি না ব'লেই,—তিনি বললেন বাধা দিয়ে: যে তাঁর ডাক শুনেছে, তাঁকে ভালোবাসা কী বস্তু জেনেছে সে জানে না—আর জানে তারা যারা তাঁকে জানেনি—যাঁকে জানলে আর কিছু জানার থাকে না—নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ?

'আমি বললাম: কিন্তু গুরুদেব, ঠাকুরকে কি আমি সত্যি ভালোবেসেছি—না, এসব মেয়েলি উচ্ছ্বাস—ফেনা? আমি দেখেছি কত মেয়ে—তিনি ফের বাধা দিয়ে বললেন: শোনো মা বলি—তুমি কতদূর এগিয়েছ তুমি জেনেও জানতে পারছ না শুধু এই জন্যেই—এই কুতর্ক কুযুক্তির শাসানিই বুনেছে আড়াল। তোমার ডাক এসেছে মা—একথায় অবিশ্বাস কোরো না আর! ভয়ে ও আনন্দে আমার বুক কেঁপে উঠল: ডাক এসেছে? তবে কী করতে হবে? তিনি বললেন: চলতে হবে দুরভিসারে। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: কিন্তু গুরুদেব, পথ যে অজানা, চারিদিক অন্ধকার। তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক অপরূপ আবছা হাসি, সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন ক'রে ধ'রে দিলেন:

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনি
চমকি চমকি ঘন কাঁপ।
অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ॥

এর মানে কি জানো মা? মানে এই যে, তাঁর বাঁশির ডাক শোনে যে-রাধাহিয়া তাকে অচিন পথেই চলতে হয় অন্ধকারে গাঢাকা হ'য়ে। ভয় ভাবনা কাটেনি—কী হবে জানে না। তবু অভিসারে না বেরিয়ে পারে না! বুক দুরু দুরু করে—কোন্ দিকে যাবে—পথ যে চেনে না! হঠাৎ সামনে ফণীর মাথায় মণি আলো ধরে পথ দেখাতে। অমনি ভয়ের রূপ-বদল: যদি কেউ দেখে ফেলে—যেতে দেবে না যে! সঙ্গে সঙ্গে জাগে ব্যাকুলতা, আর সে কেমন ব্যাকুলতা বলো—দেখি—ফণীর মণির আলো হাত দিয়ে ঢাকতে যাওয়া—যাতে ক'রে অভিসারিকা নিজেকে অন্ধকারের আড়ালে রাখতে পারে? ভাবো সে কেমন আত্মহারা রাধা যাঁর বিষধরের ভয়ও ধুয়ে মুছে ভেসে গেল প্রিয়মিলনের ব্যাকুলতায়! এমনি ব্যাকুল হয়ে শ্যামের অকূল-বরণ করলে তবেই তিনি দেখা দেন রাধার আঁধার বুকে আলো হ'য়ে।

"সতী বলল: 'তুমি জানো মামাবাবু, তোমার মুখে গোবিন্দদাসের এ-কীর্তনটি শুনতে আমি কিরকম ভালোবাসতাম। কিন্তু কিছু মনে কোরো না, এ-গানটি তোমার মুখে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম এর ভাবরূপে, উপমার দীপ্তিতে। কিন্তু গুরুদেবের মুখে এ-গানটির মধ্যে শুনতে পেলাম কাব্যের উপমা নয়—বাঁশির ডাক। শুধু বৈষ্ণবের তরে বৈষ্ণবের গান নয়—মানি! কিন্তু গুরুদেবের শ্রীমুখে এ-গানটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল যে, বৈষ্ণব পদাবলীর চরম বাণী ফুটে উঠতে পারে কেবল সাধকের কানে—কাব্যরসিকের কানে নয়। এ আমি যুক্তি দিয়ে বুঝিনি, হৃদয়ের আকাশে দেখতে পেলাম যেন মুহূর্তের বিদ্যুৎ-ঝলকে! আর যেই দেখতে পেলাম সাধনার আলোর সঙ্গে কবিতার কালোর তফাৎ কোন্‌খানে—অমনি মনের মধ্যে সব'গেল ওলট-পালট হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ ভাদ্রের ভরা গঙ্গার মতনই উদ্বেল হ'য়ে উঠল—যেতে হবে যেতে হবে এই উচ্ছ্বাসে।

'কিন্তু তার পরেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সংশয়। বললাম: কিন্তু গুরুদেব, আমি তো শ্রীরাধা নই—বাঁশির ডাকও শুনিনি।

'তিনি হেসে বললেন: শুনেছ বৈ কি মা—আর শুনেছ ঐ বিগ্রহকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই! এই ভালোবাসাই হ'ল বাঁশির ডাক—নৈলে যে-বিগ্রহকে তোমার মন পাষাণ ব'লে জেনেছে, তোমার প্রাণ ভালো না বেসে পারল না কেন বলো? শোনো মা বলি, বিষকে বিষ ব'লে না জেনে খেলেও বিষের ক্রিয়া ঠেকানো যায় না তো? তেমনি তোমার এই বিগ্রহকে ভালোবাসা: একে বাঁশির ডাক ব'লে তুমি চিনতে না পারা সত্ত্বেও এরই প্রভাবে তোমার বৈরাগ্য এলো—স্বামী ছেলে ধনসম্পত্তি সব ছেড়ে তুমি এলে নির্জনবাস করতে। কিন্তু এর পরে কী করতে হবে যখন তুমি ঠিক করতে পারলে না তখন ঠাকুর কী করলেন? না, আমাকে রাওলপিণ্ডি পাঠালেন শুধু এই কথাটি তোমাকে জানাতে যে, তোমার সময় এসেছে সব ছাড়বার।'

"সতীর মুখে আলো জ্ব'লে উঠল, বলল: 'মামাবাবু, কী বলব—এ শুধু যার হয়েছে সেই জানে—ব'লে বোঝানো যায় না! তোমার শ্যামঠাকুর জানতেন, কারণ তাঁর হয়েছিল হঠাৎ এ-ভেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখনো যেন আমার বিশ্বাস হয় না, মামাবাবু! আমি কি সেই সতী যে তোমার সঙ্গেও তর্ক করত—গুরুবাদ আবার কী? সত্যি, এর তল পাই না—এতদিনের তৈরি তর্ক বিচার স্ববুদ্ধির জাঙাল—ভেসে গেল কি না মুহূর্তে! আর কার কথায়—না, এক অচেনা গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর—যার সম্বন্ধে কিছুই জানি না!' ব'লে ঈষৎ

হেসে : 'জানো মামাবাবু, আমার বিজ্ঞ নন্দাইয়ের মুখে শুনতাম প্রায়ই যে, মিরাক্‌লের যুগ গত ! এখন হাসি একথা মনে হ'লে, অথচ তাঁকে দোষ দিইই বা কেমন ক'রে ? দু'দিন আগেও যদি আমাকে কেউ বলত যে দু'দিন বাদে আমারি হবে এই নাজেহাল অবস্থা—তাহলে কি আমি হেসে উড়িয়ে দিতাম না ? যে-অবস্থার কথা এক সময় ভাবতেও ডরিয়ে উঠতাম—সে-অবস্থা যখন এল তখন ভয় তো দূরের কথা, এক অসহ আনন্দে মন নেচে উঠল : আমার ডাক এসেছে সব ছাড়তে হ'বে, ছাড়তে হ'বে—আর ভয় নেই—হোক্ না লক্ষ্য সুদূর—পথের দিশা তো এসে গেছে—একটানা সোজা পথ—গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ—উদার, উদাস, নিঃসঙ্গ—কিন্তু আলোয় ভরা। ঝাপসা আর কিছুই নেই। বুকের মধ্যে আমার ডমরু উঠল বেজে।

'গুরুদেব আমার পানে খানিকটা একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—আহা সে কী দৃষ্টি মামাবাবু! দৃষ্টি তো নয়—যেন মূর্তিমতী করুণা! বললেন : আমি চললাম মা এবার, আমার কাজ শেষ হয়েছে। পরশুই আমি হরিদ্বারে পৌঁছব। দরকার হ'লেই চিঠি লিখো। কেবল একটি কথা : রাওলপিণ্ডিতে আর থেকো না। আজই ভোর রাত্রে ধ্যানে আমি পেয়েছি—কিন্তু সে-সব এখন বলব না—এখনো তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না—মোট কথা, এখানে এক রাক্ষসী লীলা শুরু হবে, দারুণ হত্যাকাণ্ড। ঠিক কবে হ'বে সে-দৃষ্টি ঠাকুর আমাকে দেননি—কাল পরশুও হ'তে পারে—কিংবা হয়ত তার আগেও হ'তে পারে—কিন্তু হবেই। তাই তোমরা যত শীঘ্র পারো এখান থেকে চ'লে যাও। কেবল একটি কথা—যাই কেন ঘটুক না, মনে রেখো এই কথাটি যে ঠাকুরের যে শরণ নিয়েছে, তাঁকে যে সত্যি ভালোবাসতে পেরেছে, কোনো রাক্ষস কি অসুরের সাধ্য নেই তাকে মারে।'

'তারপর ?'

'আমি বললাম আমার নন্দাইকে গুরুদেবের ধ্যান-দর্শনের কথা। তিনি তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন : যত সব মিডীভাল! ঠাকুরের কাছে ওআর্নিং পেয়েছেন—রেড লাইট! ননসেন্স্! এ টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি। তাছাড়া এখানকার পুলিশ কমিশনার আমার বন্ধু, জানেন বৌঠান ? কালই তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল! তিনি বললেন—কিছুই না, যত সব এ্যালার্মিস্ট রিপোর্ট—বাজে গুজব। শহরের কোন্ কোণে একদল গুণ্ডা একটু উপদ্রব শুরু করেছিল কাল সন্ধ্যাবেলা। দুটো লাল পাগড়ি পাঠাতেই তারা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

'আমি কী বলব ? চুপ করে রইলাম। বিকেল-বেলা এলো তোমার তার,

আমি তোমার কথামত দিল্লিতে তোমাকে তার ক'রে দিলাম চ'লে এসো এক্ষুনি।'

'কিন্তু পরদিন সকালে দেখি আমার নন্দাইয়ের মুখ চুন! বললেন: শহরে না কি ভোর হ'তে-না-হ'তে গুণ্ডারা শুরু করেছে তাণ্ডব—পুলিশ কিছুই করছে না! বলতে-না-বলতে আয়েষা ব'লে আমাদের এক মুসলমান প্রতিবেশিনী এসে হাজির। ও আমাকে কেন জানি না, ভালবেসে ফেলেছিল। বলল: এক্ষুনি পালান—একটা প্লেন ছাড়ছে উদ্বাস্তু হিন্দুদের নিয়ে—আপনাদের জায়গা হয়ত হ'তেও পারে। আমার নন্দাই তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন বিমানঘাঁটিতে। ওরা বলল: হ্যাঁ, সাংঘাতিক ব্যাপার—ভোর বেলাই গুণ্ডারা অনেক হিন্দুর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, লুটতরাজও শুরু হয়েছে। আমাদের প্লেন ছাড়ছে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে। আমার নন্দাই টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাদের মোটরে এক্ষুনি রওনা হচ্ছি। ওরা বলল: অমন কাজটি করবেন না, হিন্দু যাত্রীর মোটর ওরা ধরবেই ধরবে। আমাদের বাস পাঠাচ্ছি কয়েকটি হিন্দুকে তুলে আনতে, সেই বাসে চ'লে আসুন এক্ষুনি—কিন্তু মাল-পত্র নিতে পারব না—এমন কি সুটকেশ পর্যন্ত নয়—বহু লোক এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই—তিলধারণের স্থান নেই—আপনাদের চারজনের কোনোমতে জায়গা হতে পারে, কিন্তু মালপত্র নয়। যদি দামী গয়নাগাঁটি থাকে, তবে একটা ছোট হাতবাক্স কি ব্রীফকেসে আনতে পারেন! আমার নন্দাই শুকনো মুখে বললেন আমাদের সব কথা।

'আমার ননদ তৎক্ষণাৎ উঠে তাঁর যা কিছু গহনা ছিল একটি ছোট হ্যাণ্ডব্যাগে পুরলেন। এমন সময় আমার হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল ঠাকুরের কথা। মাথা ঘুরে উঠল। আয়েষা আমাকে ধরল, বলল: ভয় নেই বহিন, বাস যখন আসছে। আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম: ভয় নেই—কী বলছ? আমার ঠাকুর? আমার নন্দাই রুক্ষকণ্ঠে বললেন: ঠাকুর-টাকুর ওরা নিতে দেবে না বৌঠান—তার উপর মার্বেল পাথরের ঐ ভারী বিগ্রহ? আমি আয়েষার বাহু বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম: বিগ্রহ ছেড়ে আমি এক পা-ও নড়ব না। আমার শাশুড়ী চোখ কপালে তুলে বললেন: পাগলামি কোরো না বৌমা! শীগ্‌গির দাও তোমার গয়না-টয়না যা কিছু আছে—দেরি কোরো না। আমি সোজা আমার ঘরে চ'লে গেলাম। ওঁরা তিনজনে আমার পিছনে পিছনে ছুটে এলেন—আয়েষাও। আমি আমার শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে বললাম: আপনারা যান মা—আমি যাব না যদি ওরা বিগ্রহ নিয়ে যেতে না দেয়।

'তুমুল কাণ্ড! এদিকে তর্কাতর্কি করবারও সময় নেই—বাস এলো ব'লে।

ওদিকে শহর থেকে একটা চাপা কল্লোল—গুম গুম গুম ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে—সমুদ্রের তীরে হাওয়া বাড়লে যেমন কল্লোল বেড়ে ওঠে! কিন্তু আমার মাথার মধ্যে সব খালি। কোনো চিন্তাই যেন নেই—সব ফাঁকা—একটা ঘোর মতন, অথচ ভয়ের নয়—আনন্দের। সে ব'লে বোঝাতে পারব না কী শান্তি! হঠাৎ সাড় এল আমার ননদের ঝঙ্কারে: তবে মরগে যা বৌ! মুখ বুঁজে সব সয়েছি এতদিন শুধু দাদার মান রাখতে। নৈলে তোর মতন মেয়ের সঙ্গে কেউ ঘর করে নাকি— যার ছায়া মাড়ানোও পাপ! বিগ্রহ বিগ্রহ—ব'লে ঠোঁট বেঁকিয়ে—ভক্তির বালাই নিয়ে মরি! স্বামী গেল, ঘর গেল, ছেলে গেল উচ্ছন্নে—রইলেন শুধু এক হাঁ-করা ঠাকুর? এর নাম যদি ধম্ম হয় তবে মুখে আগুন সে-ধম্মের। আমার নন্দাই বাধা দিয়ে বললেন: আঃ কী করো? শুনুন বৌঠান—আমি বললাম—কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন? আমার ঐ এক কথা—বিগ্রহ ফেলে আমি যাব না—যাব না—যাব না। আমার ননদ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন: খু—ব ভালো, আর এইই হবে ওর ঠিক সাজা! হবে না? স্বামীর মনে যে দুঃখু দেয় তার শাস্তি হবে না তো হবে কার শুনি? এখনো আকাশে চন্দ্র সূর্য উঠছে—আমার শাশুড়ী ওর মুখ চেপে ধ'রে বললেন: কী করিস্? থাম্। বৌমাকে ফেলে ছেলের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে? শোনো বৌমা, লক্ষ্মী মা আমার। অমন করে না—তৈরি হ'য়ে নাও এক্ষুনি—তোমার গয়নাগাঁটি যা আছে নিয়ে।'

'এত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি এল: এত বড় বিপদেও এদের সবচেয়ে মাথাব্যথা আমাকে নিয়ে না, আমার গয়নাগাঁটি নিয়ে! আমি বললাম হেসে: গয়নাগাঁটির দুর্ভাবনা আমার নেই, বরং ওরা যদি বলে গয়নাগাঁটি রেখে সেই জায়গায় ঠাকুরকে নিয়ে যেতে দেয় তবেই আমি যাব, নৈলে—যা হয় হবে—আমি এখান থেকে এক পাও নড়ছি না—মরতে হয় মরব।'

'আয়েষা কাছে এসে আমার হাত ধ'রে মিনতির সুরে বলল: কিন্তু বহিন, মরার বাড়াও বিপদ আছে। তোমাকে গুণ্ডারা মারবে না। আমার মামার পাশের বাড়িতে একটি হিন্দু মেয়েকে ওরা আজই ভোরে লুটে নিয়ে গেছে—তোমাকেও নিয়ে যাবে—আর কেন, তা কি বলতে হবে?'

'কেন জানি না, আমার ভিতর থেকে যেন ফেটে পড়ল দমকা হাসি, বললাম: বেশ তো, নিক না লুটে। দেখা যাবে কার শক্তি বেশি—মারনেওয়ালা গুণ্ডাদের না রাখনেওয়ালা ঠাকুরের। ঠাকুর বলেছেন—আমার ভক্তের দুর্গতি হ'তে পারে না। আজ দেখা যাবে তিনি শুধু কথা দিতেই মজবুত কি

না। ব'লে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলাম : বেশ হয়েছে, চমৎকার। ঠাকুরও আমাকে পরখ করুন, আমিও তাঁকে পরখ করি—মন্দ কি? এসপার কি ওসপার। আমার শাশুড়ী ভয় পেয়ে গেলেন, বললেন : বৌমা! পাগল হ'য়ে গেলে নাকি?

'আমার ননদ এবার আমার শাশুড়ীর হাত ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে গেলেন বলতে বলতে : কেন মিথ্যে ব'কে মরছ মা? যার মরণদশা ঘনায় তাকে বাঁচাবে কে? মরুক মরুক সর্বনাশী—আমাদের হাড় জুড়োক।

'এমনি সময়ে বাইরে বাসের হাঁক বেজে উঠল। আয়েষা আমাকে বলল : বহিন, যদি নিতান্তই না যেতে চাও, তবে একটা বোরখা নিয়ে আসি—তাতে মুখ ঢেকে তুমি চলো আমাদের বাড়ি।'

'আমি ওকে শান্ত ক'রে বললাম : না ব'হিন, তোমাদের বিপদ হবে—কাফেরকে ঠাঁই দিলে। তাছাড়া আমি রইলাম আমার ঠাকুরের পায়ে—সত্যি দেখতে চাই ঠাকুর নিষ্প্রাণ না জীবন্ত।

'ওদিক থেকে আমার ননদ হাঁকলেন : আয়েষা! চললাম ভাই। আয়েষা বেরিয়ে গেল চোখ মুছতে মুছতে। আমি দোরে খিল দিলাম।'

'কিন্তু তারপরই পড়লাম ভেঙে ঠাকুরের পায়ে—শুধু কান্না আর কান্না : আমি কিছুই জানি না, ঠাকুর, শুধু জানি তোমাকে—তুমি যদি অন্তর্যামী হও, তবে তুমি জানো যে এ কথা সত্যি। কেবল একটি মিনতি : আমার প্রাণ যায় যাক, কিন্তু মান যেন বজায় থাকে—গুণ্ডারা যেন আমার গায়ে হাত দিতে না পারে।'

"সতী ব'লে চলল : 'কতক্ষণ ঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে কেঁদেছিলাম মনে নেই—কেবল এইটুকু মনে আছে যে এক অপরূপ শান্তিতে আমার দেহমন জুড়িয়ে গেল। দেখা বলতে যা বোঝায় তেমনি কিছু দেখিনি, মামাবাবু! শুধু এইটুকু বলি যে, মনে হ'ল যে কী একটা অনামী শক্তি আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। আমার কিন্তু তখন কোনো ঘোর বা ভাব-টাবের অবস্থা নয়—খুবই সজাগ প্রতি ইন্দ্রিয় : স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বাইরে হু হু ক'রে কল্লোল বেড়ে উঠছে, চোখে দেখতে পাচ্ছি ওপারের রাস্তায় গুণ্ডাদের ভিড়—একটু বাদেই চমকে উঠলাম দেখে পাশের এক হিন্দু বাড়িতে আগুন জ'লে উঠল দাউ দাউ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে সে কী আর্তনাদ! ওদিকে চোখ পড়তেই দেখি—দু'তিনটে গুণ্ডায় মিলে এক যুবতী মেয়েকে টেনে তুলছে একটা মোটর-ট্রাকে, মেয়েটি আপ্রাণ চিৎকার করছে—বাঁচাও, বাঁচাও! কিন্তু বাঁচাবে কে—যখন যে রক্ষক সে-ই ভক্ষক—পুলিশও

গুণ্ডামিতে মেতে উঠেছে। এ ছাড়া আরো দুম্‌দাম হৈ-চৈ-এর শব্দ হাওয়ায় আসছে ভেসে, প্রত্যেক ধ্বনিটি কানে আসছে, যা কিছু ঘটছে চোখে দেখছি অথচ আমি যেন কিছুতেই নেই—সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন! সে-অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না মামাবাবু, কারণ আমি এখনো নিজেই জানি না কোত্থেকে আমার মনে এল এহেন অভয় যখন কানে শুনছি কান্নাকাটি, চোখে দেখছি পৈশাচিক কাণ্ড!

'খানিকবাদে শুনতে পেলাম আমাদের বাড়িতে হুড়মুড় ক'রে একদল লোকের ঢোকার শব্দ। কিন্তু তখনো আমার বুকের মধ্যে সেই ঠাণ্ডা অনুভূতি। এমনি সময়ে হঠাৎ আমার দোরে ধাক্কা। আমি চুপ করে ব'সে রইলাম ঠাকুরের দিকে ঠায় চেয়ে। একটু বাদে ওরা দোরে ঘা দিতে লাগল। আমি সমানই নিরুত্তর। দেখতে দেখতে মড় মড় ক'রে দোর ভেঙে পড়ল—আর ঘরের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকল চার পাঁচজন দুশমন চেহারার গুণ্ডা। একজন আমাকে দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল: মিল্ গিয়া রে, মিল্ গিয়া—মহশাল্লা! তাদের মধ্যে দু'জন আমার দিকে ছুটে আসতেই আমি বললাম: খবর্দার! আমাকে ছুঁয়ো না—ব'লেই গলার মণিমালা, হাতের বালা, চুড়ি, কানের দুল সব একে একে খুলে খুলে ওদের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকলাম, আর ওদের মধ্যে প'ড়ে গেল কাড়াকাড়ি। একজন এসে আমার আলমারির চাবি চাইল। আমি ঝনাৎ ক'রে মাটিতে চাবি ফেলে দিলাম। ওরা টাকাকড়ি শাল-দোশালা গহনাপত্র যা কিছু ছিল সব নিল লুটেপুটে।

'আমার হঠাৎ চোখ পড়ল এদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ লোকের পরে! গালপাট্টা দাড়ি, লম্বা কঠিন ধারালো দু'টি চোখ যেন জ্বলছে, কাশ্মীরী, চমৎকার চেহারা। দেখেই বুঝলাম—সে-ই দলপতি। ঠিক গোলাপ ফুলের মত রঙ! প্রথম দিকে সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, কিন্তু আমার পানে তার চোখ পড়তেই সে কেমন যেন থমকে গেল, বাকি তিন-চারজন যখন লুটতরাজে ব্যস্ত তখন ও ঠায় আমার দিকে চেয়ে! ওর চিবুক দেখে মনে হ'ল রোখালো মানুষ। অথচ মুখের মধ্যে কেমন যেন একটা বিষাদের ছাপ। একটু অবাক্ লাগল—আমার দিকে চেয়ে কেন, লুটতরাজ ছেড়ে? এমন সময়ে তাকে লক্ষ্য ক'রে একটি গুণ্ডা গ্রাম্য উর্দুতে বলল: রহমৎ, এবার এই অওরৎকে নিয়ে যাই কী বলিস্? ক্যা খুবসুরৎ! কাজে লাগবে। লোকটি গম্ভীর কণ্ঠে বলল: না, ওকে নিয়ে আমাদের কী হবে? বলতেই সে-গুণ্ডাটা অট্ট হেসে সহচরদের পানে তাকিয়ে বলল: তোদের বলিনি—ওস্তাদ রহমতের মগজ মাখনে-ভরা? নৈলে এমন

দরদ! চল্‌রে দোস্ত—একেও নিয়ে যাই—খাসা মাল—চুষতেও তাজা বেচলেও মজা! বলতে না বলতে তিনজন এল আমার দিকে এগিয়ে—চোখে পশুর লুব্ধদৃষ্টি। আমি চেঁচিয়ে হিন্দিতে বললাম: তোমাদের ঘরে কি মা বোন মেয়ে নেই? বলতেই ওরা কেমন যেন থম্‌কে গেল। এম্‌নি সময়ে হঠাৎ সে-লোকটি এগিয়ে এসে বলল: তোরা একটু বাইরে যা, আমিই একে নিয়ে যাচ্ছি বুঝিয়ে সুঝিয়ে। তোরা বরং দেখ্—আর সব ঘরে হাতিয়ে নেবার মতন কিছু আছে কি না। বলতেই ওরা খুশী হ'য়ে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে গেল, কেবল ওদের মধ্যে একজন—মুখে মদের গন্ধ—বলল ওর কান ঘেঁষে: ওস্তাদ, একে আব্দুলের কাছে নিয়ে গেলে সে লুফে নেবে—বেশ মোটা বখশিশ মিলবে। এমন বিবি না চাইবে কোন্ বেকুফ?

'ওরা বেরিয়ে যেতেই লোকটি আমার কাছে এসে চাপা স্বরে পরিষ্কার বাংলায় বলল: শীগ্‌গির আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসো। আমি কাশ্মীরীর মুখে বাংলা শুনে চম্‌কে উঠতেই সে বলল: আমি পনেরো বৎসর ঢাকায় ছিলাম—কিন্তু সে-সব হবে পরে, তুমি দেরি কোরো না, আমার সঙ্গে জল্‌দি বেরিয়ে এসো যদি বাঁচতে চাও। আমি বললাম: আমার ঠাকুরকে না নিয়ে আমি যাব না। সে চম্‌কে উঠে বিগ্রহের দিকে চেয়ে বলল: ও! ব'লে মুখ নিচু ক'রে একটু ভেবেই: আচ্ছা, তাহ'লে এক কাজ করো—ব'লেই আমার বিছানা থেকে বিছানার চাদরটা উঠিয়ে নিয়ে পকেট থেকে ছুরি বের করে দুটো জায়গায় বোরখার যেমন থাকে তেম্‌নি ছোট ছিদ্র ক'রে আমাকে মুড়ে ফেলল: দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম: হ্যাঁ। ও বিগ্রহটিকে নিজের শালে ঢেকে নিয়ে বলল: চলো এবার—তুরন্ত্, দেরি করলে হয়ত তোমাকে বাঁচাতে পারব না। তোমার কোনো ভয় নেই মা! আমাকে বিশ্বাস করো! আমার একটি মেয়ে ছিল—ঠিক তোমারি মতন সুন্দর! বলতে না বলতে ওর চোখে জল ভ'রে উঠল।

'ওর চোখে জল দেখে আর মুখে স্নিগ্ধ বাংলায় মা-ডাক শুনে আমার প্রাণ মন যেন জুড়িয়ে গেল। আমি ওর পিছন পিছন বাইরে এসে দাঁড়াতেই বাঁদিকে আমাদের গ্যারাজে ওর চোখ পড়ল, বলল: কার মোটর? আমি বললাম: আমার। ও একটু ভাবল, পরে বলল: কত তেল আছে জানো? আমি বললাম: জানি। আজকালের মধ্যে আমাদের কাশ্মীর রওনা হবার কথা ছিল, তাই কালই বিকেলে পেট্রোল ভ'রে নিয়েছিলাম ট্যাঙ্কে। এছাড়া গাড়ির মধ্যে চার টিন পেট্রোল মজুত আছে। ওর মুখের মেঘ কেটে গেল, ব'লে

উঠল : শুভানাল্লা ! তাহলে আর ভয় নেই। কিন্তু তুমি কথাটি কোয়ো না—চুপ ক'রে ব'সে থেকো মোটরের এক কোণে বোরখা প'রে। এই নাও তোমার ঠাকুর, কেবল একে তোমার বোরখার নিচে ঢেকে রাখবে সারা পথ, বুঝলে? মনে রেখো, পথে কেউ একবার দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না। ব'লেই মোটর বের ক'রে আনল, আমি ঢুকে বসতেই ও গেটের দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

'কিন্তু রাস্তায় প'ড়ে বাঁদিকে মোড় নিতেই একদল গুণ্ডার শোরগোল। তৎক্ষণাৎ ও গাড়ি ঘুরিয়ে ডান দিকে চালালো একটা ছোট শড়কে। খানিক বাদে আবার একটা বড় রাস্তায় এসে শোনা গেল চেনা চিৎকার, হুঙ্কার…এখানে ওখানে কয়েকটা হিন্দুর বাড়ি জলছে, পথে দাঁড়িয়ে হিন্দু ছেলে মেয়ে শিশু বুড়ো বুড়ী। হঠাৎ সামনে চোখ পড়তেই চম্‌কে উঠলাম : বিমান ঘাঁটির ছাপমারা একটি বাস,—তার চারধারে মুসলমান গুণ্ডা—দুতিনজন যাত্রী পথে শুয়ে, তাদের চারদিকে শুধু রক্ত। দু'চারটে পুলিশও চোখে পড়ল কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে হাসছে—বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না তারা কাদের দলে। ও ব্রেক কষতেই আমার চোখ পড়ল সাম্‌নে—অম্‌নি আমার বুকের রক্ত যেন জল হ'য়ে গেল। দেখি কি, সেই ভিড়ের মধ্যে আমার নন্দাই দু' হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে, আমার শাশুড়ী চিৎকার ক'রে কাঁদছেন—কেবল আমার ননদের কোনো চিহ্ন নেই। আমি ব'লে উঠলাম : আমার শাশুড়ী—ও চাপাস্বরে 'চুপ্' ব'লে ধম্‌কেই মোটর পিছন দিকে হটিয়ে বাঁদিকে একটা গলিতে চালিয়ে দিল। গলিটা এত সরু যে ওদিক থেকে যদি একটা গাড়ি আসত তাহ'লেই সর্বনাশ, মোটর দাঁড় করাতেই হ'ত। কিন্তু ভাগ্যক্রমে, এ-গলিতে কোন যানবাহনের চিহ্নও দেখা গেল না। আমি তখন ফের ব'লে উঠলাম : সর্দারজি, আমার শাশুড়ীকে দেখলাম পথে দাঁড়িয়ে—বাসে ক'রে তিনি তাঁর মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে রওনা হয়েছিলেন প্লেন ধরতে—

'আমার কথা শেষ হবার অগেই ও বলল : কাল রাত্রেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, একটি হিন্দুকেও পারৎপক্ষে প্রাণ নিয়ে ফিরতে দেব না হিন্দুস্থানে—তাদের প্রতি মোটর বাস গাড়ী আটকাব—ব'লেই ফের চাপা স্বরে বলল : চুপ, কথা কোয়ো না! দেখি : সাম্‌নেই দু'তিন জন গুণ্ডা। রহমৎ বলল : ওরা যদি সন্দেহ করে যে তুমি হিন্দু মেয়ে, বোরখা প'রে পালাচ্ছ, তবে তোমাকে তো মারবেই, আমাকেও আস্ত রাখবে না—যে কাফেরকে বাঁচাতে যায়!

'বলতে না বলতে—যা ভয় করছিলাম: দেখি গুণ্ডারা ছুটে আসছে। একজন বলল: রোকো। রহমৎ হঠ্ যা—ব'লে গর্জে উঠেই আরো বেগে মোটর চালিয়ে দিল। ওরা সভয়ে লাফিয়ে দু'পাশে প'ড়ে গেল সরু নর্দমায়। আমি মোটরের পিছনের জানলা দিয়ে দেখি কি—ওরা হৈ-চৈ ক'রে লোক ডাকছে। কিন্তু ততক্ষণে আমরা ওদের নাগালের বাইরে।

'এতক্ষণ আতঙ্কে কান্নাও ভুলে গিয়েছিলাম—মোটরটা একটু দূরে গিয়ে একটা ফাঁকা বড় রাস্তায় পড়তেই বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। বিশেষ করে মনে হ'ল আমার ননদের কথা—যাকে দেখতে পাই নি। নিশ্চয় গুণ্ডারা তাকে ধ'রে নিয়ে গেছে—সুন্দরী ও যুবতী দেখে! শাশুড়ী হয়ত প্রাণে বেঁচে ফিরতেও পারেন কিন্তু কী হবে আমার ননদের? রহমৎকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল: ওকে নিশ্চয়ই গুণ্ডারা কোথাও নিয়ে গিয়ে বেচবে। আমার মাথার বোরখা খ'সে প'ড়ে গেল। বললাম: বেচবে? ও কেমন এক রকম হাসি হেসে বলল: একথা শুনে চম্‌কে উঠলে মা? আমার চোখের সামনে দেখেছি কত হিন্দু মেয়ের—ব'লেই ফের: চুপ্! সামনেই একটা বস্তি। আমি চোখ মুছে ব'সে ভাবতে লাগলাম আথাল-পাথাল! হঠাৎ একটা চিন্তায় চম্‌কে উঠলাম: বিচিত্র বটে ঠাকুরের লীলা! —যারা ভেবেছিল প্রাণে বাঁচবে বিমানঘাঁটির রক্ষণাবেক্ষণে—তারাই পড়ল মারা, আর যার আশ্রয় বলতে কেউ ছিল না—তার ভক্ষকই হ'ল রক্ষক!'

"মাসিমা চোখ মুছে বললেন: 'সত্যি মা! আমরা'—

"আমি বললাম: 'তারপর?'

"সতী বলল: 'একটু পরেই এল সেই বস্তি। এবার আর অন্য পথ ছিল না—ঐ বস্তির মধ্যে দিয়ে ছাড়া, আশেপাশে কেবল খোলা মাঠ আর এখানে ওখানে চালা ঘর। রহমৎ ফের মনে করিয়ে দিল যেন একটি কথাও না কই। বলতে না বলতে দেখি—অদূরে চার-পাঁচটা গুণ্ডা! আমার খেয়ালই ছিল না যে আমার মুখে বোরখা নেই, রহমৎ তো আর পিছন দিক তাকাবার ফুরসৎ পায়নি, তাই আমাকে সাবধান ক'রে দিতেও পারেনি। ওরা বোধ হয় আমার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই উঠল হৈ-চৈ করে: কাফের কাফের—পকড়ো, পকড়ো! চম্‌কে উঠে রহমৎ পিছনদিকে ঘাড় ফিরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল: মা! বোরখা—বোরখা! আর বোরখা! —ওরা ততক্ষণে দেখে ফেলেছে! ওদের মধ্যে দুজন হাত তুলে দাঁড়ালো আমাদের মোটরের সামনে: রোকো, রোকো! রহমৎ এই প্রথম ভুল ক'রে বসল—ব্রেক কষল। ওরা

ছুটে আসতেই রহমৎ গ'র্জে উঠল: হঠ্ যা। কিন্তু কে শোনে তখন? একজন এসে ধরল রহমতের পাশের দরজার হাতল। সঙ্গে সঙ্গে ও বিদ্যুৎবেগে পাশের মোটা লাঠি তুলে নিয়ে তার মাথায় এক ঘা। সে যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে ছিটকে পড়ল এক তাল সুরকির উপর। হৈ-হৈ করে আরো দু'জন এল ধাওয়া ক'রে। রহমৎ আর দ্বিধা না করে সোজা মোটর চালিয়ে দিল। একজন মাডগার্ডের ধাক্কায় ঠিকরে পড়ল বাঁ পাশে, অন্যজন দুম্ ক'রে প'ড়ে গেল মোটরের সামনে—সঙ্গে সঙ্গে মোটর উঠল লাফিয়ে তার দেহের উপর দিয়ে। অমনি চারদিকে বস্তি থেকে হাঁ-হাঁ করতে করতে লোক এল ছুটে—কিন্তু ততক্ষণে আমাদের গাড়ি তিন শ' গজ দূরে। আমি তাড়াতাড়ি বোরখা প'রে পিছনের জানলা দিয়ে তাকাতেই দেখি কি দুটো দাড়িওয়ালা মুসলমান সাইকেলে চড়ছে। কিন্তু আমার নতুন বুইগ মোটর, রহমৎ অ্যাকসেলারেটার টিপল··কাঁটা নড়তে নড়তে পঞ্চাশ মাইলের নম্বরে এসে পৌছল, তার পর রাস্তা খোলা—কাঁটায় দেখলাম চলেছি ঘণ্টায় ষাট মাইল—সাইকেলের সাধ্য কি? মিনিটখানেক বাদেই পিছনদিকে আর কোনো আরোহীকে দেখতে পেলাম না।

'তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রহমত বলল: কী কাণ্ড বাধিয়েছিলে মা! বোরখা খুলতে মানা করলাম এত ক'রে—। আমি হেসে বললাম: আমাদের কি বোরখা পরা অভ্যাস আছে? ও বলল: তা বটে। কিন্তু আর খুলো না মা, কেমন? বড় বেঁচে গিয়েছি। আমি লজ্জিত হ'য়ে বললাম: না, আর এমন ভুল হবে না।

'খানিক বাদে—প্রায় তিন ঘণ্টা হবে—থামলাম এসে একটা চালাঘরের সামনে। ও বলল: আর ভয় নেই—এবার বোরখা খুলে ফেল, এখানে একটু জিরিয়ে যা হোক দু'টো খেয়ে নাও। আমি বললাম: এখানে কেন? ও বলল: আমার ডেরা। আমার প্রতিবেশীরা কেউ নেই—সবাই গেছে শহরে লুটতরাজ করতে। ব'লেই ম্লান হেসে: আমিও গিয়েছিলাম মাঈ! কেবল দেখ আল্লার কাণ্ড: কী করতে বেরিয়েছিলাম—কী ঘ'টে গেল চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে! এখানে কেউ নেই। আর যদি থাকেও—কুছ পরোয়া নেই—এ আমার এলাকা—দুর্দান্ত রহমৎ থাকে এখানে সবাই ডরায়। কোন ভয় নেই তোমার।

'এই "ভয় নেই" শুনেই আমি ভেঙে পড়লাম। ওর চালাঘরে নেমেই ওর চাটাইয়ের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে কান্না আর কান্না। আমার না হয় ভয় নেই, কিন্তু আমার নন্দাইয়ের, শাশুড়ীর—বিশেষ ক'রে আমার ননদের? ক্রমাগতই

মনে হয় ওর কথা—ওকে ওরা বেচবে, আর প্রাণ কেঁদে ওঠে। আহা, আমার ননদের বয়স সবে বাইশ! তার উপরে সুন্দরী। ওর কী দশা হবে?

'রহমৎ আমার মাথার কাছে ব'সে আমার মাথায় কেবল হাত বুলোয় আর ক্লিষ্টকণ্ঠে বলে: মা…মা…মা! আর কী-ই বা বলবে সান্ত্বনা দিতে?

'খানিক পরে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসতেই ও কোণের উনুন থেকে গরম জল নামিয়ে চা ক'রে আমার সামনে ধরল। পাশে একটা রেকাবিতে দুটো রুটি, গুড় আর একটি আপেল। বলল: 'কিছু খেয়ে নাও মাঈ। দিল্লি পৌঁছুতে রাত আটটা নটা হ'য়ে যাবে।

'আমি বললাম: আমি কিছুই খেতে পারব না, তুমি খেয়ে নাও। ও বলল: মা, তুমি না খেলে আমি কেমন ক'রে খাই বলো? তুমি এখন তো শুধু আমার মা নও, আমার মেহমান যে।

'অগত্যা আমি এক পেয়ালা চা আর একটু রুটি ভেঙে মুখে দিয়েই বললাম আর না। ও বলল: আর একটু খেয়ে নাও মাঈ—পথে আর দাঁড়ানো চলবে না, সারা পাকিস্তানেই আগুন জ্ব'লে উঠেছে! দিন থাকতে লাহোর পেরুতে না পারলে হয়ত তোমাকে বাঁচাতে পারব না। আমি বললাম: লাহোর এখান থেকে কত দূর? একশ' মাইল হবে—ব'লে ও নিজের জেব থেকে একটা ঘড়ি বার করল: এখন বেলা সাড়ে বারোটা—আমরা চার ঘণ্টার পথ এসেছি। লাহোরে পৌঁছুতে হয়ত তিনটে বাজবে। যদি কোনোমতে একবার লাহোর পেরুতে পারি তা'হলে কেল্লা ফতে।

'আমি খেতে খেতে ওর জীবনকাহিনী শুনতে লাগলাম: ও বলল: মা! এ-অঞ্চলে আমার খুব নাম ডাক। দুর্দান্ত লোক আমি। হিন্দুকে দেখলেই মারব পণ নিয়ে রাওলপিণ্ডিতে একদল গুণ্ডার দলপতি হ'য়ে কাল রাতে মৎলব এঁটেছিলাম—ভোর থেকেই মারধোর লুটতরাজ শুরু করব। কেন এ-পণ নিয়েছিলাম শুনবে? জলন্ধরে হিন্দুরা আমার একমাত্র মেয়েকে খুন করেছে গত দাঙ্গায়। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম! রাওলপিণ্ডিতে আমরা আজ ভোরে উঠেই এক ধনী হিন্দুর বাড়ি লুট করেছি সবাই মিলে— যদিও যাঁর বাড়ি তাঁকে ধরতে পারিনি। কাল মাঝ রাতেই তিনি খবর পেয়ে মোটরে ক'রে পালিয়েছেন সপরিবারে। তাই আমি আরো রুখে উঠে চড়াও হই তোমাদের বাড়িতে। কিন্তু মা, হঠাৎ তোমার মুখের পানে চেয়েই চমকে উঠলাম। বলতে বলতে ওর চোখে জল: মা, আমার দৌলৎও ছিল ঠিক তোমারি মতন মেয়ে—ফোটা ফুলটি! বয়সে তোমার চেয়ে হয়ত দু-এক বছর

ছোটই হবে, কিন্তু তার রং একেবারে তোমার ম'ত, ঠিক এম্‌নি আপেলের মতন লাল টুকটুক করত তার গাল দুটি—এম্‌নি ডাগর কালো চোখ—আর সবচেয়ে আশ্চর্য—তার গালেও ঠিক কি এমনি একটি তিল ছিল! বলতে বলতে ওর দু'গাল ব'য়ে দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। চোখ মুছে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে ব'লে চলল: ঠিক যখন ওরা তোমার গায়ে হাত তুলতে যাবে—তুমি বললে: তোমাদের ঘরে কি মা বোন মেয়ে নেই? আমার বুকে কে যেন হাতুড়ি মারল। মনে হ'ল যেন আমার দৌলৎই আমাকে মনে করিয়ে দিল আমি কী ছিলাম কী হ'তে চলেছি···কিন্তু দেখ আল্লার খেল্‌: কোত্থেকে কী হয়! তোমাকে দেখতে না দেখতে আমার মধ্যে জেগে উঠল সেই রহমৎ খাঁ যে মানুষই ছিল মাঈ, শয়তান না। তারপরও মনের কোণে একটু কুণ্ঠামতন ছিল হয়ত। কারণ মনকে বোঝাচ্ছিলাম যে, এত নরম হচ্ছি কিসের লোভে? এমন সময় তোমার মুখে দেখতে পেলাম—কী যে দেখলাম জানি না মা। কিন্তু চম্‌কে গেলাম—যখন তুমি বললে তোমার ঠাকুরকে না নিয়ে তুমি নড়বে না। আমরা মুসলমান মা! কিন্তু আমি পনেরো বৎসর ঢাকাতে ছিলাম—বাস চালাতাম! তাই হিন্দুরা প্রতিমা কী রকম ভালোবাসে জানতাম। বরাবরই আমার মনে হয়েছে—এ সব বড় জোর পুতুল-খেলা। কিন্তু যখন দেখলাম বাঁচবার সুযোগ পেয়েও তুমি সে-সুযোগ পায়ে ঠেললে ঐ পাথরের মূর্তির জন্যে, তখন, কেন জানি না, আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। কিসে কী হয় কেউ কি জানে মা? আমি শক্ত মরদ—তার ওপরে আজ দুর্দান্ত গুণ্ডা। কিন্তু তোমার ঐ ছোট্ট একটি কথায় আমার বুকে জেগে উঠলো দরদ—চোখে জল। মনে হ'ল—কী যে ঠিক মনে হ'ল বলতে পারব না, কিন্তু সব যেন ভেস্তে গেল ভাবতে যে, পুতুলকে মানুষ সত্যি এমন ভালো-বাসতে পারে তা'হলে? জানি না মাঈ, ঐ পুতুলের মধ্যে দিয়ে আল্লা কথা কন কিনা—কিন্তু মনে হ'ল যে-মেয়ে একে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতে পারে, সে ঠিক গড়পড়তা মেয়ে নয়। অমনি আর কুণ্ঠা রইল না, ঠিক করলাম তোমাকে বাঁচাবই বাঁচাব যেমন ক'রে পারি! কিন্তু আর দেরি করা নয়—বেলাবেলি তোমাকে নিয়ে যদি লাহোর পেরুতে পারি তবেই না মরদের মুরদ।

'আমার চোখে জল এল। আমি বললাম: রহমৎ খাঁ! তুমি আমার শুধু যে প্রাণ মান ইজ্জৎ বাঁচিয়েছ তাই নয়, তোমার কৃপাতেই আমি আমার ঠাকুরকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। এ-ঋণ শোধ হবার নয়, কিন্তু আমার জন্যে

যখন এতই করলে, তখন আর একটু করবে দয়া ক'রে? রাওলপিণ্ডিতে যখন ফিরে যাবে একটু খোঁজ করবে—আমার শাশুড়ী ননদের?

'ও ম্লান হেসে মাথা নেড়ে বলল: মাঈ! রাওলপিণ্ডিতে আমি কি আর ফিরতে পারব? এতক্ষণ সেখানে সবাই জেনে গেছে রহমৎ খাঁ কাফেরকে বাঁচাতে মুসলমান মেরেছে—যার উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিয়েছি সে হয়ত ম'রেই গিয়েছে। কাজেই আমি এখন ধরতে গেলে ফেরার। ওখানে আমার এক ভাইপো আছে, তাকে একবার লিখে দেখতে পারি—তবে মিথ্যে ভরসা দিয়ে কী হবে মাঈ—ওদের কেউ ফিরবে না। তোমার ননদ হয়ত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—যদি সে খুব খুবসুরৎ হয়—কিন্তু সে-বাঁচা যে কেমন—বুঝতেই তো পারো। ব'লে ম্লান হেসে—মা! মানুষ যখন জাহান্নমে যায়, তখন সে কি আর মানুষ থাকে? আমি নিজেকে দিয়েই কি জানি না মাথায় একবার খুন চেপে গেলে আমাদের কী চেহারা হয়? ব'লে ফের ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসে: মা! আমি চোখের ওপর যা দেখেছি তারপর আর যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না যে, গুণ্ডা যাদের বলি, তাদের সঙ্গে ভদ্রদের কোনো সত্যি ফারাক্ আছে। মনে হয় বুঝি মানুষের মুখোশ প'রে আমরা জানোয়ার আজো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি—থেকে থেকে সে-মুখোশ খ'সে পড়লেই বেড়িয়ে পড়ে আসল নকল। কিন্তু যাক, এখন চলো। ব'লে দুটো কৌটোয় কিছু রুটি আর একটা বোতলে জল ভ'রে নিয়ে মোটরে চ'ড়ে বসল। তখন বেলা একটা হবে।

"পথে কী দেখব—গুণ্ডারা ফের রুকবে কি না, এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ফের ভুলে গেলাম তাঁর করুণা মামাবাবু, যিনি তাঁর জাদুতে ঘাতককে দাঁড় করালেন ত্রাতা। কে জানে কী হবে ভাবতে ভাবতে ঠাকুরকে ডাকতেও ভুলে গেলাম—হয়ত তাই ফের বিপদ এল আর এক অভাবনীয় পথ বেয়ে। হ'ল কি রহমৎ খুব বেগে মোটর চালাচ্ছিল একটা শহরতলীতে—এক পুলিশ রাস্তার মাঝখানে হাত তুলে হাঁকল: রোকো। ও ভ্রূক্ষেপ না ক'রে হঠ্ যা—হেঁকেই অ্যাকসেলারেটর টিপল···পুলিশের পুলিশলীলা আর একটু হ'লেই সাঙ্গ হয়েছিল আর কি—যাকে বলে রগ ঘেঁষে বেঁচে যাওয়া। যখন সে দেখল মোটর আরো বেগে ধাওয়া করেছে—তখন সে 'আরে বাপ্' বলে ঘোর চিৎকার ক'রে লাফ দিতেই টক্কর খেয়ে প'ড়ে গেল—আমাদের গাড়ির মাডগার্ডে তার টুপি গেল আটকে! রোকো, রোকো—ব'লে চিৎকার করতে করতে আর দুজন পুলিশ ধাওয়া করল—আমি গাড়ি থেকে মুখ বার ক'রে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে আরো তিন-চার জন পুলিশ ছুটে এল বন্দুক হাতে। আমাদের

মোটর নিশানা ক'রে দুজন গুলি ছুঁড়ল—একটি ছবি ছবি তো হ এসে বিঁধল সেই মাডগার্ডে ঝুলন্ত টুপিতে। রহমৎ হঠাৎ ডান দিকে একটা মোড় দেখে বেঁক নিল। অত বেগের মাথায় বেঁক নিতে গাড়ি কাৎ হ'য়ে পড়ে আর কি—কিন্তু যা হোক টলতে টলতে গাড়ি টাল সামলে নিল। ও হাঁফ ছেড়ে বলল: উঃ বড় বাঁচাই বেঁচে গেছি মা। এই মোড়টা এখানে নিতে না পারলে ওরা আরো গুলি চালাত। আল্লা হো আকবর!

'আমি আল্লার নামে চম্‌কে উঠলাম: এ-বিপদের মধ্যে আমি ক'বার স্মরণ করেছি তাঁকে যিনি বার বার এভাবে বাঁচিয়ে দিলেন? পাথরের ঠাকুরকে বুকে জড়িয়ে মনে মনে বললাম: ঠাকুর অপরাধ নিও না যে, মনে রাখতে পারি না—মারতেও তুমি রাখতেও তুমি। অমনি—কী বলব মামাবাবু, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি—আমি সত্যি যেন অনুভব করলাম ঠাকুর চলেছেন গাড়ির শুধু ভিতরে ব'সেই নয়, বাইরেও সমান ছুটে ঘণ্টায় ষাট মাইল—ঠিক দেহরক্ষীর মতন! সে যে কী অদ্ভুত অনুভূতি—হাজার চেষ্টা করলেও ব'লে বোঝাতে পারব না।

'তারপর সময়ে সময়ে এখানে ওখানে সোজা পথ ছেড়ে ঘোরা শড়ক ধ'রে বিশেষ ক'রে পুলিশের থানা এড়িয়ে আমরা লাহোর পৌঁছলাম বিকেল তিনটায়। রহমৎ এ-অঞ্চলে বহুদিন মোটর ড্রাইভারের কাজে বাহাল ছিল ব'লেই এ সম্ভব হল—পথঘাট ছিল ওর নখদর্পণে। কিন্তু ভাবো একবার মামাবাবু, ও যদি মোটর ড্রাইভার না হ'য়ে আর কিছু হ'ত তবে আজ তোমার সতীর—উঃ কী যে আমার হ'ত ভাবতে পারো?' ব'লেই দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওর সে কী কান্না! মাসিমাও চোখে কাপড় দিলেন।"

অসিত বলল: "আমি কিছু বললাম না—কাঁদে কাঁদুক। ঠাকুরের সঙ্গে চোখের জলের মাধ্যমে যে-শুভদৃষ্টি হয় তার দাম যে কত, খানিকটা তো জানতাম। আমি শুধু চোখ বুঁজে মাথায় দুহাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানালাম তাঁকে—যাঁকে সুখের দিনে আমরা ভুলে থাকলেও দুর্দিনে আঁকড়ে না-ধ'রে পারি না। আমার মনে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ছেয়ে গেল। সে যে কী অপরূপ ভাবাবেশ!

"হঠাৎ চাপা কান্নার শব্দে চম্‌কে উঠলাম। চোখ চেয়ে দেখি: সতী মাটিতে শুয়ে—বিগ্রহটি রাখা হয়েছিল একটি চৌকির উপর, তার সাম্‌নেই। কেবল কাঁদছে আর মাথা কুটছে: 'ক্ষমা কোরো ঠাকুর, যে, তোমাকেও আমি অবিশ্বাস করেছিলাম নিষ্প্রাণ ভেবে।' মাসিমা আমার দিকে তাকালেন উদ্বিগ্ন হ'য়ে। আমি ইশারায় বললাম কোনো কথা না-কইতে।

"একটু পরে সতী শান্ত হ'য়ে উঠে বসতে মাসিমা ওকে ধ'রে নিয়ে গেলেন শোবার ঘরে। তখন আমি রহমৎকে ডেকে আমার ঘরের সামনের বারান্দায় একটি খাট আনিয়ে নিজে হাতে বিছানা ক'রে দিলাম। ও আমাকে বাধা দিতে যায়। আমি বললাম: 'ভাই, অপরের মেয়েকে ভালোবেসে যে শুধু নিজের মেয়ের শোক ভোলা নয়—নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে তার আদর করতে পারেন এক ঠাকুর—আমাদের সাধ্য কতটুকু বলো? শুধু তোমাকে বলা যে ধন্য তুমি—যার মধ্যে তিনি দিয়েছেন এমন ভালোবাসার শক্তি।'

"ওর শাণিত কঠিন দৃষ্টি চোখের জলে নরম হ'য়ে এল। ও আমার পা ছুঁতে মাথা হেঁট করতে যেতেই আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ও বলল: 'করেন কি বাবুজি, আমি জাতে মুসলমান—আপনি—' আমি বাধা দিয়ে বললাম আর্দ্র কণ্ঠে: 'ভাই, আমাদের ঠাকুরের একটি উপাধি—ভাবগ্রাহী, মানে—তিনি মানুষকে বিচার করেন তার ভাব দেখে। যারা তাঁকে সত্যি ভালোবাসেনি শুধু তারাই মানুষকে বিচার করে জাত দেখে।'

"সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: 'বাবুজি, আমার দৌলৎকে যখন হিন্দু গুণ্ডারা খুন করে তখন প্রতিহিংসার জ্বালায় আমি পণ নিয়েছিলাম—নরকেই যাব যেখানে আল্লা নেই শুনেছি। কিন্তু—' বলতে বলতে টপ্ টপ ক'রে দু' ফোঁটা চোখের জল গালে গড়িয়ে পড়ল—'মাঈকে দেখে যেন আমার মনে ফিরে এল হারানো বিশ্বাস। আর একটা কথা বলব বাবুজি? বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—কিন্তু সত্যি বলছি—যখন মা আমার চেঁচিয়ে উঠল—ঠাকুরকে ছেড়ে যাব না—আমার কানে কানে কে যেন বলল ফিসফিস ক'রে: 'এই তোর ধর্ম মা—এর সেবা করলেই ঘুচবে তোর দুঃখ।...তাই—' ব'লে চোখ মুছে: 'মাকে কি আপনি আমার হ'য়ে একটু বলতে পারেন—আমাকে এ এক্তিয়ার দিতে? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বাবুজি, মাথার মধ্যে দপ দপ করে সর্বদাই—ডাক্তার বলেছেন রক্তের চাপ এত বেশি যে, যে-কোনো মুহূর্তে সব শেষ হ'য়ে যেতে পারে। তাই আমার বিনতি—যে-কটা দিন বাঁচি যেন মা-র সেবাতেই কাটে।'

"আমি তৎক্ষণাৎ উঠে সতীকে গিয়ে বললাম। সতীর চোখ ছল ছল ক'রে উঠল। আমার সঙ্গে আমার ঘরে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে বলল: 'বেশ তো রহমৎ, চলো আমার সঙ্গে হরিদ্বার। আমি যে কুটীরে থাকব সেখানে তোমারও ঠাঁই হবে। যাবে তো?' ও হেসে বলল: 'মা! যে খেতে পায় না তাকে কি সাধতে হয় পাত পাড়তে? কেবল একটা কথা—কিছু মনে কোরো না, শুনেছি তোমার গুরু হিন্দু সাধু—আমি জাতে মুসলমান—'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'যদি তিনি সত্যি সাধু হন তবে তাঁর জাত গেছে জেনো। আর যদি তাঁর জাতধর্ম-বিচার এখনও থাকে তবে তিনি পুরোপুরি সাধু নন। কিন্তু আজ আর নয়—বিশ্রাম করো। কাল সব ব্যবস্থা হবে ধীরে সুস্থে।

অসিত বলল: "পর দিন সকালবেলা সতী আমার কাছে এসে আমার হাতে একটি চিঠি দিল। বলল: 'আমার স্বামীকে লিখেছি, মামাবাবু।'

"ও লিখেছিল: 'আমার জন্যে তুমি অনেক সয়েছ। আমিও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না—কিছুতেই। সংসারে থেকে সাধনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি সন্তান চেয়েছিলে—তাই আমার কর্তব্য আমি করেছি। কিন্তু এর বেশি যদি না পারি তবে তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না? আমি জানি তুমি মহৎ। তাই মনে হয় পারবে—যদিও আজ হয়ত তোমার মনে হ'তে পারে—হওয়া খুবই স্বাভাবিক—যে, আমি নির্মম, স্নেহহীন। যদি এভাবে আমাকে অপরাধী ক'রে তুমি মনে শান্তি পাও, তবে আমি প্রতিবাদ করব না, কেবল আমার একটা অনুরোধ আছে: আমার নামে ব্যাঙ্কে যে দু'লক্ষ টাকা আছে সে-টাকা আমি গুরুদেবের চরণে নিবেদন ক'রে দিতে চাই—এতে তুমি অমত কোরো না। করলে আমি দুঃখ পাব, কিন্তু আমি নিরুপায়, কেন না নিঃস্ব আমাকে হ'তেই হবে: পিতৃঋণ, স্বামিঋণ আমি শোধ করেছি, এবার গুরুঋণ শোধের পালা। আমার কেবল আর একটা ঋণ আছে: সন্তানঋণ। গৌহাটিতে আমার যা-কিছু জমি-জমা আছে বিক্রি করলে কম ক'রেও দেড় লাখ টাকা হবে। এসব রইল রজতের জন্যে।

'আমার শেষ অনুরোধ—তুমি আবার বিবাহ কোরো। সত্যি বলছি, আমি তাতে কষ্ট তো পাবই না, বরং শান্তি পাব ভেবে যে, আর একজন তোমাকে সুখী করতে পেরেছে যা আমি বহু চেষ্টা ক'রেও পারিনি: কেমন? লক্ষ্মীটি। আমাকে প্রসন্ন মনে অনুমতি দাও সন্ন্যাস নিতে। তোমাকে দুঃখ দিতে আমার মন সরে না। কিন্তু কী করব বলো? আমি যে আর পারছি না সইতে। তোমার কাছে আমি নানা দিক দিয়েই ঋণী—তাই তোমাকে দুঃখ দেব ভাবতেও বুকের মধ্যে খচখচ করে। কিন্তু আমি যে আজ নিরুপায়। তুমি কি এ-বিদায়ের দিনে এইটুকুও বুঝবে না যে, ঠাকুর যাকে তাঁর পায়ে টেনে নেন তার তাঁর চরণ ছাড়া ঠাঁই থাকে না?'

"সতীর অনুরোধে আমিও অরুণকে লিখলাম—বিশেষ ক'রে সতী কী ক'রে রক্ষা পেল সে খবর দিয়ে।

"তিন চার দিন বাদে উত্তর এল। অরুণ খুব শান্তভাবেই লিখল সতীকে:

'আমি তোমার বৈরাগ্য বুঝতে অক্ষম হ'লেও তোমার ব্যথা বুঝেছি নিজের ব্যথা দিয়ে। তাই ক্ষমা করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভগবান আছেন কি না জানি না। আমার মা বোনের কোনো খবরই পাই নি—ভগবান তাঁদের দেখছেন কি না বলতে পারি না। তবে এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে, আমার মন আজ অশান্ত হওয়া সত্ত্বেও দৃষ্টি এখনো ঝাপসা হয়নি—তোমাকে আগেও যেমন বিশ্বাস করতাম, আজও তেমনিই বিশ্বাস করি। তাই তুমি যদি আমাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে সত্যিই শান্তি পাও তবে আমি আমার নিজের মনঃকষ্টের জন্যে তোমাকে দায়িক করব না জেনো! কেবল একটা কথা তোমাকে ব'লে আমি হাল্কা হ'তে চাই। কথাটি এই যে, তোমার কোনো কোনো বিমুখভাকে আমি বুঝতে পারতাম না,—বুঝতে চাইতাম না ব'লেই। আজ বুঝেছি— তোমার মতন মেয়ে বিবাহ করবার জন্যে তৈরি হয়নি। আমার ভুল হয়েছিল এইজন্যে যে, আমি গড়পড়তা মেয়েদের গজকাঠি দিয়ে মাপতে চাইতাম এমন মেয়েকে, যে আর যাই হোক না কেন—গড়পড়তা নয়। আর আজ এটুকু বুঝবার কিনারায় এসেছি ব'লেই এটুকুও বুঝতে আমাকে বেগ পেতে হচ্ছে না যে, তোমার উপর জোর খাটাতে গেলে আমাদের অশান্তি বাড়বে বৈ কমবে না! তাছাড়া তোমার মামাবাবুর চিঠিতে তোমার আশ্চর্য বেঁচে-যাওয়ার খবরে এও বুঝতে পেরেছি যে এ-হেন অঘটনের ফলে তোমার মতন জন্ম-ভক্তিমতীর মনে ভগবানের করুণায় বিশ্বাস আসা স্বাভাবিক। এর বেশি কিছু আমি বলব না আজ। কারণ যে-পথ তুমি নিয়েছ সে-পথ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই আমার নেই, গুরুবাদ বলতে কী বোঝায় তাও আমি জানি না। আমি শুধু জানি একটা কথা—যে, খাঁটি মানুষ যে-পথেই চলুক না কেন, পথ হারাতে পারে না।

'শুধু তোমার একটা কথায় আমার মনে হাসি এল। তুমি আমাকে বিবাহ করতে বলতে পারলে? তবে মনে হ'লে—ভালোই হ'ল—শোধবোধ: তবু আমিই যে তোমাকে চিনতে পারিনি তাই নয়, তুমিও আমাকে আদৌ চিনতে পারোনি। নৈলে এমন কথা ভাবতে পারতে কি যে, তোমাকে ভালোবাসার পরেও আর কোনো মেয়েকে আমি ভালোবাসতে পারি?

'শেষে কেবল একটি কথা: যদি কখনো তুমি ফিরতে চাও—যদি গুরু বা ভগবান্ সম্বন্ধে তোমার ধারণার পরিবর্তন হয়, তখন হয়ত ফিরতে তোমার মন চাইবে কিন্তু সংকোচে বাধবে, তাই বলছি—যদি তুমি যা চাইছ তা না পাও— আমার গৃহদ্বার তোমার জন্যে চিরদিন খোলাই থাকবে—এমন কি যদি তুমি

আমাকে আর কখনো স্বামীর অধিকার না দাও—তা হ'লেও! কারণ আর কিছুই নয়, শুধু এই যে তোমাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ভালোবেসেছি, আর ভালোবাসা যেখানে সত্য—বিচার সেখানে নিরস্ত।"

অসিত বলল: "পরদিন সকাল বেলা আমরা তিন জনে রওনা হলাম সতীর মোটরে। আনন্দগিরিকে সতী আগেই সমস্ত কথা লিখে জানিয়েছিল।

হরিদ্বারে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটে। চারদিকে সোনার আলোর বান ডেকে চলেছে। আনন্দগিরির কুটীরে পৌঁছতেই গঙ্গার শোভায় ও কুলু-ধ্বনিতে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মনে হ'ল—আকাশে বাতাসে যেন মধু ঝরছে,... মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ...

"দীপ্তানন, সৌম্যমূর্তি, শুভ্রশ্মশ্রু, গেরুয়া-পরা গুরুর পায়ে সতী লুটিয়ে পড়ল। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন! সতী মাথা তুলতে ওর চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললেন: 'কী মা লক্ষ্মী? বিগ্রহ নিষ্প্রাণ, না জীবন্ত?' সতী মাথা নিচু ক'রে চোখ মুছল।

"তারপর আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই আনন্দগিরি: 'এসো বাবা!'

কথাবার্তা শুরু হল। আনন্দগিরি বললেন সতীকে: 'ঠাকুরের মত পেয়েছি মা। আমার কুটীরের পাশেই গঙ্গাতীরে একটি ছোট বাড়ি বিক্রি আছে। আমি বাড়িওয়ালাকে বলেছি—আমার মা লক্ষ্মী কিনবেন—আর নামও ঠিক করে রেখেছি আগে থেকে: লক্ষ্মী আশ্রম। কেমন? ঠিক নাম হয়নি?'

"সব শেষে রহমৎ এগিয়ে আসতেই তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন: 'আও ভাই, বৈঠো।'

"রহমৎ বলল: আমি বাবুজিকে কালই রাতে বলছিলাম যে, আমি মা-র কাছে থেকে শেষ জীবনটা তাঁর সেবায়ই কাটাতে চাই—যদি না আমি মুসলমান ব'লে সাধুজির আপত্তি থাকে।'

"আনন্দগিরির মুখ কেমন যেন হ'য়ে গেল। ঠোঁটে হাসি, চোখে আলো! ওর চোখের দিকে খানিক একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন: 'বোসো সর্দারজি! ব'লে ওকে সাদরে পাশেই বসিয়ে ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একটি হাত সস্নেহে ওর কাঁধে রেখে বললেন:—'একটি গল্প বলি শোনো আমাদের দেশে এক মস্ত গুরুজি ছিলেন—জ্ঞান ভক্তি প্রেমে সন্তদের মধ্যেও যাঁর জুড়ি মেলা ভার। তিনি ছোটজাতের মধ্যেই জন্মেছিলেন—জোলা। কিন্তু হ'লে হবে কি, ভগবান্ যাকে গ্রহণ করেন পণ্ডিতেরা বর্জন করলেও মানুষ তাঁকে বরণ করবেই। দেশজোড়া হ'ল তাঁর নাম! সবাই তাঁকে মনে করে আপনার। তিনি যখন মহাপ্রয়াণ করেন

তখন তাঁর দেহ নিয়ে পড়ল কাড়াকাড়ি। মুসলমানেরা বলে ইনি আমাদের পীর, আমরা এঁকে গোর দেবো ; হিন্দুরা বলে ইনি আমাদের গুরু, আমরা এঁর সংকার করব। দুই দলে মহা দাঙ্গা হবার যোগাড়—এমনি সময়ে একটা ঝাপটা এসে শবদেহের ঢাকনি চাদরটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। দুই দলই অবাক্—দেহ অদৃশ্য! তখন ওদের চৈতন্য হ'ল—কাকে নিয়ে করেছিলাম দলাদলি যে সব দলেরি পারে চ'লে গেছে ভগবানের আপন হ'য়ে? বলতে বলতে আনন্দগিরির দীপ্ত চোখ দুটি বাষ্পাভাসে চিকিয়ে উঠল, তিনি গান ধ'রে দিলেন ভাবাবেশে :

খোদা জো মসজীদে বসতে হৈ—অওর মুলুক কেহিকেরা?
তীরথ মূরত রাম নিবাসী—বাহির করে কো হেরা?
পূরব দেশমে হরিকা বাসা, পশ্চিম অলহ মুকামা?
স্থনো ভাই সাধু: দিলমে খোজো—রহী করীমা রামা।
যেতে অওরত মরদ উপানী—সো সব রূপ তুম্হারা।
কবীর বালক—অলহ রামকা, সো গুরু পীর হমারা॥

* * *

বার্বারা একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : "এর মানে?

অসিত গুন গুন ক'রে ইংরাজিতে বলে :

যদি খোদার নিবাস হয় শুধু মসজিদে,—তবে
আর সব দেশ বলো কার?
যদি রাম শুধু তীর্থে কি প্রতিমায় রাজে,—তবে
কে লবে ভবের সমাচার?
ঘর রহিম বাঁধেন শুধু পশ্চিমে? পূরবেই
শুধু ঝংকারে হরিনাম?
সাধু, শোনো ভাই কান পেতে অন্তরে—ডাকে যেথা
একই স্থরে রহিম ও রাম।
প্রভু! যত নর যত নারী—জনে জনে গায় নাকি
তোমারি মহিমা স্থগভীর?
জানে কবীর—রহিম রাম—উভয়েরি শিশু সে যে,
যিনি গুরু, তিনিই তো পীর!

বার্বারা উঠে দাঁড়ায়, দস্তানা পরতে পরতে বলে ছোট্ট একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে : "আর আমরা মিশনারি পাঠাই কি না আপনাদের দেশে—ধর্ম কাকে বলে বোঝাতে!"

আনন্দগিরি

নিউয়র্কের এক সাঁঝ-সভাতে অসিত ঘণ্টাখানেক ধ'রে করল স্মৃতিচারণ: কোথায় কোন যোগীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, তাঁর কী বাণী, জ্ঞানমার্গীর সঙ্গে ভক্তিমার্গীর কোথায় মিল, কোথায় গরমিল ইত্যাদি। পরে তপতী উঠল বলতে। ভারতীয় রমণীর শক্তির মূল কোথায়—এই ছিল তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু!

সভা সাঙ্গ হ'লে বার্বারা তপতীকে বলল: "দিদি, কাল আমি জাহাজ পেয়েছি ইতালির। তাই আজ আমার আমেরিকান জীবনের শেষ রাত—একটু সময় হবে কি?"

অসিত বলল: "বিলক্ষণ!"

ওরা তিনজনে হেঁটেই ফিরল হোটেলে। হোটেলে সেদিন এক সেনেটর ডিনার দিচ্ছিলেন। চারদিকে আলো। দুর্দান্ত ব্যাণ্ড বাজছে। কিন্তু আঠারো তলায় অসিত ও তপতীর ঘরে গোলমাল নেই, কেবল একটা ক্ষীণ রেশ ভেসে আসছে পাতালপুরের। তপতী ফোন ক'রে হোটেলের রেস্তরাঁ থেকে কফি তলব করল।

বার্বারা বলল: "দাদা, আপনি কিন্তু খুব আঁটঘাট বেঁধে কথা বললেন। যোগীদের নানান্ অলৌকিক শক্তি, বিভূতি ইত্যাদির প্রসঙ্গকে স্রেফ্ পাশ কাটিয়ে গেলেন।"

অসিত মৃদু হাসল: "না গেলে কি আর রক্ষে ছিল? একবার অলৌকিক কাহিনীর কথা তুললেই ওরা ধরত আমাকে ছেঁকে, করত জেরার পর জেরা—কেমন ক'রে ঘটল, কজন সাক্ষী ছিল, ল্যাবরেটরির 'ফ্রড-প্রুফ' ঘরে এসব আবির্ভাব উঁকি মারতে পারে কিনা—এই সব। জানো তো তোমাদের দেশের কাণ্ড! আর তোমাদেরই বা দোষ দেব কোন্ মুখে? ধরো না, অমন সদ্গুরু আনন্দগিরি—যাকে বলে খাঁটি সোনা—কিন্তু তাঁর মাধ্যমে কয়েকটি অঘটন যখন চাক্ষুষ করি, তখন প্রথমটায় আমারো মনে হয়েছিল—সত্যিই দেখলাম, না চোখের ভুল? অথচ যা দেখলাম তা চোখের ভুল হ'তে পারে না—শুধু আরো সাক্ষী ছিল ব'লেই নয়—এমন ব্যাপার—যাকে তোমাদের ভাষায় বলা যেতে পারে objective—মানে সূক্ষ্ম ভাবগত নয়, স্থূল বস্তুগত। কিন্তু তবু আমার মনও যখন প্রথম দিকে সে সব তথ্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ভেবেই সারা হ'য়ে

উঠেছিল তখন কোন্ ভরসায় সে-সবের উল্লেখ করি? নিউইয়র্কের সাঁল-তে সে-সব বললে আমার শ্রোতারা ব'লে বসতেন হয়ত—এখানে এক্ষুনি তলব করুন সে-সব শক্তিকে—তারা হাজিরি দিলে তবে মান্‌ব তারা বাস্তব। তখন?" ব'লে একটু থেমে: "তাই আমাদের দেশের শাস্ত্রে পই পই ক'রে মানা করেছে গুহ্য কথা হাটে-বাজারে ফাঁশ না করতে। আমাদের একটি বিখ্যাত উপনিষদে বলেছে:

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।

মানে দেবতা তথা গুরুকে যিনি সত্যি ভক্তি করেন তাঁর কাছেই এসব গুহ্য তত্ত্বকথার মর্ম ধরা দেয়। একথা আরো খাটে যোগ-বিভূতির বেলায়।"

বার্বারা সকৌতূহলে বলল: "কী ধরনের যোগবিভূতি, দাদা? বলবেন? —অবশ্য যদি আমাকে হাটেবাজারের লোক ব'লে মনে না করেন।"

তপতী ওর কাঁধে একটি ছোট্ট চাপড় মেরে বলল: "তুমি শেয়ানা কম নও—জানো আমরা তোমাকে কী মনে করি—তবু আমাদের দিয়ে বলিয়ে নিতে চাওয়া যে, আমরা তোমাকে এক আঁচড়েই চিনেছি স্পিরিচুয়াল সিণ্ডরিলা ব'লে, এই না?"

বার্বারা হেসে বলল: "খানিকটা ধরেছেন বৈকি দিদি! তবে আমাদের দেশে কথায় বলে: even the devil is not nearly as black as he is painted: কাজেই আমারো হয়ত খতিয়ে কিছু আশা থাকতে পারে।" ব'লে অসিতকে: "কিন্তু ঠাট্টা তামাশা থাক দাদা—সময় যাচ্ছে ব'য়ে, আর একটু খুলে বলুন না। আবার কবে দেখা হবে—বা আদৌ হবে কি না কে বলতে পারে?"

তপতী বলল: "হবে গো হবে। আর হবে আমাদের দেশেই কোনো আশ্রমে—আজ বাড়ি গিয়েই তোমার ডায়রিতে লিখে রেখো, পরে মিলিয়ে নিও।"

বার্বারা হেসে বলল: "দিদি দেখছি শুধু যোগিনীই নন—গণৎকারও বটেন! এদেশে থাকলে বেশ কিছু উপায় করতে পারতেন। আপনারা ভুক্তভোগী, জানেন তো, আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে ধনী আমেরিকান বিধবারা গণৎকারকে দেখলে কী রকম গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠেন!"

অসিত এবার হাসল না, বলল: "কিন্তু তাই বলে মনে কোরো না গণৎকারেরা সবাই বাজে—ক'রে খাচ্ছে শুধু কুসংস্কারের দৌলতে। There

prophets and prophets" তপতীকে নির্দেশ ক'রে: তোমার সামনেই রয়েছে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত—যার একটি গণনাও অন্ততঃ আজ পর্যন্ত ভুল হ'তে দেখিনি। তাই নিখুঁৎ সুবুদ্ধিরা শুনে যতই হেসে উড়িয়ে দিন না কেন—ও যখন দেখেছে তুমি ভারতবর্ষে আমাদের আশ্রমে আসবে, তখন আমি জানি এ ভবিতব্য। কিন্তু ওর কথা যাক্—ও কিছুতেই বলতে দেবে না যখন।"

তপতী সকোপে বলল: "আমার কথা কেন যখন তখন টেনে আনো বলো তো—সিদ্ধ মহাপুরুষদের কথা হচ্ছিল—সেই তো বেশ। বরং বলো ওকে আনন্দগিরির মধ্যে কী ধরনের বিভূতি দেখেছিলে।

বার্বারা সাগ্রহে সায় দেয়, বলে: হ্যাঁ দাদা! তাঁর কথাই বলুন আজ। না না—তাঁর বিভূতি বা গণনার কথা বলছি না। বলুন সেই সব কথা যা শুনলে মনে বল পাওয়া যায়।"

অসিত সামনের একটা টেবিল চাপড়ে বলল: "সাবাস্ সত্যার্থিনী! এইই তো চাই। তবে অবহিত হও!"

পরিচারিকা কফি পরিবেষণ ক'রে বেরিয়ে গেলে তপতী কফি ঢালল তিনটি পেয়ালায়। অসিত চুমুক দিয়ে খুশি হ'য়ে বলল: "যে যাই বলুক এমন কফি কেউ করতে পারে না। শুধু তালুকে নয়—জিভ্‌কেও যেন দেয় উস্কে।" ব'লে ফের চুমুক দিয়ে শুরু করে: "খেই ধরি যেখানে কাল থেমেছিলাম সেখান থেকে—বলি কেমন ক'রে আনন্দগিরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল ধীরে ধীরে—সেই সূত্রে হয়ত এসে যাবে তাঁর যোগবিভূতির কথা—কেবল ব'লে রাখি—তিনি ভুলেও কখনো তাঁর সিদ্ধাই দেখিয়ে কাউকে অভিভূত করতে চাইতেন না, বলতেন বার বারই: এসব সিদ্ধাই তাঁর মধ্যে দিয়ে প্রকট হয় শুধু ঠাকুরের ইচ্ছায়—নিজের ইচ্ছায় নয়! যাক্ শোনো।'

অসিত কফিতে চুমুক দিয়ে বলল: "আনন্দগিরির আশ্রমটি ছিল হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ড ও হৃষীকেশের মাঝামাঝি—খুব নির্জন জায়গায়। সতীর বাড়িটি তাঁর কুটিরের পাশেই।

আনন্দগিরির কুটিরটি ছিল ছোট—কিন্তু তকতকে পরিষ্কার ও সুন্দর। চারটি ঘর। দুটি ঘর তাঁর নিজের, বাকি দুটিতে থাকত তাঁর দুটি শিষ্য! এদের মধ্যে একটির নাম হরদয়াল। বয়স বছর ত্রিশ হবে। বুদ্ধিমান তথা বলিষ্ঠ। সে বিলেত থেকে এফ. আর. সি, এস. পাশ ক'রে এসে লাহোরে ডাক্তারি করা শুরু করে। দেখতে দেখতে খুব পসার হয়! সেখানে কোনো পরিবারে সে দেখতে যেত একটি মেয়েকে। মাস কয়েক চিকিৎসা ক'রে

তাকে সে কি একটা শক্ত রোগ থেকে সারিয়ে তোলে। তারপর ওদের মধ্যে বাগ্‌দান হয়! বিয়ে হবে চার পাঁচ মাস বাদে, এমন সময় লাহোরে আসেন কে এক সিনেমার মহাচার্য। মেয়েটিকে সুন্দরী দেখে তিনি তাকে ডাকেন সিনেমায় অভিনয় করতে! লোভে প'ড়ে সে সিনেমায় যোগ দেয় ও চিত্র-চূড়ামণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'য়ে হরদয়ালকে আংটি ফিরিয়ে দেয়। কিছুদিন পরে হরদয়ালের ফের ডাক পড়ে—মেয়েটি তখন অন্তঃসত্ত্বা। ফলে ওর মনে দারুণ ঘৃণা হয়, মনঃকষ্ট তথা ঘৃণা—দুইয়ের চাপে মনে জেগে ওঠে বৈরাগ্য। এ-বৈরাগ্য হয়ত স্থায়ী হ'ত না যদি ঠিক এই সময়ে না আনন্দগিরি লাহোরে আসতেন গীতা প্রচারের একটি সভায়। তাঁর গীতাভাষ্য শুনে ও মুগ্ধ হয়ে ওঁকে গিয়ে সব কথা ব'লে জিজ্ঞাসা করে: 'কী করলে শান্তি পাওয়া যায়?' আনন্দগিরি বলেন: 'বাবা, শান্তির একটি মাত্র পথের কথাই আমি জানি: ভগবানের শরণ-নেওয়া।' দেহে ও মনে বলিষ্ঠ যুবক স্থির করে ঐ পথই নেবে। লাহোরে খুব হৈ-চৈ, কিন্তু ও শুনল না, ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে চ'লে এল হরিদ্বারে।

"অন্য শিষ্যটির ইতিহাস সাদামাটা। সে ছিল বিহারী—কলকাতার এক ছবিঘরে চাকরি করত। হঠাৎ তার স্ত্রীবিয়োগ হয়। যখন শোকে খুব কাতর হ'য়ে তীর্থে তীর্থে বেড়াচ্ছে, তখন একদিন হরিদ্বারে হঠাৎ আনন্দগিরির সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গগুণে ও আশীর্বাদে সে শুধু যে তার শোক কাটিয়ে ওঠে তাই নয়—দেখতে দেখতে হ'য়ে দাঁড়ায় ভক্ত সাধক। তার দিনের পর দিন যে কত-রকম দর্শন হ'ত—কিন্তু সে-সব থাক্—সব বলতে গেলে সারা রাতেও এ-গল্প শেষ হবে না।"

বার্বারা বলল: "কিন্তু তার নামটি বলতে ভুলে গেলেন!"

অসিত বলল: "প্রভুদয়াল। তার শুধু একদিনের কথা বলি—এখনো যেন কানে বাজে। আমরা দু'জনে একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে হঠাৎ তার মুখ খুলে গেল, বলল: "আমি সত্যি কিছুই জানতাম না, দাদাবাবু। অকাট মুখ্যু যাকে বলে—সিনেমায় একটা ছোট কাজ ক'রে যা পেতাম তাতে দিনগুজরান হ'ত কোনোমতে। এহেন দুর্ভাগার হাতে যে চাঁদ ধরা দেবে কে ভেবেছিল?' ব'লে সুর নামিয়ে: 'গুরুজি মানুষ নন বাবুজি—সাক্ষাৎ দেবতা! ভাবছেন—বাড়াবাড়ি, না? শুনুন তবে।

'তখন আমি সবে এসেছি গুরুজির কাছে। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে খুব কমই জানি। জানতেও চাইনি—তাঁকে মাপতেও চেষ্টা করি নি। কিন্তু হঠাৎ যেন

ভগবান্ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—গুরুজি কী পবিত্র, কী নির্লোভ অথচ কী দয়াল! শুনুন কেমন ক'রে জানলাম।

'গুরুজির বসবার ঘরের পাশেই আমার ঘর তো? মাঝে একটা পাতলা কাঠের দেয়াল—এ-ঘর থেকে খুব আস্তে কথা না-কইলে ও-ঘর থেকে পরিষ্কার শোনা যায়।

'হ'ল কি, আমাদেরই সিনেমার একটি পরী—সত্যিই পরী—আমাকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন—আমি ছিলাম খানিকটা তাঁরই হুকুমবরদার! আমি হরিদ্বারে চ'লে আসার পরে তাঁকে একটি পোস্টকার্ডে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখে দিলাম যে, আমি এক মহাযোগীর আশীর্বাদে পরম শান্তি পেয়েছি। তিনি এই সময়ে একটি ব্যারিস্টারের প্রেমে প'ড়ে দারুণ মনঃকষ্টে ছিলেন; আমার চিঠি পেয়েই পিঠ-পিঠ লেখেন যে তিনিও গুরুজির আশীর্বাদ চান। গুরুজি আমার মুখে সব শুনে অনুমতি দেন। তিনি হরিদ্বারে এসে সতী দেবী যে-বাড়িটি কিনে আছেন সেই বাড়িটিই ভাড়া নেন। দিন কয়েকের মধ্যে তাঁর একটা পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ল, আমাকে একদিন তিনি বললেন: প্রভুদয়াল, আমি বড় শান্তি পেয়েছি।

'কিন্তু এর কিছুদিন পরেই সব যেন ভেস্তে গেল। কী ভাবে—বলি।

'তিনি মাঝে মাঝেই গুরুজির ঘরে এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতেন'। একদিন হঠাৎ আমি আমার ঘর থেকে শুনতে পেলাম তাঁর কান্নার শব্দ। তার পরেই শুনলাম গুরুদেব বলছেন—শান্ত দৃঢ় স্বরে: কেঁদে কিছু হবে না, তোমাকে যেতেই হবে এখান থেকে! আর এসো না এখানে।

'বলতেই তার কান্না আরো প্রবল হ'য়ে উঠল। গুরুজি বললেন: না, কান্না নিষ্ফল, ওতে আমি ভুলব না! তুমি কি ভাবো—আমি টের পাইনি কেন তুমি এখানে দু সপ্তাহের জন্যে এসেও দু মাস র'য়ে গেলে? আমি স-ব জানতাম—শুধু তুমি যা জানো তা-ই নয়, তুমি যা জানো না তা-ও। সেই ব্যারিস্টারটি—যাকে তুমি চেয়েছিলে কিন্তু পাও নি ব'লেই তোমার হরিদ্বারে আসা, তাকে তুমি ভুলতে পারতে যদি চাইতে, কিন্তু চাইলে না। সে বহু কষ্টে তোমার রূপের মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। তুমি এখানে এসে প্রভুদয়ালের ও আরো অনেকের কাছে শুনলে আমার নানারকম যোগ-বিভূতি আছে। শুনতে না-শুনতে যে একটু ক্ষীণ বৈরাগ্য তোমার মধ্যে উদয় হয়েছিল স্রেফ উবে গেল, তুমি ফন্দি আঁটলে যে, আমার কাছে থেকে শিখে নেবে বশীকরণ মন্ত্র! আমি জানতাম, কিন্তু কিছু বলিনি, কারণ

আমি ভেবেছিলাম ঠাকুর তোমাকে ফের সুমতি দেবেন। কিন্তু তুমি কুমতিকে প্রশ্রয় দিয়ে শেষে আমাকেই পাকে ফেলতে চাইলে তোমার হাবভাবে, আকারে ইঙ্গিতে। দিনের পর দিন তুমি তার সম্বন্ধে কী কী ভাবতে—তা-ও আমি তোমাকে বলতে পারি। তবু আমি কিছু বলিনি শুধু এই জন্যে যে আমি দেখেছিলাম বৈরাগ্যের একটি ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গ তোমার মধ্যে জলেছিল। তাই আমি তোমার জন্যে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—যাতে ফের তুমি ঢালুপথে না গড়াও। ঠাকুর আমার প্রার্থনায় কানও দিয়েছিলেন—তোমার আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে প্রথম কিছুদিন তুমি একটু চেষ্টা করেছিলে বৈকি! কিন্তু যেই লোকজনের মুখে শুনলে যে আমার নানারকমের তান্ত্রিক শক্তি আছে, সেই তোমার কুপ্রবৃত্তি ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—তুমি প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করলে যত সব কুচিন্তাকে। আমি তোমার প্রতিটি চিন্তার খবর রাখতাম, তাই বারবারই তোমাকে বলেছিলাম—তার চিন্তা এলেই মন থেকে ছেঁটে ফেলতে: বলেছিলাম কুচিন্তা বৈরাগ্যের পরম শত্রু। এ-ও তোমাকে বলেছিলাম যে, ধর্মের পথে পা দিতে না দিতে কু-প্রবৃত্তিরা বিষম চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে—যার ইন্ধন যোগায় এই কুচিন্তারা। গীতাপাঠের সময় ইচ্ছা ক'রেই দু'তিন দিন ব্যাখ্যা ক'রে তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম গীতার একটি শ্লোকে যে, কর্মেন্দ্রিয়কে দাবিয়ে রেখে মনে মনে সস্তা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তা ক'রে যারা কাল কাটায় তারা মিথ্যাচারী। কিন্তু তুমি আমার কথায় কান দিলে না—এ-পবিত্র তীর্থস্থানে এসেও মোহের পিছু-টানকেই চাইলে মুক্তির ডাককে ছেড়ে, ভাবলে—এখনই তাড়া কী—আর কিছুদিন ভোগ ক'রে নিলামই বা—ধর্ম তো আর পালাচ্ছে না! কুপ্রবৃত্তির কুযুক্তিকে এমনি ক'রে প্রশ্রয় দিয়েই মানুষ নিজের সর্বনাশ করে, আর পরে ফের ঠাকুরকে দোষ যে তিনি সহায় হ'লেন না, হাত গুটিয়ে ব'সে রইলেন। কিন্তু ঠাকুর কী করবেন? তিনি কৃপা করেন, কিন্তু জোর করেন না তো। কৃপা যে তিনি কী ভাবে করেছিলেন তাও তোমার অজানা ছিল না, তুমি যে শুধু শান্তি পেয়েছিলে তাই নয়, বারবার বেঁচে গেছ তাঁর কৃপার দরুনই—আর কী ভাবে—তুমি ভালো ক'রেই জানতে। কিন্তু কৃপা পাওয়ার দায়িত্ব আছে—যে-কথা আমি তোমাকে ভালো ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম: বলেছিলাম—কৃপা যে পেয়েছে তাকে সব আগে ছাড়তে হয় মিথ্যার সঙ্গে মিতালি। কিন্তু তুমি ছাড়তে চাইলে কই?—তাঁর কৃপা পেতে না-পেতে ভাবলে যে, তাকে ফিরে পাবে ঐ কৃপারি জোরে। এরি নাম ভাবের ঘরে চুরি। একথা তুমি প্রথম

দিকে খানিকটা বুঝেও ছিলে। কিন্তু আমার মধ্যে কয়েকটি বিভূতি দেখে তুমি শেষটায় আমাকেই হাত করতে চাইলে শুধু তোমার রূপের মোহে ফেলতে চেয়েই নয়, টাকার লোভ দেখাতেও তোমার বাধল না। বললে—আমার জন্যে একটা মস্ত আশ্রম ক'রে দেবে। কিন্তু আমি কি মস্ত আশ্রম চাই, না জাঁদরেল শিষ্য-শিষ্যা চাই? আমি চাই শুধু ঠাকুরের কৃপা আর তাঁর সেবার অধিকার। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন তোমার মতিগতি ফেরাবার চেষ্টা করতে; তাই আমি সব জেনেও এতদিন তোমাকে সয়েছি। কিন্তু আর না। এখনো তুমি এ-পবিত্র আশ্রমে বাস করবার যোগ্য হওনি। ঠাকুর বহু অপরাধই ক্ষমা করেন, কিন্তু সাধুকে যে প্রলুব্ধ করতে এগোয়, তাকে ভুগতেই হবে তার কর্মফল। তুমি যাও এখান থেকে, আর এসো না। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, বলল: গুরুজি, আর এমন হবে না—শুধু এইবারটি ক্ষমা করুন। গুরুজি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: না, এ-যাত্রা তোমাকে যেতেই হবে। তোমার এখনো সময় হয়নি। তবে ঠাকুরের কৃপার অবধি নেই—যদি এ অনুতাপকে অন্তত ছমাস মনে-প্রাণে লালন করতে পারো, তবে তার আগুনে তোমার অশুদ্ধ মন খানিকটা শুদ্ধ হবে। তখন এসো তুমি ফিরে—ঠাকুর আর একবার তোমাকে সুযোগ দেবেন নিজেকে বদলাতে।"

অসিত বলল: "সাধুজির বিভূতি তথা চরিত্র সম্বন্ধে এই হ'ল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা—বা বলতে পারো experience at one remove, কিছুদিন পরে ওঁর আর যে-শিষ্যটি সঙ্গে থাকত হরদয়াল—তার মুখে শুনলাম আর একটি কাহিনী—বলবার ম'ত।

"হরদয়াল বলল: 'সে আজ চার পাঁচ বৎসর আগেকার কথা। আমি তখন সবে গুরুজির কাছে দীক্ষা নিয়েছি। গুরুজি সে-সময়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে বেরুতেন পরিব্রাজক হ'য়ে তীর্থ দর্শনে। একদা কাশী ও প্রয়াগ ঘুরে আমরা বিন্ধ্যাচলে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে পথ হারিয়ে ফেললাম। গুরুজি হেসে বললেন: ভয় কি? ঠাকুর আছেন মাথার উপরে। সারাদিন পথ চ'লে আমি অবসন্ন, তার উপর সাত আট ঘণ্টা কিছু খাইনি। বললাম অনুযোগের সুরে: আপনার আর কী বলুন গুরুজি, যাঁর না আছে খিদে, না তেষ্টা। কিন্তু মাঝ থেকে বেচারি আমরা যে যাই মারা! এখন এ নৈমিষারণ্যে রাত কাটাই-ই বা কোথায়, আর খাই-ই বা কী? গুরুজি প্রশান্ত

হেসে বললেন: এখন দোষ দিচ্ছ আমার? তুমি না বলেছিলে পথ জানো? কিন্তু সে যাক্, খাবার জুটবেই জুটবে, ভেবো না। আমি বললাম: জুটবে কেমন ক'রে শুনি? এখানে জনমনিষ্যির চিহ্নও নেই যে! গুরুজি বললেন: ঠাকুরের উপর একবার ছেড়ে দিলেই বা বন্ধু! একমনে তাঁর নাম করো দেখি। আমি করুণ হেসে বললাম: যেন এখন তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গতি আছে। ভালো মরি মরব—আপনারি তো পায়ে। করি নাম—যা থাকে কপালে। ব'লে একটু খোলা মতন উঁচু ভূমিতে কম্বল বিছিয়ে গুরুজিকে বসিয়ে আকুল হ'য়ে সবে নামজপ শুরু করেছি—এমন সময়ে আমার হাঁটু বেয়ে একটা সাপ সড়সড় ক'রে চ'লে গেল। বাবা গো, ব'লে লাফিয়ে উঠেই দেখি সাপটা গুরুজির হাঁটু বেয়ে উঠছে। আমি আপ্রাণ চিৎকার ক'রে গুরুজির পিছন দিক দিয়ে তাঁকে ঠেলতেই তিনি চোখ মেললেন। ভাবাবেশে বললেন: কে? আমি বললাম: গুরুজি! সাপ! সাপ! গোখরো সাপ! চাঁদের আলোয় তার ফণার উপরে চক্র পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কী উপায়! ওকে মারতে গেলেও বিপদ, হয়ত আপনার উরুতে ছোবল মারবে! গুরুজি হেসে সাপটির দিকে তাকিয়ে বললেন ভাবাবেশেই: বা ঠাকুর, বাঃ! ব'লেই তার ফণায় হাত বুলানো শুরু করলেন। আমার বুকের রক্ত জল হ'য়ে গেল—কেন না দেখলাম সাপ ফণা তুলল। অমনি গান ধরলেন: জো কুছ হ্যায় সব তুহী হ্যায়, আর সাপ সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল—যেন তালে তালে। খানিক বাদে গানও শেষ হওয়া আর সাপেরো সুড়সুড় ক'রে প্রস্থান! আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—সত্যি দেখলাম—না স্বপ্ন !!

'গুরুজি আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন: না হরদয়াল! না এ স্বপ্ন, না আমি সাপুড়ে! তবে কি জানো? তোমরা হ'লে বিলেতের পাশ করা ডাক্তার বাবা, নেটিভ যোগের কথায় হাসবে! কিন্তু এক ভরসা এই যে, অনেক কিছুই ইতিমধ্যেই চাক্ষুষ করেছ যা তোমাদের সায়েন্স বুঝবার কিনারায়ও আসেনি—আসতে পারে না—কেন না তার কারবার ইন্দ্রিয়বোধ ও বুদ্ধিকে নিয়ে—যেখানে যোগের কারবার এমন সব অতীন্দ্রিয় শক্তিকে নিয়ে—যাদের মন দিয়ে বোঝা অসম্ভব। এদের মধ্যে একটি হ'ল এই যে, যিনি হিংসা সম্পূর্ণ জয় করেছেন—মানে, হিংসার কথা যিনি ভাবতে পর্যন্ত পারেন না—তাঁকে মানুষ ছাড়া কোনো জীব হিংসা করতে পারে না। কিম্বা ধরো, যদি তোমাকে বলি যে, আমি দেখতে পেয়েছি—একটু বাদেই তুমি ঠাকুরকে গালমন্দ করা ছেড়ে স্তবস্তুতি করবে টাটকা খাবার পেয়ে—পারবে কি তুমি বিশ্বাস করতে?

'আমি সাপ বাঘ সায়েন্স সব ভুলে গেলাম মুহূর্তে—জঠরের হাহাকারে। সাগ্রহে বললাম: টাটকা খাবার? কখন আসবে গুরুজি? আর আনবেনই বা কিনি? গুরুদেব হেসে বললেন: যিনি সাপ হ'য়ে ভয় দেখান তিনিই কৃষাণ হ'য়ে অতিথিসৎকার করেন, তবে এই শর্তে যে, তুমি একটু বিশ্বাস করবার অন্তত চেষ্টা করবে যে, যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য কীট পক্ষী পশু পতঙ্গের আহার যোগাচ্ছেন, তিনি ইচ্ছে করলে তোমার আমার মতন তুটো নগণ্যের জন্যে তুমুঠো অন্নের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

'আমি লজ্জিত হ'য়ে ফের ধ্যানে বসলাম। একটু পরে গুরুজি হেসে বললেন: কার ধ্যানে হঠাৎ এমন ছটফটানি শুরু হ'ল, বন্ধু? যিনি অখণ্ড-মণ্ডলাকার চরাচরে ব্যাপ্ত হ'য়ে দেখা দেন, না যিনি বৃত্তাকার আটার রুটি হ'য়ে আসেন অরণ্যেরো অন্তঃপুরে?

'আমি চোখ চেয়ে হেসে ফেললাম! গুরুদেবেরও সে কী খিলখিল ক'রে হাসি—ঠিক যেন একটি পাঁচ বছরের শিশু। এমন সময়ে হঠাৎ দেখি একটি পথিক। সে আমাদের দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। তার কাঁধে ছিল কাঠের বোঝা, নামিয়ে গুরুদেবকে দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বলল: মহারাজ, যদি দয়া ক'রে আমার কুঁড়েঘরে একবার পায়ের ধুলো দেন তবে কৃতার্থ হব। গুরুজি হাসিমুখে আড়-চোখে আমার দিকে কটাক্ষ ক'রেই উঠলেন। আমিও উঠলাম মহানন্দে তল্পিতল্পা নিয়ে!

'পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটির। সামনে একটা ছোট্ট প্রাঙ্গণ। সেখানে আমাদের জন্যে একটি চাটাই বিছিয়ে দিয়ে কাঠুরে বলল: একটু বসুন সাধুজি। খানিক বাদে তার স্ত্রীর সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে তুটি শালপাতায় গরম গরম রুটি আর মাটির পাত্রে ডাল শাক তুধ আর গুড় এনে আমাদের সামনে রাখল। তারপর আর কী বলব বাবুজি! শুধু বলি—মনে হ'ল যেন আমি দেবরাজ আর সেবন করছি সাক্ষাৎ সাগরসেঁচা অমৃত।

'খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে কাঠুরে আমাদের চাটাইয়ের উপর একটি কম্বল বিছিয়ে হাতজোড় ক'রে বলল: এবার শুয়ে পড়ুন মহারাজ।

'নীল আকাশে চাঁদ হাসছে। ঝিরঝির ক'রে বসন্তের হাওয়ায় বনের পাতারা হাততালি দিচ্ছে। আমি শুতে না শুতে নিঃসাড়। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি—গুরুজি ব'সে—সমাধিস্থ। ফের ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর রাতে উঠে দেখি গুরুদেব তখনো সমান ব'সে—তবে ধ্যানে নয়, চোখ চেয়ে জপ

করছেন, ঠোঁট নড়ছে। আমি উঠে বসতেই হেসে বললেন: কী হরদয়াল? ফের খিদে পেল নাকি? আমি তাঁকে প্রণাম ক'রে বললাম হেসে: আর কত লজ্জা দেবেন, গুরুজি?

অসিত বলল: "এ-দুটি গল্পই একদিন সতী ও রহমতের কাছে ফলাও ক'রে বললাম। সতী মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল সাধুজির উদ্দেশে। কিন্তু হঠাৎ রহমতের চোখ চিকচিক ক'রে উঠল, আমার গল্প শেষ হ'তেই আমার কাছে হাতজোড় ক'রে বলল: 'বাবাজি, সবাইকারই জুটল রুটি, শুধু আমিই থাকব ভুখা? গুরুজিকে বলুন আমাকেও চেলা ক'রে নিতে। আর কিছু না পারি হরদয়াল ভাইয়ের মতন তাঁর তল্পি তো বইতে পারব।' সতী বলল: 'তুমি নিজেই বলো না রহমৎ।' সে বলল: 'আমার সাহস হয় না মা! আমার মতন গুণ্ডাকে—' আমি বললাম: 'এতশত দেখে শুনেও ফের এই কথা? চলো এখনি। তোমাকে বলতেই হবে তাঁকে নিজে।'

"ওকে নিয়ে আনন্দগিরির কাছে পৌঁছতেই তিনি বললেন: 'কী রহমৎ? পালোয়ানেরো ভয়? —এসো বোসো।' ব'লেই সে কিছু বলবার আগেই তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে একটি মন্ত্র বললেন মৃদু স্বরে। ও আশ্চর্য হ'য়ে বলল: 'আল্লার নাম?' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'যে-নামেই তাঁকে ডাকো ভাই সাড়া দিতে একজনই। তোমার যে সংস্কার তাতে তোমার পক্ষে আল্লা-মন্ত্রই ভালো। কেবল এটুকু ভুলো না যে, রাম রহিমে ভেদ নেই—কেমন?'

"সেদিন থেকে ওর মধ্যে এক আশ্চর্য পরিবর্তন সবারই চোখে পড়ল। ওর কণ্ঠে বেজে উঠল এক নব সুর, মুখের বিষাদ গেল কেটে। প্রায়ই দেখতাম ওর ঘরের দোর বন্ধ—বাইরে থেকে পেতাম ধূপের গন্ধ! একদিন ওর ঘরের দোর খোলা দেখে অন্যমনস্ক হ'য়ে ভিতরে ঢুকেই দেখি কি, ও কৃষ্ণের এক ছবি সামনে রেখে জপ করছে 'আল্লা আল্লা' আর অঝোরে চোখের জল পড়ছে ওর কোলে, গাল বেয়ে।.

অসিত বলল: "বলতে ভুল হ'য়ে গেছে—রহমৎ ও আমি থাকতাম সতীর বাড়িতেই—যে-বাড়িটি সে এসেই কিনে নিয়েছিল। বাড়িটি আনন্দগিরির কুটিরের পাশেই—মাঝে আধ বিঘে জমি। সেখানে পরে সতী একটি চমৎকার ফুলের বাগান করেছিল—বাড়িটি বাগান থেকে একটু উঁচু জমিতে। উপরের

তলায় তিনটি ঘরের একটিতে আমি ছিলাম ওর অতিথি হ'য়ে। আর দু'টির একটি ওর শোবার ঘর, অন্যটি পূজার। নিচের তলায় একটি ঘরে থাকত রহমৎ, অন্যটিতে আমরা খাওয়া-দাওয়া করতাম। আর একটি ঘর ছিল খালি। আমি এই ঘরটিতেই থাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সতী কিছুতেই রাজি হ'ল না। বলল: 'মামাবাবু! তুমি থাকবে নিচের তলায়, আর আমি উপরে? আমাকে তুমি ভাবো কী শুনি?' এই ঘরটি ও খাটবিছানা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল যদি কখনো কেউ অতিথি আসে থাকবে। মাঝে মাঝে এক আধজন এসে দু'চারদিন থাকতও ওর আতিথ্যে।

"একদিন নিচের তলায় খাবার ঘরে সকালবেলা আমরা তিনজনে চা খাচ্ছি. এমন সময় রহমৎ বলল: বাবুজি, গুরুজি ঠিকই নাম দিয়েছেন: মা আমার সত্যিই মা লক্ষ্মী। নৈলে কি আমার মতন পাপীও এমন শান্তি পায়?' হঠাৎ সতীর মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসি, সে বলল: 'তুমি শান্তি আমার প্রসাদে পাওনি রহমৎ, পেয়েছ স্বভাবগুণে। আমার আনন্দ উচ্ছ্বাস শান্তি সব নিভে গেছে। সংসারে যখন ছিলাম মনে হ'ত কবে অসংসারী হব, কিন্তু এমনিই আমার অবাধ্য মন যে ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনতে না-শুনতে যে সংসার ছেড়ে এসেছি তার জন্যে মন কেমন করে—বিশেষ ক'রে আমার ছেলে রজতের জন্যে!' রহমতের মুখে মেঘ ছেয়ে এল, বলল: 'তবে তাকে একবার আনিয়ে নাও না কেন, মা?' সতী ম্লান হেসে বলল: 'যে-মায়া কাটাতেই হবে তাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কী রহমৎ? মনে নেই সেই সিনেমার মেয়েটির কথা?' আমি টুকলাম: 'সে-মেয়েটি আর তুমি, সতী! পাগল!' সতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: 'কেউ কি জানে মামাবাবু, সে নিজে কী—আর কিসে কী হয়? দু'দিন আগেও কি আমি বড় গলা ক'রে বলিনি যে সংসার আমার জন্যে নয়?' আমি ফের টুকলাম: 'কিন্তু এ তো ঠিক সংসার নয়, সতী!' সতী বলল: 'তুমি তো মা হওনি মামাবাবু, তাই জানো না—কেমন ক'রে মা'র সংসারের কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায় একটি ছোট্ট শিশু। না, এ-মায়া আমাকে কাটাতেই হবে—প্রার্থনা করছি তো দিনরাতই—কিন্তু এক এক সময়ে নিজেকে এমন দুর্বল মনে হয় যে ভাবি—' আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'যখন গুরুকরণ করেছ তখন সাতপাঁচ না ভেবে তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রেই দেখ না কেন?' সতী মুখ নিচু ক'রে একটু ভাবল, তারপর চোখ মুছে বলল: 'আচ্ছা। গুরুদেবের কাছে লজ্জা কি? এ-ও তো অভিমানেরই একটি রূপ।'

"চা খাওয়া শেষ হ'লে আমরা আনন্দগিরির কুটিরে গিয়ে রোজকার ম'ত

তাঁর সঙ্গে ধ্যানে বসলাম—তাঁর আর দুই শিষ্য আর আমরা তিনজন। আমি মনে একটু একটু ক'রে শান্তি পাচ্ছিলাম কদিন থেকে, কিন্তু সেদিন শান্তি এল না কিছুতেই—কেবলই মনে হ'তে থাকে সতীর বিষাদের কথা। এমন সময়ে চাপা কান্নার শব্দে চোখ চেয়ে দেখি কি, সতী সাধুজির পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর তিনি চুপ ক'রে ওর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। একটু পরে তিনি বললেন: 'এবার মুখ তোলো মা, নির্ভয়ে বলো—কী বলতে চাও।' সতী মাথা তুলে চোখ মুছে বলল: 'না, থাক্ গুরুদেব।' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'আমাকে যে ঠাকুর একটা শক্তি দিয়েছেন মা যার আলোয় আমি দেখতে পাই কে কী ভাবছে। তাই তুমি মুখ ফুটে কিছু না বললেও আমি জানি কী বলতে এসেছিলে আর কেন তোমার বলতে বাধছে।' ব'লে একটু থেমে: 'তা তোমার ছেলেকে একবার আনিয়ে নিলেই বা কিছুদিনের জন্যে। তোমার স্বামী ভালো লোক—কখনই অমত করবেন না।' সতী অবাক্ হ'য়ে তাঁর দিকে তাকালো: 'আপনি কী বলছেন, গুরুদেব? সেই সিনেমার মেয়েটিকে বললেন আসক্তির কথা মনে ভাবাও পাপ আর আমার বেলা—' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'মা, ঠাকুর যাকে সত্যিই গুরুগিরি করতে হুকুম দেন তাকে হুকুমবরদারি করবার কিছুটা শক্তিও দেন বৈকি—নৈলে সে পেরে উঠবে কেন বলো? এর একটি তোমরা টের পেয়েছ—যে আমি মনের কথা জানতে পারি: কিন্তু আর একটি শক্তি তিনি দেন যা অপরে ঠিক এত সহজে জানতে পারে না। সে হ'ল কার স্বভাব কেমন—পরিষ্কার দেখতে পাওয়া। এই শক্তির জোরেই আমি দেখতে পাই মা—কার অধিকার কেমনতর। তাই তুমি অকুণ্ঠে বিশ্বাস করতে পারো যদি আমি বলি যে, রজত তোমার সাধনার পথে বাধা হবে না, বরং সহায়ই হবে। কেন জানো? কারণ ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সে মস্ত আধার—যাকে গীতা বলেছে শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্ট জাতক। এই জাতের সাধককেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন নিত্যসিদ্ধ। এমন যে-শিশু তার প্রতি টানকে পিছুটান বলা চলে না এইজন্যে যে, এ-জাতের স্নেহ পিছন দিকে টানে না—সামনের দিকেই ঠেলে।' ব'লে একটু থেমে: 'সদ্গুরুর মুখে এই ধরনের উল্টোপাল্টা কথা শুনেই বুদ্ধিমন্তরা অনেক সময়ে বাঁকা হাসেন, কারণ তাঁরা তো দেখতে পান না যা সদ্গুরুর চোখে পড়ে। আমাদের তন্ত্রেও এই গভীর সত্যটির ইঙ্গিত মেলে: যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা। মানে, যে-সব জিনিস মানুষকে টেনে নামিয়ে আনে, সুপ্রয়োগ জানলে তারাই আবার ধাপে ধাপে উঠিয়ে দেয় সিদ্ধির শিখরে।

এ কথার কথা নয় মা, তবে কি না সবাই সব পারে না। অধিকারীর পক্ষে যা অতি সুসাধ্য—অনধিকারীর পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। যোগে তুমি স্বাধিকার নিয়েই জন্মেছ—রজতের ম'তই।' ব'লে একটু থেমে: 'আমি বলছি না অবশ্য যে, রজতের প্রতি তোমার মমতা পুরোপুরি অনাসক্ত করুণা। না, এখনো তোমার এ বোধ রয়েছে যে সে তোমারি ছেলে, তুমি তার জন্যে দায়িক। তাই তো তুমি আশ্রয় পেয়েও শান্তি পাচ্ছ না। কিন্তু মা, মায়ামুগ্ধ জীব ঠাকুরকে যতটা নিষ্ঠুর ভাবে, তিনি ঠিক ততটা নিষ্ঠুর নন। যেখানে রাশ ছেড়ে দিলে ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে না, সেখানে তিনি রাশ কষেন না। তাই তোমাকে বলছি—তুমি নির্ভয়ে তোমার ছেলেকে আনিয়ে নিয়ে যতদিন ইচ্ছে তোমার কাছে রাখতে পারো। যেমন মাঝে মাঝে তোমার শুচি স্নেহের স্পর্শ পেলে ওর অকল্যাণ হবে না, তেমনি ওর বিকাশের সহায় হবার দরুন তোমার সাধনারও প্রত্যবায় আসবে না।'

"সতীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। ও অরুণকে সব কথা গুছিয়ে লিখে দিল। উত্তরে অরুণ লিখল: 'আমার এখন ছুটি পাওয়া মুস্কিল—হাতে বিস্তর কাজ—তবে যদি তোমার মামাবাবু বা আর কেউ আসেন, তবে তাঁর সঙ্গে আমি রজতকে পাঠাতে পারি কয়েক মাসের জন্যে। রজতের সম্প্রতি একটু অসুখ করেছিল—তাই চেঞ্জে গেলে হয়ত ওর ভালোই হবে। সঙ্গে ওর ধাত্রী যাবে অবশ্য।"

অসিত বলল: "আমি পরদিনই রওনা হ'লাম শিলং। অরুণ তার সুন্দর বাংলোর একটি চমৎকার ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা ক'রে বলল: 'মামাবাবু, যখন দয়া ক'রে এসেছেন এতদূর—দু'চারদিন কাটিয়ে যেতেই হবে।' আমি ওর আন্তরিক স্নেহের সুরে স্পৃষ্ট হ'য়ে বললাম: 'ভাই, আমি ভবঘুরে মানুষ, জানোই তো, একটি গানে আমি আঁখর দিয়ে থাকি—যার নেই ঘর তার নেই পর! পাঁচ ছমাস ধ'রে সতীর অন্নধ্বংস করেছি, অতঃপর সতীর পতির অন্নধ্বংস করব পাঁচ ছ দিন—এ আর বেশি কথা কী?' ব'লেই ভুল বুঝলাম—কিন্তু দেরিতে। দেখি—ওর সুশ্রী মুখ বিষাদে ছেয়ে গেছে, চোখ দুটি চিকিয়ে উঠল। কিন্তু ও নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত সুরেই বলল—যদিও ওর স্বর একটু কেঁপে উঠল: 'পতি কথাটা ঠাট্টার মতন শোনালো মামাবাবু'—ব'লে জোর ক'রে হেসে: 'বরং বলুন ভূতপূর্ব পতি—যদিও ম'রে ভূত হ'তে এখনো হয়ত কিছু দেরি আছে।' আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে চুপ ক'রে রইলাম, কী বলবই বা? একটু পরে ও বলল: 'কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না মামাবাবু। আমার

এ-জন্যে দুঃখ থাকলেও ক্ষোভকে হয়ত খানিকটা কাটিয়ে উঠেছি। কেন না বৈরাগ্য কী বস্তু আমি নিজে না জানলেও আমার একটি প্রিয়বন্ধু কয়েক বৎসর আগে সন্ন্যাস নেয়। তাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। তাই জানি— কারণ সে আমাকে প্রায়ই বলত তার মনের কথা—যে, সংসারে যার একবার বিতৃষ্ণা আসে সে আর কিছুতেই ঘরে টি'কতে পারে না। সতী আমাকে বিবাহের আগে সব কথাই খোলাখুলি বলেছিল। তবু আমি ওকে বিবাহ করেছিলাম শুধু না ক'রে পারিনি ব'লে নয়, আমার মনে একটা দুরাশা ছিল যে ও একবার যখন আমাকে ভালোবাসতে পেরেছে, তখন হয়ত সেই ভালোবাসাই ওর মনের মোড় ফিরিয়ে দেবে।'

"তারপর একটু একটু ক'রে ওর কাছে শুনলাম অনেক কথাই যা সতী আমাকে বলতে পারেনি মেয়েলি সঙ্কোচের দরুন। কথাটা এই যে, সতী সত্যিই জানত না বিবাহ মানে কী। হাভেলক এলিসের বইয়ে আমি পড়েছিলাম যে, মেয়েদের মধ্যে তিনরকম প্রকৃতি থাকে: কেউ চায় দেহের সুখ কিন্তু সন্তান নয়, কেউ বা সন্তান চায় কিন্তু দেহের সুখ নয়, আবার এমনও হয় যারা না চায় স্বামী, না সন্তান। কিন্তু সতী এ তিনের কোনো দলেরি ছিল না। কারণ সে স্বভাবে অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিল তাই সত্যিই ভালোবেসেছিল স্বামীকে, পরে ওর শিশু রজতকেও। কিন্তু স্বামিসহবাস বলতে যা বোঝায় তাতে ও আর রাজি হয়নি রজত জন্মানোর পর থেকে। অরুণ এতে দুঃখ পেত খুবই, কিন্তু সে ছিল সত্যিই সুকুমার, সুভদ্র, তাই মা হবার পর যখন সতী বলল অরুণের সঙ্গে আর একঘরে শোবে না, তখন অরুণ মনে খুব বড় রকমের ঘা খাওয়া সত্ত্বেও জোর জুলুম করেনি, আর করেনি ব'লেই সতী আরো চারটি বৎসর স্বামীর ঘরকন্না করতে রাজি হয়েছিল। অরুণ প্রথমে ভেবেছিল যে, সে হয়ত স্বামী হিসাবে সতীর মন টানেনি! ক্রমশ সে লক্ষ্য করল একটা আশ্চর্য জিনিস: যে, ওর রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে অনেক পুরুষ-পতঙ্গ ওর দিকে উড়ে আসতে চাইলেও ও কাউকেই কাছে ঘেঁষতে দেয় না—তারা দূরে থেকেই ছটফট করে কিন্তু কারুর গায়েই ওর রূপানলের আঁচটি পর্যন্ত লাগতে পারে না। অরুণ ভালো ভালো ডাক্তারের, ধাত্রীর মত নিয়েছিল কিন্তু তারা মাথা নেড়ে বলেছিল—এ হ'ল যাকে বিলিতি ভাষায় বলে abnormal psychology—যে-ধরনের মন একবার গ'ড়ে উঠলে বদলানো দুর্ঘট। আমি এসব শুনে একটু আশ্চর্য হয়েছিলাম আরো এইজন্যে যে, অরুণ কিছুতেই কল্পনা করতে পারত না যে, কোনো ছেলে বা মেয়ে নিছক ভগবানের টানে এ-রকম বেঁকে বসতে পারে—মানে, সায়েন্সের

ভাষায়, abnormal হ'তে পারে। তবে মনে হ'ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা : একথা আজকালকার বাবুরা কেমন ক'রে মানবেন গো, এ যে ওঁদের সাহেব পুরাণে লেখেনি। ব'লে ঠাকুর একটি উপমা দিয়েছিলেন : একজন লোক এসে বলল : 'পথ দিয়ে আসতে আসতে আমার সামনেই একটা বাড়ি হুড়মুড় ক'রে পড়ে গেল!' শ্রোতা বুদ্ধিমন্তটি বললে : 'দাঁড়াও তো'—ব'লেই খবরের কাগজের পাতাগুলি উল্টে বললে : 'তোমার কথা কী ক'রে নিই—যখন খবরের কাগজে নেই?' সে বলল অবাক্ হ'য়ে : 'সে কি? আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলাম—' বাবুটি বাধা দিয়ে বললেন : 'তা হোক, খবরের কাগজে যখন লেখেনি তখন তোমার একথা নেওয়া চলে না'।"

বার্বারা হেসে হাততালি দিয়ে বলল : "কী চমৎকার!"

অসিতও হাসল। পরে বলল : "আমি এ নিয়ে অরুণের সঙ্গে তর্কাতর্কি করিনি, কারণ আমি জানতাম সতীর ভিতরের প্রকৃতিটি ও বুঝতে চেষ্টা করত আর পাঁচটা মেয়েপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে। তাছাড়া এ-ও আমি জানতাম যে, বৈরাগ্য সম্বন্ধে যার কোনো অভিজ্ঞতাই কখনো হয়নি, তাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো যায় না—কেন বৈরাগ্যের ফলে প্রবৃত্তিরও মোড় ঘুরে যায়। তাই যতটা পারি সতীর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রজতের সম্বন্ধেই আলোচনা করতাম!

"রজত তখন পাঁচ বছরের ফুটফুটে ছেলে। অরুণের ছিল যেন রজত-অন্ত প্রাণ। তবে শুধু অরুণই বা বলি কেন, রজতকে যে দেখত সে-ই ভালোবেসে ফেলত। দুদিনেই ও আমার মন কেড়ে নিল। যেমন ফুলের মতন নির্মল, তেমনি সুন্দর, সরল, স্নেহপ্রবণ। অরুণ মাঝে মাঝেই দুঃখ করত যে, এমন ছেলে মাতৃস্নেহ কাকে বলে জানল না। আমি প্রথমে কিছু বলিনি, কিন্তু শেষে না ব'লে পারলাম না যে, সতীর কাছে রজতকে মাঝে মাঝে পাঠালে মাতৃস্নেহের স্বাদ সে পাবে না-ই বা কেন? উত্তরে অরুণ বলল দৃঢ়স্বরে : 'না, মাঝে মাঝেই পাঠাব না। কারণ আমি চাই না রজতের মনেও ওর মার বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লাগে। ওকে মানুষ হ'তে হ'বে।' আমি শুনে একটু বিরক্ত হলাম, বললাম : 'অরুণ, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কারণ বৈরাগ্য বলতে কী বোঝায় তুমি আদৌ জানো না। কেবল একটি কথা না ব'লেই পারছি না : হিন্দুর ঘরে জন্মিয়েও যে তুমি সাধু মহাপুরুষদের মানুষ ব'লেই গণ্য করো না, এতে একটু আশ্চর্য লাগে বৈকি। কারণ তোমার চেয়েও বুদ্ধিমান ও বিদ্বান অনেকেই সাধুসন্তদের কাছ থেকেই পেয়েছেন মানুষের মতন মানুষ হবার প্রেরণা।' ও কথাটা ব'লেই বোধহয় ভুল বুঝেছিল, আমার উষ্মা দেখে অনুতপ্ত

হ'য়ে বলল : 'আমার অন্যায়' হয়েছে মামাবাবু—আরো এই জন্যে যে, আপনার মনে আমি আঘাত দিয়েছি। তবে আমার তরফের কথাটাও আপনি একটু শান্তমনে বিচার ক'রে দেখবেন। কারণ রজতকে যদি মাঝে মাঝে হরিদ্বারে পাঠাই তা'হলেও ও মাতৃস্নেহ বলতে আমরা সংসারীরা যা বুঝি তার স্বাদ তো পেতে পারে না।' আমি বললাম ঠাণ্ডা হ'য়ে : 'অরুণ, তোমার খেদ আমি বুঝি। কিন্তু সতীর দুঃখও তুমি একটু বুঝলে ভালো হ'ত। শুধু নিজের দুঃখটাকেই যে বড়ো ক'রে দেখে সে প্রায়ই ভুলে যায় একটি কথা, যে পায় বেশি সে-ই যে দেয় বেশি—তা কী সংসারী কী বৈরাগী।'

"পরদিন ও আমার কাছে এসেই হঠাৎ কেঁদে ফেলল। আমি ব্যস্ত হ'য়ে ওকে আলিঙ্গন ক'রে পাশে বসলাম। সত্যি ওর শূন্যতার কথা ভেবে মনটা ব্যথিয়ে উঠল আমার। বললাম : 'দেখ অরুণ, কালকে আমার কথাটা একটু রূঢ় হ'য়ে গেছে—তুমি মন থেকে মুছে ফেলে দাও, লক্ষ্মীটি!' ও গাঢ়কণ্ঠে বলল : 'না মামাবাবু! আমি সত্যিই কেমন যেন দুঃখবিলাসী হ'য়ে পড়ছিলাম, আপনি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়ে ভালোই করেছেন। তবে কি জানেন? আমি পনের বছর বয়সেই বিলেত যাই ও আট বৎসর ওদেশে কাটিয়ে খানিকটা সাহেবি মেজাজ নিয়েই দেশে ফিরি। কাজেই আমি আমাদের দেশের ভাবধারার চেয়ে বেশি খবর রাখি পাশ্চাত্য ভাবধারার। সে যাই হোক্, কাল রাতে ভেবেচিন্তে ঠিক করেছি যে, রজতকে খানিকটা ছেড়ে দেব—মাঝে মাঝে পাঠাব সতীর কাছে। আর একটা কথা আমার মনে উঠেছে—আমিও একবার হরিদ্বারে গেলে কেমন হয়?' আমি একটু ইতস্তত ক'রে বললাম : 'তাহলে তোমাকে একটু খোলাখুলিই বলি। সতী আছে তার গুরুর কাছে—তাঁর আশ্রমে। তাই আমি এবিষয়ে কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছি না—কেন না সতীর শরণ্য হলেন তার গুরু আনন্দগিরি। তিনি মস্ত যোগী ও মহাপুরুষ, এতে ভুল নেই। যোগীদের ভাবধারা যে সব সময়ে সংসারীর ভাবধারার সঙ্গে মেলে না—এ তুমিও জানো হাড়ে হাড়েই। কাজেই এ ক্ষেত্রে আনন্দগিরিকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহস পাচ্ছি না।' ওর মুখ মেঘে ছেয়ে গেল, বলল : 'আচ্ছা, তা'হলে তাঁকে লিখেই দেখুন—কী বলেন তিনি।' আমি সতীকে সব কথা জানিয়ে লিখলাম। উত্তরে সে তার করল যে গুরুদেব বলেছেন এখনো অরুণের সময় হয়নি, তবে একবৎসর বাদে যদি চায় তবে একবার আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে পারে।

"টেলিগ্রাফ প'ড়ে ও খানিক গুম্ হ'য়ে রইল, পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল :

'ভালোই হ'ল! আমার নিজের মন এখন বড় অশান্ত—গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তিই হ'ত। তাছাড়া আমার মা, বোন ও ভগ্নিপতির কোনো খবরই পাইনি—হয়ত একবার রাওলপিণ্ডি যেতে হ'তে পারে। কে জানে মামাবাবু, তাদের কী হয়েছে!' কী আর বলব এর জবাবে?—চুপ ক'রেই রইলাম।

"ওর মন খারাপ দেখে আরো দুদিন শিলঙে থেকে গেলাম। তিনদিনের দিন সতীর এক পোষ্টকার্ড: 'দশদিন হ'য়ে গেল যে মামাবাবু! কবে ফিরছ?' অরুণ আর পীড়াপীড়ি করল না। রজতকে আর আমাকে নিয়ে গৌহাটিতে এসে ট্রেনে চড়িয়ে দিল! অরুণ সতীকে লিখে দিল রজতের শরীর একটু সারলেই মাস তিন-চারের মধ্যে ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। ওর ধাত্রীকে আর নিতে হ'ল না, কেন-না এ-দশদিনে রজত আমার নেওটা হ'য়ে উঠেছিল! তাছাড়া মা-র কাছে যাবে শুনে ওর সে কী উৎসাহ!"

অসিত বলল: "হরিদ্বারে রজত রইল সতীর শোবার ঘরে। সতী ওর ধ্যানের ঘরকেই করল শোবার ঘর, আমি রইলাম আমার নিজের ঘরেই কায়েমি হ'য়ে—রজতের পাশে। এতে আমার একটু অসুবিধা হয়ত হ'ত যদি না রজতকে ভালোবেসে ফেলতাম। সুন্দর শিশুকে কার না ভালো লাগে? কিন্তু তবু অনেক শিশু আছে যারা দেখতে সুন্দর হ'লেও স্বভাবে এত অসুন্দর যে তাদের সান্নিধ্যে থাকা কঠিন হ'য়ে ওঠে। রজত সে-জাতের শিশু ছিল না—ওর মধ্যে কি-একটা অনির্দেশ্য চুম্বক ছিল যা সবারি মন টানত। ওকে দেখে আমার মনে প্রায়ই গুনগুনিয়ে উঠত দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অপরূপ কবিতা—শিশু সম্বন্ধে:

> আমরা পতিত—বিশুষ্ক নিরাশ অন্ধকারময় গভীর গর্তে,
> পরীপদক্ষেপে তুই চলে যাস কিরণময় এ-শ্যামল মর্তে,
> গান গেয়ে গেয়ে পাপিয়ার ম'ত নিশ্চিন্ত নির্ভয় নিরবরুদ্ধ
> নীলাম্বরে ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বে, রত, নিমগ্ন, বিমুগ্ধ. বিভোর, শুদ্ধ!

শুদ্ধ শুদ্ধ—এই কথাটিই বারবার আমার মনে হ'ত। নানা সংস্পর্শে বিজ্ঞ আমরা দিনে দিনে কত মালিন্যই না পুঁজি করি। শিশু-তাই তো এত আনন্দময় হ'য়ে ওঠে আমাদের আঁধার-ঘেরা জীবনে। তোমাদের খৃষ্টদেব যে শিশুদের কেন এত ভালোবাসতেন আমি যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম রজতকে ভালোবেসে।

"রজত আসার পর তাই সময়ের যেন আরো পাখা উঠল। আমি সতীর

সঙ্গে হরিদ্বারে এসেছিলাম মাসখানেক থাকব ভেবে। কিন্তু এ নিটোল বিশুদ্ধির পরিবেশে দু'মাস দেখতে দেখতে চারমাস. চারমাস হ'ল ছমাস—আটমাস···অন্য কোথাও যেতে আর মন চায় না। রোজ সকালে আনন্দগিরির সঙ্গে ধ্যান; সময়ে অসময়ে তাঁর সৎকথা শোনা; বিকেলে তাঁর উপনিষদ-গীতা-ভাগবত পাঠ; সন্ধ্যায় সতীর ঘরে নামকীর্তন; রজত, রহমৎ, হরদয়াল, প্রভুদয়াল, সতী—সবার সঙ্গে পুণ্যসলিলা গঙ্গায় অবগাহন—সব জড়িয়ে কেমন যেন একটা নেশার আবেশ আমাকে পেয়ে বসল—মনে হ'তে লাগল, বেশ আছি, ভাবনা কী?—বিশেষ যখন সতী ও রজত কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিতে চাইত না তখন যাবার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার হ'য়ে উঠত বৈকি।

"কিন্তু শুধু এইজন্যেই নয়, আমার মন কেমন শান্তিতে এলিয়ে পড়ছিল ক্রমশ—যে ধরনের শান্তির অনুভূতি এর আগে কোনোদিনো এভাবে স্থায়ী হয়নি। আমার মনের মধ্যে বরাবরই কেমন একটা ভয় মতন ছিল আশ্রম সম্বন্ধে। বিশেষ ক'রেই মনে হ'ত যোগাশ্রম শব্দটা যেন বড় বেশি গুরুগম্ভীর—যেখানে থাকবে না শিশুর হাসি, মেয়েদের সুষমা, বন্ধুর স্নেহস্পর্শ, ইচ্ছামতন চলাফেরা, যেখানে সবই হবে বাঁধাধরা, প্রতিপদে নিতে হবে গুরুর অনুমতি—সবার উপরে আশ্রমবাসীদের সঙ্কীর্ণতা। ভুমেল আশ্রমে যখন ছিলাম তখন বিশেষ ক'রেই বেজেছিল আমাকে শিষ্যদের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি! একদিন সেখানে একটি ভারি মজার ঘটনা ঘটে, মানে মজার—বাইরের লোকের পক্ষে—যাদের আশ্রমে থাকতে হয় তাদের পক্ষে নিশ্চয়ই সাংঘাতিক। হ'ল কি, একটি বাইরের সাধু এসেছিলেন ভুমেল আশ্রমে—স্বামী স্বয়মানন্দের শিষ্য হ'তে। মানুষটি সত্যি ভালো, তাছাড়া আমার মতনই স্বামী স্বয়মানন্দকে দেখে মুগ্ধ। আমার কাছে এসে প্রায়ই বলতেন বিস্ফারিত নেত্রে: 'কী জ্ঞান! কী প্রতিভা! কী পার্স-নালিটি! আর সবার উপর, কী উদার! শিষ্য হ'তে হয় তো এম্‌নি গুরুর!' আমি মনে মনে হেসে তাঁকে উদার গুরুর শিষ্যদের মতিগতির কথা কিছু বলতাম না। কিন্তু একটু একটু ক'রে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হওয়া শুরু হ'ল। একদিন বললেন: 'এখানে একদল লোক আছে অসিতবাবু, যারা শঙ্করাচার্যকে গালিগালাজ করে, ভাবতে পারেন! বলে কি, শঙ্করাচার্য সেকেলে, একদেশদর্শী, ভ্রান্ত মায়াবাদী, তাঁর মায়াবাদ চলবে না আমাদের মহান আশ্রমে—আমাদের গুরু হ'লেন সর্ব-ব্রহ্মবাদী। এই নিয়ে ক্রমশ তাদের সঙ্গে তাঁর বিতণ্ডা শুরু হ'ল। তিনি মাঝে মাঝেই আমার কাছে ছুটে আসতেন সান্ত্বনার্থী হ'য়ে। বলতেন: 'অসিতবাবু; বলবেন আমাকে এ কেমন ক'রে হয় যে, যে-আশ্রমের গুরু এমন আপূর্যমান

অতলপ্রতিষ্ঠ, সমুদ্রের মতনই উদার—তাঁর শিষ্যরা কেন হ'য়ে দাঁড়ায় তাঁর বাণীর জলন্ত প্রতিবাদ?' আমি নিজেও এসব ভেবে একটু একটু ক'রে অশান্ত হ'য়ে উঠেছিলাম বৈ কি—তবু তাঁকে শান্ত করতে চাইতাম এই ব'লে যে, স্বামী স্বরমানন্দের মহান্ চরিত্র-প্রভাবে ওরা ধীরে ধীরে নিশ্চয়ই এ সঙ্কীর্ণতা কাটিয়ে উঠবে। কিন্তু একদিন ফাটল বোমা—সাধুটি আমার কাছে এসে কেঁদে পড়লেন: 'অসিতবাবু, আজ চললাম, এখানে আর থাকা সম্ভব নয়!' আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন: 'আপনি জানেন আমি শঙ্করাচার্যকে ভক্তি করি ব'লেই এত দুঃখ পাই এখানে সাধকদের মুখে তাঁর নিন্দা শুনে। তবু আমি স্বামিজীর শিষ্য হ'তে চেয়েছিলাম শুধু এইজন্যে যে তিনি তো মহাপুরুষ। কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর চেলাদের অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি এমনিই ফেঁপে উঠেছে যে এখানে টিঁকে থাকা অসম্ভব।' আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে চেয়ে বললাম: 'স্বামিজি মহাপুরুষ, একথায় আপনার সঙ্গে আমিও একমত। তাই আমি বলি কি, আপনি তাঁর জন্যেই থাকুন না, তাঁর চেলাদের সঙ্গে না মিশলেই হ'ল।' তিনি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন: 'সে অসম্ভব। দু'চারদিনের জন্যে যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা পারেন স্বামীজির চেলাদের এড়িয়ে চলতে। কিন্তু এখানে তাঁর শিষ্য বসবাস করতে হ'লে গুরুভাইদের সঙ্গে উঠতে বসতে বাধলে আশ্রমজীবন খতিয়ে হ'য়ে দাঁড়াবে সংসারের চেয়েও দুঃসহ। বলতে লজ্জা করে ব'লেই বলতে চাইনি, তবে ব'লেই ফেলি। আজ সকালে কী হ'ল জানেন? স্বামীজির এক বলিষ্ঠ চেলার সঙ্গে আলোচনা করতে করতে আমি একটু উত্যক্ত হ'য়েই ব'লে ফেলেছিলাম যে, স্বামীজি মহাপুরুষ একথা আমি মানি, কিন্তু অবতার বা অভ্রান্ত. এ-রটনা আমার মন নেয় না। বলতে না বলতে—উঃ কী সাংঘাতিক গোঁড়ামি ভাবুন!—সে আমার গলা টিপে ধ'রে বলল: আস্পর্ধা! বল্ তিনি অভ্রান্ত অবতার, নৈলে তোরই একদিন কি আমারি একদিন! প্রাণের দায়ে বলতে হ'ল বৈ কি যে তিনি অবতার, নৈলে হয়ত আজ অপঘাতেই মরতে হ'ত।"

বার্বারা হেসে গড়িয়ে পড়ল: "কী কাণ্ড!" তপতী সে-হাসিতে যোগ দিল।

অসিত বলল: "আজ আমরা হাসছি এ-কথা শুনে। কিন্তু এ হাসবার নয়—কাঁদবারই কথা। কারণ স্বামীজির মতন মহাযোগীর শিষ্যরাও যদি এই রকম গোঁড়া অন্ধ হ'য়ে ওঠে তবে ভরসা ঠাঁই পাবে কোথায়?"

বার্বারা বলল: "আনন্দগিরিকে এ-প্রশ্ন করেননি?"

অসিত বলল: "করেছিলাম। তিনি বললেন: 'কি জানি বাবা। তবে

যেখানে বহু শিষ্যের জটলা সেখানে শিষ্যেরা কখনই গুরুর ঠিক ছোঁয়াচটি পায় না—তাই সেখানে সাধনার আবহ ঠিকম'ত গ'ড়ে উঠতে পারে না। মানুষ সর্বত্রই প্রকৃতিতে সঙ্কীর্ণ ও গতানুগতিক। এ-সব দোষ কাটে তখনই—যখন সদ্গুরু তাঁর অন্তরঙ্গতার সোনার আগুনে আমাদের শুদ্ধ করেন। কিন্তু যেখানে চার পাঁচশো শিষ্য, সেখানে গুরু যত বড় মহাপুরুষই হোন না কেন, শিষ্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'য়ে উঠতে পারেন না। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের তপোবনে তাই দেখবে কোনো গুরুই কয়েকটির বেশি শিষ্য নিতেন না—কেন-না শিষ্যের অত্যধিক ভিড় হ'লে একমুখী সাধনার হাজারো প্রতিকূলতা এসে জোটে। সেখানে দুচার জন শিষ্য হয়ত গুরুর অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারে, কিন্তু বাকি সবাই থেকে যায় বহিরঙ্গ,' ধামাধরা—কাজেই আশ্রম হ'য়ে দাঁড়ায় খানিকটা—কী বলব ?—ক্লাব, ক্লাব—ঐ কথাটিই খুঁজছিলাম। এ-হেন পরিবেশে ভাগবতী শক্তি কখনই অপ্রতিহত ভাবে কাজ করতে পারে না। এইজন্যেই আমি আশ্রমে বিশ্বাস করলেও আশ্রমের নামে বিরাট সঙ্ঘ বা পাঁচমিশেলি ক্লাবে বিশ্বাস করি না।'

"কথাটা আমার মনে লেগেছিল। ফলে তুমেলে গিয়ে স্বামীজির কাছে দীক্ষা নেবার তাগিদ আরো যেন নিভে গেল মনের মধ্যে। ভাবতাম—যদি স্বামীজির অন্তরঙ্গ হ'তে না পারি তবে কী-ই বা পাব গুরুগৃহবাসে ? শুধু তাই নয়, তুমেলে দেখেছিলাম স্বামীজির সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্য দেখা করতে হ'লেও পাঁচ সাতদিন অপেক্ষা করতে হ'ত। অন্যদিকে, আনন্দগিরির আশ্রমে সরল জীবনযাত্রা, গুরুর সঙ্গে শিষ্যশিষ্যাদের সহজ স্নেহসান্নিধ্যও চোখে পড়ত আর ভাবতাম তাঁর কাছেই দীক্ষা নিতে বাধা কী ? যত দিন যায় এ-ইচ্ছা বেড়েই উঠতে থাকে—আনন্দগিরির হাসি-ঠাট্টা, সরলতা, দীনতা, স্নিগ্ধতা ঔদার্য ক্রমশ আমাকে আবিষ্ট ক'রে তুলল। কিন্তু ঐ দেখ, আনন্দগিরির কথা বলতে গিয়ে আমার নিজের কথাই ব'লে চলেছি। তাঁর প্রসঙ্গেই ফিরে আসি।'

* * *

অসিত বলল : "আনন্দগিরির ছোট্ট আশ্রমটি শুধু-যে মাধুর্যেই মনোরম হ'য়ে উঠেছিল তাই নয়—তার প্রাকৃতিক পরিবেশও ছিল অপরূপ! ওদিকে হিমালয়ের বিশাল ধ্যানকান্তি, এদিকে নীলাঞ্চলা গঙ্গা অশ্রান্ত গান গেয়ে চলেছে। সতীর স্নেহ ভক্তি পবিত্রতা, হরদয়াল প্রভুদয়ালের গুরুভক্তি, রহমতের বলিষ্ঠ সরলতা—সব জড়িয়ে মনে হ'ত যেন আত্মীয়দের সঙ্গে এখানে আনন্দের বনভোজন করতেই আসা। রজত এসে পড়াতে ছবিটি যেন আরো নিটোল

হ'য়ে উঠল। শুধু সুন্দর শিশু ব'লেই নয়—তার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য কিছু ছিল যাকে জাদু নাম দিতেই ইচ্ছা হ'ত। কারণ শিশু হ'য়েও ও কেমন যেন একটা আশ্চর্য আলোর বাণী ব'য়ে আনত। কেবলই মনে হ'ত আনন্দগিরির কথা: এ-শিশু জন্মযোগী! ভাবতে সত্যি অবাক্ লাগত! একদিন আনন্দগিরি এ-সম্পর্কে একটি কথা বলেছিলেন: 'ঠাকুরের লীলা দুর্বোধ্য—এ-অপবাদ একেবারে অকারণে রটে নি বাবা। এই দেখ না কেন রজত আর সতী। সতী জন্ম-ব্রহ্মচারিণী—স্বভাব-বৈরাগিনী—জানো তো? ওকে ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছ, তাই তুমি অন্তত জানো যে, স্বামীর ঘর করবার জন্যে ওর জন্ম নয়। ও স্বধর্মে পূজারিণী—গৃহিণী নয়। তবু ওকে বিয়ে করতে হ'ল পাকে প'ড়ে, স্বামীর সঙ্গে থাকতে হ'ল কয়েক বৎসর—এমন কি একটি সন্তানের জন্মও দিতে হ'ল। ওকে যে কোনো যোগী দেখবামাত্র এক আঁচড়ে চিনে নেবেন জন্মযোগিনী ব'লে। কিন্তু এ-হেন মেয়েকে কেন স্বামি-সহবাস করতে হ'ল যা ওর পক্ষে বিধর্ম? অথচ আবার দেখ, সেই বিধর্মের ফলেই না এমন নিত্যসিদ্ধ শিশুর জন্ম! এই সব যত দেখি ততই বুঝি বাবা, যে, জ্ঞানের অভিমান বিড়ম্বনা। আমাদের উপনিষদেও পদে পদে দেখতে পাবে এই কথারই ইঙ্গিত রয়েছে নানান্ শ্লোকে মন্ত্রে: তিনি চলেন অথচ নিশ্চল, তিনি দূরে অথচ কাছে, তিনি অন্তরে অথচ বাইরে, তিনি অণোরণীয়ান্ অথচ মহতো মহীয়ান—কত বলব?' বলে আমার দিকে চেয়ে: 'এইখানেই হয়ত উত্তর পাবে তোমার প্রশ্নের: উদার গুরুর কেন সঙ্কীর্ণ শিষ্য হয়? অবিশ্বাসী বাপের কেমন ক'রে পূজারিণী মেয়ে হয়? দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ আসে কোত্থেকে? যে পাণ্ডবদের দেহরক্ষী—কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং—তাদের কেন দুঃখের অবধি রইল না—কী না তাদের সইতে হ'ল: রাজ্যনাশ বনবাস মনঃকষ্ট—শেষে নিরুপমা স্ত্রীর লাঞ্ছনা সবার সামনে! অথচ দেখ, ঠাকুর শেষরক্ষাও তো করলেন—পাণ্ডবদের পাকে ফেললেন বটে, কিন্তু সেই সর্বনাশের গহ্বর থেকেই আবার তাদের টেনে তুললেন ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে! এসব যতই ভাবি ততই মনে হয় বাবা, যে, যত রকম অভিমান আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অপল্কা অভিমান হ'ল বুদ্ধির, জ্ঞানের অভিমান।'

"কতদিনই-যে সতীতে-আমাতে গঙ্গাতীরে ব'সে আলোচনা করেছি একথা! সতী বলত: 'সত্যি মামাবাবু, কোত্থেকে কোথায় এলাম বলো তো? অনিচ্ছায়ও হ'তে হ'ল মা—আর আহা, এমন ছেলের মা যাকে দেখতে না দেখতে প্রাণ জুড়িয়ে যায়!'

"কেবল আমার মনে মনে ভয় ছিল—কখন অরুণ রজতকে ফিরিয়ে নিয়ে

যেতে লোক পাঠায়। সতীকে আমি বলিনি অরুণের সঙ্গে আশ্রম নিয়ে আমার তর্কাতর্কির কথা। কিন্তু ওর মার প্রাণ তো, ও জানত যে, রজতকে নিয়ে টানাটানি হবেই। ও সবচেয়ে ভয় পেত ভাবতে যে, রজতের জন্যে আবার না ওকে শিলঙে ফিরতে হয় মাঝে মাঝে। তাই রজতকে পেয়ে পরম শান্তি পেলেও সেই শান্তির আড়ালেই একটা ভয় লুকিয়ে থাকত গা-ঢাকা হ'য়ে···কী হয় কী হয়···হারাই হারাই···আরো কতরকম অনামা উদ্বেগ!

"কিন্তু উদ্বেগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটা দুরাশা বা দুরাকাঙ্ক্ষা, যাই বলো: যে, রজতের টানে হয়ত অরুণের পরিবর্তন হবে, হয়ত আনন্দগিরিকে একদিন সে-ও গুরু ব'লে বরণ করবে। কিন্তু অরুণ মাঝে মাঝে যে-সব চিঠি লিখত তাতে এ-ভরসার ক্ষীণ শিখা নিভে যেত। কারণ সে শুধু রজতের কথাই জিজ্ঞাসা করত, লিখত সামনের বৎসর ওকে ভালো স্কুলে দিতে হবে, রজতের অভাবে বাড়ি খালি খালি লাগে···এই ধরনের একান্ত সাংসারিক সেন্টিমেণ্টাল কথা—কোনো চিঠিতেই আনন্দগিরি বা আশ্রম-জীবনের সম্বন্ধে একটিও প্রশ্ন করত না। এক একবার লিখত—যদি সামনের বৎসর সতী রজতকে নিয়ে একবার শিলঙে ফেরে কিছুদিনের জন্যে—তবে সবদিক দিয়েই শোভন হয়, ছেলেকে স্কুলে ভরতি করবার সময় মা থাকলে নানা লোকের নানা প্রতিকূল আলোচনা খানিকটাও তো নিরস্ত হবে—ইত্যাদি। সতী এতে গভীর ব্যথা পেত, কিন্তু ব্যথার চেয়েও গাঢ় হ'য়ে উঠত ওর উদ্বেগ। বলত: 'কিন্তু ভয় করি কেন মামাবাবু—যখন পেয়েছি এমন দেবগুরু? মন যদি দুর্বল হ'য়ে পড়েই, তবে তিনি তো রয়েছেন বল দিতে। গুরুদেব কেমন চমৎকার ক'রে বোঝালেন সেদিন—ঠাকুরের লীলার অন্ত পাওয়া ভার হ'লেও একান্তীর শেষরক্ষা তিনি করেনই করেন—খেয়া টলমল করতে পারে কিন্তু ভরাডুবি হয় না'—ইত্যাদি।

"রজত আসার পর থেকে আনন্দগিরির আশ্রম-জীবন যেন আরো স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর হ'য়ে উঠল! সকলেই ওকে ভালোবেসে ফেলল। রহমৎ তো রজত বলতে অস্থির! তাকে রোজ কাঁধে ক'রে নিয়ে যাবে ঘাটে গঙ্গাস্নানে—মোটরে নিয়ে এদিকে ওদিকে বেড়াতে। ওদিকে আনন্দগিরি—ওর সঙ্গে থেকে শুধু খেলা করা নয়, পুরাণ ভাগবত মহাভারত থেকে নানা গল্প বলতেন, আর রজত চোখ বড় বড় ক'রে শুনত। সবচেয়ে উজিয়ে উঠত ও ধ্রুব ও প্রহ্লাদের গল্পে। বলত: 'গুরুজি, আমি ধ্রুব হব।' আনন্দগিরি বলতেন: 'কিন্তু প্রহ্লাদ আরো বড়।' রজত একটু ভাবনায় প'ড়ে যেত। একদিন ভেবেচিন্তে গালে

হাত দিয়ে বলল: 'হ্যাঁ, প্রহ্লাদ হওয়াও মন্দ নয়। কিন্তু আমার বাবাকে যে তাহ'লে রাক্ষস হ'তে হয় গুরুজি!' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'তা কেন? সে ছিল ত্রেতাযুগে। কলির প্রহ্লা'দের বাবা সায়েব কি হাকিম হ'লেও চলে।' রজত ভেবে বলত বিজ্ঞস্বরে: 'তা বটে। তাছাড়া বাবাও যে এখানে এলে হবে গুরুদেবের চেলা আমাদের মতন—' ব'লেই খিলখিলিয়ে হেসে: 'তখন বাবাকে বলব—দুও, হেরে গেলে, হাকিম সাহেব হ'য়েও গুরুজিকে বলতে হ'ল—হুজুর!' শুনে সতী হেসে ওকে জড়িয়ে ধ'রে বলল: 'তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মণি! তাই যেন হয়।'

"এভাবে পরমানন্দে আমাদের দিন কেটে যায় হু হু ক'রে। কিন্তু বুদ্ধদেব বলেছিলেন না—সাংসারিক কিছুই স্থায়ী নয়—না সুখ, না দুঃখ? একথা অকাট্য, তাই একটু একটু ক'রে আমার মন ফের অশান্ত হ'য়ে উঠল! শান্ত সুন্দর আশ্রম, পুণ্যসলিলা গঙ্গা, আনন্দময় সাধু—সব ছাপিয়ে আমার মনের এক জায়গায় বিঁধত, প্রশ্ন জাগত—ধর্মের পথ কিন্তু এত সহজ হ'তে পারে না, তাছাড়া এত সুখ সয় না। মন মিথ্যে বলেনি। ক্রমশই একটা আক্ষেপ মতন জেগে ওঠে—মনে হ'তে থাকে আমি যেন sitting on-the fence জাতীয় সুবিধাবাদী হ'তে চলেছি—পরম প্রশ্নের মুখচাপা দিয়ে।"

বার্বারা বলল: "কী প্রশ্ন দাদা?"

অসিত বলল: "সব না ছেড়ে ভগবানকে পাওয়া যায় কি না? মনে হ'ত অমলের কথা শ্যামঠাকুরের কথা, সতীর কথা। একজন ঠাকুরের জন্যে সব ছেড়ে চ'লে গেল বৃন্দাবনে—স্বপ্নে দীক্ষা পেয়ে! আর একজন চাকরির নোঙর কেটে চলল অকূলে—নিল আকাশবৃত্তি। কিন্তু মন সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করত সতীর কথা ভেবে। ছেলেমানুষ মেয়ে—তবু বিলাস ছেড়ে, স্বামীর ভালোবাসা ছেড়ে এমন কি এককথায় ছেলেকেও পর ক'রে দিয়ে এলো তো হরিদ্বারে? পারল তো নিঃস্ব হ'তে অকুণ্ঠে! একটি গানের চরণ ফিরে ফিরে কানে বাজত: 'যারা যাবার তারা চ'লে গেল, আমিই শুধু রইনু প'ড়ে!' শুধু আমিই পারলাম না গুরুবাদী হ'য়েও গুরুচরণে শরণ নিতে!

"কিন্তু তখনি মনে উদয় হ'ত পাল্টা প্রশ্ন—আমার গুরু কে? সংশয়ী মন তো—তাই স্বামী স্বয়মানন্দ আমাকে প্রবল ভাবে টানলেও ভাবতাম: আনন্দগিরিও তো আমাকে কিছু কম মুগ্ধ করেননি? কাজেই কেমন ক'রে জানব তিনিই আমার গুরু নন? তিনি বলেননি ব'লে? কিন্তু তিনি কি সতীকেই বলেছিলেন খোলাখুলি তাছাড়া গুরু বলি কাকে? না, যাকে হৃদয় অকুণ্ঠে বরণ

করে দিশারি ব'লে। কিন্তু স্বামী স্বয়মানন্দকে গুরুবরণ করবার সাধ জাগলেও তাঁর আশ্রমে বসবাস করতে হবে ভাবতেও কেন ডরিয়ে উঠি? অন্যদিকে, আনন্দগিরির আশ্রয়ে থেকে যেতে পারি, এও তো মনে হচ্ছে বারবারই। এই ধরনের হাজারো যুক্তি, প্রতিযুক্তি উজিয়ে-ওঠা, পেছিয়ে-যাওয়া। শেষে একদিন আর সইতে না পেরে আনন্দগিরির কাছে গিয়ে ব'লে ফেললাম আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা: আমার গুরু কি স্বয়মানন্দ স্বামী? সব শুনে তিনি বললেন: 'বাবা, তিনি মহাযোগী এ আমি জানি, কিন্তু তোমার গুরু কি না আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারবো না, কেন না ঠাকুর আমাকে কিছু বলেন নি—আর ঠাকুর না দেখিয়ে দিলে আমি কিছুই দেখতে পাই না—সত্যি বলছি। তবে ঠাকুর আমাকে এটুকু বলেছেন, তাই জানি, যে আমি তোমার গুরু নই। কি জানো বাবা? সংসারে সাধকদের মোটামুটি তিনটি থাক: এক, যেমন অমল যারা স্বপ্নে দীক্ষা পায়। দুই, যেমন শ্যামঠাকুর বা সতী বা তুমি—যাদের গুরু জীবন্ত মানুষ হ'য়ে আসেন। আর এক থাক আছে যাদের হৃদয়ে ইষ্টই আসেন গুরু হ'য়ে, যেমন রমণ মহর্ষি বা শ্রীরামকৃষ্ণ।'

"আমি বললাম: 'কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের তো একাধিক গুরু ছিল।'

"আনন্দগিরি হাসলেন: 'ব্রাহ্মণী—তোতাপুরী? না বাবা, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অবতারকল্প মহাপুরুষ—উনি যাঁদের কাছে তান্ত্রিক সাধনের বা নির্বিকল্প সমাধির দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁরা কেউই ওঁর গুরু ছিলেন না, ছিলেন—শিক্ষকমাত্র। গুরু আর শিক্ষকের মধ্যে তফাৎ আসমান-জমিন। যারা স্বধর্মে গুরুবাদী তাদের কাছে যথার্থ গুরু আসেন ইষ্টের প্রতিনিধি হ'য়ে—যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার মানে ইষ্টের কাছেই আত্মসমর্পণ, যেমন রূপ-সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি করেছিলেন মহাপ্রভুর কাছে। তোতাপুরী বা ব্রাহ্মণীকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এভাবে গুরুপদে বরণ করেননি কোনোদিনই। তবু যে তাঁদের বিধান শিষ্যের মতন মেনে নিয়েছিলেন—সে শুধু লোকশিক্ষার্থে—ঠিক যে-কারণে কৃষ্ণ সন্দীপনী মুনির শিষ্য হ'য়ে গুরু-গৃহবাস করেছিলেন। এ-গূঢ় সত্যটি ধ'রে ফেলেছিল তাঁর পরম ভক্ত শ্রীদাম—জানো তো তার কাহিনী? আর রমণ মহর্ষির গুরুর দরকার হয়নি, কারণ তিনি ছিলেন স্বভাবে নিত্যসিদ্ধ, আত্মারাম—স্বরাট্ পুরুষ। এ-জাতের মহাপুরুষেরা নিজের পথ নিজেই কেটে নেন তাঁদের অন্তর্জ্যোতির নির্দেশে। এঁরা ভগবানকে তলব ক'রে সারথি বাহাল করেন প্রেমের জোরে। কিন্তু জীবকোটি এবং অনেক ঈশ্বরকোটি সাধকদেরও গুরু না হ'লে গতি নেই। কেবল, তাদের নির্দিষ্ট গুরু আসেন তখনই যখন কাল পূর্ণ হয়—যেমন ঘটল

শ্যামঠাকুরের বেলায়। আমি এটুকু টের পেয়েছি যে, তুমি ওদের মতনই স্বভাববৈরাগী তথা গুরুবাদী। তাই তোমাকে বলছি—তোমার গুরুও দেখা দেবেনই দেবেন ঠিক সময়ে, আর দেখা দিতে-না-দিতে সব সংশয় তোমার কেটে যাবেই যাবে—যেমন সতীর গিয়েছিল। আজ তোমাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, ব্যস্ত হোয়ো না, ধৈর্য ধরো—কেবল যতটা পারো ইষ্টকে ডাকো, তাহ'লেই গুরুলাভের দিন এগিয়ে আসবে—আসবেই আসবে—না এসেই পারে না।' ব'লে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: 'যে সত্যি চায় সে পাবেই পাবে—এ হ'ল শাশ্বত সত্য, যার মার নেই।' ব'লে একটু হেসে: 'আর এই যে অপ্রতিবাচ্য সনাতন সত্য—এ চিরন্তন ব'লেই দেশে দেশে যুগে যুগে সত্যার্থীদের বাইরের মনে নির্ভরসা কালো হয়ে উঠলেও তাদের অন্তরাকাশে এ-বিশ্বাস অনির্বাণ আলো হ'য়েই জ্বলে যে, ঠাকুর যাদের প্রাণের কানে একবার বলেছেন যে তিনি তাঁর ভক্তদেরকে অকূলপাথার থেকে টেনে তুলবেনই তুলবেন তারা অকুতোভয়—যে-কথা দ্রৌপদী বলেছিলেন কৃষ্ণকে:

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্॥

তবে—' ব'লে হেসে—'এর মধ্যে খানিকটা যেন চ্যালেঞ্জের ভাব আছে, না? ভাবটা এই যে, শুধু ঠাকুরই-যে ভক্তদের শাসান তাই নয়, ভক্তও পাল্টে শাসাতে পারে: যে, সাবধান ঠাকুর, তুমি কথা দিয়েছ যে, তোমার ভক্তকে বাঁচাবে—একথা তুমি ভুললেও আমি ভুলছি নি।'

"আমার বুকের রক্ত দুলে উঠল, বললাম: 'একথায় একটু ভরসা আসে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়ও করে যে! কারণ মনে রাখবেন—দ্রৌপদীর মতন অসামান্য ভক্তিমতীকেও যদি ঠাকুরকে মনে করিয়ে দিতে হয় যে, সাক্ষাৎ কাণ্ডারীর আশ্বাস পেয়েও তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হ'তে পারছেন না, তখন আমাদের মতন সামান্যদের গতি কী হবে? ধরুন না কেন আমারি কথা: এক একবার উচ্ছ্বাসের মাথায় ভাবি—স্বামী স্বয়মানন্দই আমার গুরু, যাই তাঁর কাছে ছুটে। কিন্তু তার পরেই যেমনি ভাবি তাঁর আশ্রমের গোয়ালে থাকতে হবে পাঁচশো বেদরদীদের মধ্যে গুঁতোগুঁতি ক'রে—অমনি মন তোলে শিরপা!'

"আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'এ সবই মায়া যুক্তি, বাবা—অজ্ঞানের জোগানো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি উপমা দিতেন, মনে নেই?—সেই বিকারের রোগী প্রলাপ বকছে: একধামা সন্দেশ খাব রে, এক জালা পায়েস খাব রে—

বৈদ্য শুনে হেসে বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবি বৈ কি—কিন্তু তিনি জানেন যে এসব বিকারের চাওয়া, সত্যি চাওয়া ফুটে উঠবে যখন বিকারের ঘোর কাটবে ? আমরাও ঠিক এম্‌নিই ভুল বকি সংস্কারের কামনা-বাসনার বিকারে : আমার এ মনে হয়, এ হ'তেই পারে না, তা হবেই হবে—আরও কত কী প্রলাপ ! কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মার কী মনে হয় জানতে পারি—যখন আসক্তির বিকার কাটে। এই কথাই যমরাজ বলেছিলেন নচিকেতাকে—সবই তো জানো বাবা—আমি নতুন কিছুই বলছি না—সব দেশেই জ্ঞানীরা ব'লে গেছেন এই একই কথা :

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

কিনা : আমাদের হৃদয়ে কামনা বাসনার কুয়াশা যেই কাটে অম্‌নি আমরা মর্ত্যলোকেই অমৃত হই ব্রহ্মকে দেখতে পেয়ে যাঁকে ঢেকে রেখেছিল এই অজ্ঞানের কুজ্ঝটিকা। অন্য ভাষায়, সত্যস্বরূপ আমাদের মধ্যেই আছেন আলো ক'রে—কেবল প্রকাশ হ'তে পারছেন না কামনা-বাসনার হাজারো পর্দার দরুন। তাই কেবল বলা : এ নিয়ে অনর্থক মন খারাপ কোরো না, শুধু ঠাকুরকে ডেকে যাও একমনে—যেন তিনি পথ দেখিয়ে দেন। যদি তোমার স্বধর্ম হয় গুরুবাদ, তবে গুরুও তোমাকে তিনিই মিলিয়ে দেবেন। সেদিনই তো গাচ্ছিলে মীরার গান : হরী মিলায়ো গুরু মুঝে গুরু হরিকী শরণ লগাঈ। আহা কী গানই তুমি গাও বাবা ! এমন ভাবের গান, ভক্তির গান যার কণ্ঠে বেজে ওঠে সেও কি না ভাবে সাত পাঁচ ? তবে এমনই ঠাকুরের কাণ্ড—কিছু কি বোঝা যায় ভেবে-চিন্তে ?' ব'লেই গান ধ'রে দিলেন :

'এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছে কী কুহক ক'রে :
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পলাতে নারে' !"

অসিত বলল : "দিনের পর দিন এমনি কত চমৎকার কথাই যে তিনি বলতেন—আর কী সহজ সুরে ! শুনতে শুনতে সময়ে সময়ে মনে হ'ত—আহা, কথা তো নয়, যেন আলোর ফোয়ারা ! আমার আনন্দিগিরিকে আরো ভালো লাগত এইজন্যে যে, অনেক জাঁকালো গুরুর মতন তিনি 'জানি না' কবুল করতে কখনো লজ্জা পেতেন না। উপদেশ চাইলে দিতেন, কিন্তু বলতেন এর বেশি আমি জানি না। একদিন হরদয়াল জোর গলায় আমার কাছে বলেছিল আমাদের গুরুর সঙ্গে কি আর কারুর তুলনা হয়—তিনি যে সর্বজ্ঞ ! আমি একথা

কথাচ্ছলে তাঁকে পরদিন হেসে বলি। কিন্তু হাসি আমার শুকিয়ে গেল তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে। শিষ্যকে তিনি তক্ষুনি তলব ক'রে বললেন: 'কক্ষনো বোলো না এমন কথা যে আমার গুরু অমুক তমুক গুরুর চেয়ে বড়। মনে রেখো—অপরের গুরুকে ছোট করতে গেলে খতিয়ে শুধু নিজের গুরুকেই নয়, ইষ্টকেও ছোট করা হয়, কেননা সব গুরুই সেই একেরই প্রতিনিধি। তাছাড়া আমি সর্বজ্ঞ—এ কবে শুনলে তুমি? কার কাছে? আমার মুখে নিশ্চয়ই শোনো নি, কেন না আমি যখন তখন ব'লে থাকি—আমি শুধু ততটুকুই জানি—দেখি, যতটুকু ঠাকুর আমাকে জানিয়ে দেখিয়ে দেন—না না না, আর যেন কোনোদিনো এ-ধরনের কথা না শুনি তোমাদের কারুর মুখে!' ব'লে একটু হালকা সুরে: 'এই দেখ না কেন, তোমাদের নামজাদা অসিতবাবু—ইনিও কী নিরাশই না হয়েছেন! ভেবেছিলেন আমি ব'লে দিতে পারব কে তাঁর গুরু—কী তাঁর কর্তব্য—আরো কত কী। কিন্তু আমি বার বারই হার মেনে বলি ঐ এক কথা—জানি না বাবা, কারণ ঠাকুর আমাকে জানিয়ে দেননি। এহেন নিঃসম্বলকে কি না তোমরা সর্বজ্ঞ ব'লে ঢাক পিটোতে চাও! আর যা করো করো বাবা, শুধু লোক হাসিও না'—ব'লেই খিলখিল ক'রে হাসি আমার দিকে তাকিয়ে—'মনে প'ড়ে গেল ছেলেবেলায় একটা সেকেলে টপ্পা শিখেছিলাম 'সিন্ধু-খাম্বাজে'—ব'লেই ধ'রে দিলেন:

'যে যাতনা যতনে রাখি সখী, মনে মনে,
পাছে শত্রু হাসে শুনে, লোকলাজে প্রকাশ করিনে।'

ব'লেই ফের সে কী হাসি—বালকের মতন! অমন-যে গম্ভীরাত্মা হরদয়াল—সেও উঠল হেসে। কাউকে কখনো বকলে তার পরেই তিনি এইভাবে কোনো-না-কোনো হাসিঠাট্টায় তার খেদ দূর ক'রে দিতেন।

"তাঁর হাসি থামলে আমি বললাম: 'সাধুজি, আপনাকে গুরু করা সহজ ব'লেই এত লোভ হয় আপনাকে গুরু করতে—' তিনি বাধা দিয়ে বললেন: 'অমন কথা মুখেও এনো না বাবা, তোমার গুরু আমি নই—বলেছি তো সেদিন।'

অসিত বার্বারার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল: "অনেক রকম সাধুই আমি দেখেছি জীবনে—অনেক রকম গুরু: সাধুর ছদ্মবেশে অসাধুও কম দেখিনি, সদ্‌গুরুর মুখোশ-পরা এমন বদ্‌গুরুও দেখেছি বৈকি যার স্বরূপ বুঝতে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছে! তুমি আমাদের দেশে যদি কোনোদিন আসো—"

তপতী টুকল: "বলো—যখন আসবে—"

অসিত হেসে বলল: "ও ছাড়বে না কিছুতে—যখন দেখেছে তুমি আসবে—আচ্ছা আচ্ছা, এ নিয়ে তর্ক করব না—যখন যখনই সই—তুমি যখন আমাদের দেশে আসবে—বলব নানা সাধুর কথা—কার কাছে কী শিখেছি, কার কাছে ঠ'কেও কী লাভ করেছি, কবে কে হঠাৎ এসে হারানো খেই ধরিয়ে দিয়েছে—আরো কত কী। আজ শুধু বলি আনন্দগিরির কথা, বিশেষ ক'রে তাঁর ব্যক্তি-রূপের একটা দিকের কথা, যা না বললেই নয়।

"পারমার্থিক তত্ত্বের দুটো দিক্ আছে—একটাকে বলা যেতে পারে নঞর্থক, কিনা না-র দিক, নিষেধের দিক্। আর একটিকে বলা যেতে পারে সদর্থক, কি না হাঁ-র দিক্, বিধানের দিক্। নঞর্থক জ্ঞানের খুবই দরকার আছে বটে—বিশেষ ক'রে সাধকের পক্ষে, কিন্তু মুস্কিল এই যে, তার প্রসাদে বাধা কাটলেও মন ভরে না। অনেক সাধু এই কথাটা বোঝেন না ব'লেই কৃচ্ছ্রসাধনকে এত বড় ক'রে ধরেন। কিন্তু আনন্দগিরি বুঝতেন, তাই তিনি প্রায়ই বলতেন: 'সৃষ্টির সার্থক প্রকাশ হ'ল তার হাঁ-র রূপ। খতিয়ে অবশ্য না-ও হাঁ-রই একটা রূপ বৈ কি, চাঁদের উল্টো পিঠ, কেন না—না আছে ব'লেই আমরা হাঁ-র মর্ম বুঝতে পারি। অশান্তিতে যে না ভুগেছে সে শান্তির সার্থকতা পুরোপুরি বুঝতে পারে না, যেমন অকুলপাথারে যে না পড়েছে সে বুঝতে পারে না কাণ্ডারীর মহিমা! কিন্তু তবু বলব,—বলতেন আনন্দগিরি প্রায়ই—'আলোই সত্য, অন্ধকার মায়া। তাই প্রাণের চিরন্তন প্রার্থনা—তমসো মা জ্যোতির্গময়—আমাকে অন্ধকূপ থেকে টেনে তোলো আলোর তীরে। কিন্তু তাহ'লে অন্ধকারে পড়ি কেন? না, আলোর সমজদার হ'তে। এই জন্যেই ঠাকুর তাঁর ভক্তকে খানিকটা অন্তত নাজেহাল না ক'রে দিলাশা দেন না—দেখা দিয়েও ছেড়ে পালান, আশা দিয়েও ফেলেন নিরাশার অতলে। বাইরে থেকে দেখতে তাঁর এ-লীলাকে মনে হয় নিষ্ঠুর, কিন্তু সে-ই জানে তিনি কী যে তাঁর করুণাকে করুণা ব'লে চিনতে শিখেছে, বাবা! কিম্বা অন্য ভাবে বলা যেতে পারে—তিনি ভক্তের সঙ্গে খেলেন লুকোচুরি—কেন না প'ড়ে পাওয়া ধনকে আমরা তেমন ক'রে ভোগ করতে পারি না যেমন পারি হারিয়ে পেলে!'

"এইরকম যে কত গভীর কথাই তিনি বলতেন দিনের পর দিন—অথচ কি অপরূপ সরল সুরে—যার মধ্যে কখনো ভুলেও বেজে উঠত না জ্ঞানের অভিমান কি দেখানেপনার আড়ম্বর। জ্ঞান তাঁর শুদ্ধ মনে তেমনি সহজে ফুটে উঠেছিল যেমন সহজে সরলতা ফুটে ওঠে শিশুর হাবভাবে, মাধুর্য—পতিব্রতার সেবায়,

সুষমা—ফুলের দলমেলায়। তাঁর কথা শুনতে শুনতে একদিকে যেমন উল্লাস জাগত দেখে সিদ্ধ মহাপুরুষ কেমন সহজে মন্ময়তা কাটিয়ে হ'য়ে ওঠেন তন্ময়, তেমনি আবার মন আকুল হ'য়ে উঠত সময়ে সময়ে—কবে আমি হব এমন সহজিয়া ?

"কিন্তু তা বলে ভেবো না যে, তিনি যাকে একবার অসত্য ব'লে জেনেছেন চিনেছেন, তাকে অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হ'তেন। বিনয় ছিল তাঁর রক্তে বটে কিন্তু সত্যভাষণ ছিল তাঁর মজ্জায়! একটা দৃষ্টান্ত দেই।

"একদিন সতীর ঘরে নামকীর্তনের পর কথায় কথায় মিরাক্ল—ইন্দ্রজালের প্রসঙ্গ এসে পড়ল! আমি বললাম: 'আমার এক তীক্ষ্ণধী নোবেল লরিয়েট ফরাসী বন্ধু আছেন, তিনি বলেন জাঁক ক'রে যে, আমরা সব কিছুই বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি—আজ যা পারছি না তাও দু'দিন বাদে পারবোই পারব। কাজেই অজ্ঞেয় ব'লে কিছুই নেই, থাকতে পারে না।' শুনে আনন্দগিরির সে কি হাসি! বললেন: 'বাবা, এই হ'ল সত্যিকার অজ্ঞান—যার প্রধান মুখপাত্র হ'ল সেই পাণ্ডিত্য যে রায় দেয় ঠাকুরকে না জেনে। একবার তাঁর পাল্লায় পড়লে এই সব পণ্ডিত বুদ্ধির বোলচাল ছেড়ে শুরু করবে কা কা কা—সেই উপাধ্যায়ের মতন যে কালীকে কল্পনা ব'লে হেসে উড়িয়ে দিতে না দিতে তাঁকে দেখতে পেয়েছিল চর্মচক্ষে—বলেন নি কি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ? ওদের কথা ধোরো না বাবা, যাদের না মানার হেতু হল—না জানা।

"আমি বললাম: 'একথা সত্যি, কিন্তু তবু—মানে তিনি বলেন যে, বুদ্ধি যখন আমরা পেয়েছি—' আনন্দগিরি পাদপূরণ করলেন—'তখন সবজান্তাও হয়েছি। পাগল না ক্ষ্যাপা? আর এ বুদ্ধিই বা পেয়েছি কার কাছ থেকে—মন বুদ্ধি প্রতিভার পারে যিনি আসীন তাঁর পাঠানো এক কণা বিভূতি বৈ তো নয়।' হরদয়াল তখনো মাঝে মাঝে বুদ্ধির তরফে ওকালতি করত, ব'লে বসল: 'কিন্তু বুদ্ধি তিনি দিলেন কেন—যদি সে আসলে হবে ফেলনা?' আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'ঐ দেখ তোমরা আমার মুখে চাপিয়ে দেবেই দেবে তাই আমি যা কখনো বলিনি! তিনি যা দেন তার কিছুই ফেলা যায় না, বুদ্ধির বেলাও ঐ কথা। জীব যখন নীচ থেকে উপরে ওঠে তখন বুদ্ধি একটা অবস্থায় কাজে আসে বৈকি—খানিকটা সিঁড়ির মতন। কিন্তু এ সিঁড়ি কি তাই ব'লে পৌঁছে দিতে পারে সেই শিখর লোকে যেখানে'—ব'লেই সুর ক'রে: 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ—অর্থাৎ যেখানে সূর্য চন্দ্র তারা অগ্নি বিদ্যুৎ কেউ পৌঁছতে পারে না? সে যে কোন্ নির্বিকল্পের

অনুভূতি বাবা জানে কেবল সেই ভাগ্যবান্ যমেবৈষ বৃণুতে—যাকে তিনি বরণ ক'রে নিয়েছেন আপন ব'লে—আর কেউ নয়! আর সে কী দেখে? না—' ব'লে ফের সুর ক'রে—'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি—কি না সব কিছুই আমাদের অনুভবলোকে প্রকাশ হয়, ফুটে ওঠে তিনি ধরা দিতে চাইছেন ব'লেই, তাঁর আলোয় ভুবন আলো ব'লেই। তিনি তিনি ··' বলতে বলতে তাঁর ভাবাবেশ হ'ল যেমন প্রায়ই হ'ত এ-সব অনুভবের কথা বলতে বলতে, সুর হ'য়ে এলো মৃদু, কণ্ঠ গদ্গদ, শরীর উঠল কেঁপে ··আমরা পাঁচজনে মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে, এমন সময় হঠাৎ তাঁর কণ্ঠে জেগে উঠল এক অপরূপ মিনতির সুর: 'ঠাকুর! এরা বলে কি শুনছ না? বলছে—তোমার সব কীর্তিকলাপেরি তল পাবেই পাবে বুদ্ধির লগি বা মাপকাঠি দিয়ে। আহা, এদের একটু দয়া করো না ঠাকুর, দাও না এদের চোখের ঠুলি খুলে একটিবার। মুখ্যু যদি ভাবে সে সবজান্তা, তবে তার সত্যি জ্ঞান হবে কী ক'রে বলো তো? ···কী? কী বললে? ·· সময় হ'লে বুঝবে? কিন্তু আহা ঠাকুর প্রাণ কাঁদে আমার: কত দিন ওরা ঘুরে মরবে বিজ্ঞম্মন্যতার শূন্যরাজ্যে। কতদিন জপবে একবিন্দু জ্ঞানকে সিন্ধুমহিমা ব'লে? কবে বুঝবে যে, তোমাকে জানলে তবেই তার নাম জ্ঞান? কী বলছ? ···জানবে একদিন? কিন্তু কবে ঠাকুর? তোমার লীলাখেলা যা দেখিয়েছিলে যশোদাকে, অর্জুনকে, গোপীকে, অক্রূরকে—তার কিছু ছিটেফোঁটাও কি দিতে নেই এদের? আর কতদিন এরা শুধু ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধিরই কূপমণ্ডুক হ'য়ে ব'সে থাকবে? একটু দেখালেই বা ভেল্কি—মাঝে মাঝে এও একটু আধটু দেখাতে হয়। ···কী? তোমায় প্রসাদ? বা বা বা! দাও ঠাকুর দাও—' ব'লেই দুহাত অঞ্জলির মতন পেতে নিজের মাথার উপর তুলেই নামিয়ে নিয়ে তেমনি চোখ বুঁজেই বললেন গাঢ়কণ্ঠে: 'ওরে নে নে নে সবাই খা খা খা—ঠাকুরের প্রসাদ—স্বয়ং ঠাকুরের পরিবেশন!'

"আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—আমি হাত পাততেই তিনি চোখ মেলে আমার হাতে ফেলে দিলেন এক তাল হাতভরা মোহনাভোগ প্রসাদ!!"

বার্বার অস্ফুট সুরে চিৎকার ক'রে উঠল: "প্রসাদ!!"

অসিত হেসে বলল: "নৈলে আর বলছি কী? কোথাও কিছু নেই—something out of nothing, একেবারে অক্ষরে অক্ষরে—হাওয়া থেকে মিষ্টি প্রসাদ! আর কী মিষ্টি যে! হালুয়া যে এমন সুধাস্বাদ হয় কে জানত।" ব'লেই বার্বারার মুখের দিকে চেয়ে: "কী? মুখ চোখের চেহারা অমন হ'য়ে গেল কেন? আমার সেই ফরাসী বন্ধুর কথা মনে পড়ছে—যখন তাকে আমার

এক বিশেষ অন্তরঙ্গ কবিবন্ধু বলেছিলেন যে তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন একদল অতি বিশ্বাসী গ্রামবাসীকে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলতে বলতে জ্বলন্ত কয়লার গনগনে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে। তিনি শুনে প্রথমটায় এম্‌নিই থ হ'য়ে গিয়েছিলেন!"

বার্বারা বলল: "কী রকম? কী রকম? যোগী গ্রামবাসীরা?"

তপতী বলল: "না! সাদামাটা সরল গ্রামবাসীরা। শোনো, এবার আমি বলব, কারণ এ শুধু আমার দেখা নয়, আমার বোন, বাবা মা, কয়েকজন ইংরাজ দর্শকও দেখেছিলেন। এ ব্রত প্রায়ই করেন গ্রামবাসীরা, কেন না এ তাদের শুদ্ধির একটা অঙ্গ। কিছুদিন ধ'রে এরা কি একটা মন্ত্র জপ করে, স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না, উপোস করে, তারপর খালি পায়ে জ্বলন্ত কোক কয়লার উপর দিয়ে সরাসর হেঁটে যায়—সে কোক কয়লার আগুন এমন গনগনে যে যারা সাজায় তারা ভিজে গামছা জড়িয়ে তবে সাজাতে পারে। আমি ছিলাম পাঁচ সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে, তবু আগুনের হল্‌কায় ঘেমে অস্থির!"

বার্বারা বলল: "তারপর?"

তপতী বলল: "তারপর আর কি? গুরুমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে একদল পাড়াগেঁয়ে চাষা খালিপায়ে হেঁটে যায় সেই গনগনে আগুনের উপর দিয়ে। তুমি যখন আমাদের দেশে আসবে তখন স্বচক্ষেই দেখবে—এ কোনো যোগ-টোগের কোনো ক্রিয়া নয়—শুধু সরল বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ শক্তি—বহু দর্শক দেখতে আসে—যেমন কৌতূহলীরা আসে ম্যাজিক দেখতে।"

অসিত বলল: "আমিও স্বচক্ষে দেখতে পারতাম—তখন আমি ত্রমেলে, কিন্তু দেখতে যাইনি—কারণ সে সময়ে দারুণ গরম আর ঠিক দুপুরে ওরা এভাবে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। তবে আমার তিন চার জন গুরুভাই গিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার এক কবিবন্ধু। তিনি তাঁর স্বচক্ষেদেখা এ অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি চমৎকার কবিতাও লিখেছিলেন। আমার ফরাসী বন্ধুকে একথা বলতে তিনি বললেন—গ্রামবাসীদের পায়ের তলায় নিশ্চয়ই কোন তেল টেল ছিল যা asbestos এর মতন fire-proof.

তপতী হেসে বলল: "আমাদের সঙ্গে ছিলেন কয়েকটি ইংরাজ দর্শক—তাঁরাও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন পরে—ওদের পায়ে কিছুই ছিল না! তাছাড়া এ-ব্রতচারীরা তো দুপয়সা উপায় করতে, কি ম্যাজিক দেখাতে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায় না—কি একটা পুজোর সময়ে প্রতি বৎসর ওরা এ-ভাবে অগ্নিপরীক্ষা দেয়, বলে এত ক'রে তারা

নিষ্পাপ হয়। শুধু তাই নয়, ওদের মধ্যে এক দলপতি এসে দর্শকদের বলে—তাদের হাত ধ'রে যে-কোন দর্শক যেতে পারেন—পায়ে ফোস্‌কাটি পর্যন্ত পড়বে না।"

অসিত বলল: "আমাকে এ-ঘটনার কথা প্রথম বলেন আমার এক মুসলমান বন্ধু—সার আকবর হায়দরির ছেলে তাঁর স্বচক্ষে দেখা—হায়দ্রাবাদে। আমি তখন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন: 'এ অবিশ্বাস করার কোনো উপায়ই নেই—চলুন আমার সঙ্গে হায়দ্রাবাদে, আমি আপনাকেও দেখাব—এ হল নিছক বিশ্বাসের ক্রিয়া, কোনো গুপোলর সিদ্ধাই-ও নয়। কিন্তু হরিদ্বারের কথাই বলি—রাত হ'য়ে যাচ্ছে।"

অসিত বলল: '"কী বলছিলাম? হাঁ, প্রসাদ। এভাবে প্রসাদ পেয়ে আমরা সবাই কেমন যেন হতভম্ব মতন হ'য়ে গেলাম! কারণ আমার মনের একটা অংশ ঘোর অবিশ্বাসী—তাছাড়া সম্ভব-অসম্ভবের বদ্ধমূল সংস্কার তো! কেবলই মনে হ'ত—মানে, যখন যোগশক্তি সম্বন্ধে নানা কথা পড়তাম—যে, এ-যদি সম্পূর্ণ বানানো গল্প বা বুজরুকি নাও হয়, তবু অনেকখানিই বাড়ানো—এ নিশ্চয়! তবু মজা এই যে, এ-ধরনের কল্পনাচিত্রও পড়তে ভালো লাগত: কবে কাশীর বিখ্যাত ত্রৈলঙ্গ স্বামী গঙ্গার জলের মধ্যে হাত ডোবাতেই জলে-ডোবা তলোয়ার তাঁর হাতে উঠে এসেছিল, বৃন্দাবনে কবে কাঠিয়াবাবা বিষ খেয়ে হজম করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে একই শাখায় দেখান দুটো জবা লাল ও সাদা যে গাছে—মথুরবাবু বলছিলেন চ্যালেঞ্জের সুরে—ফুটুক দেখি সাদা জবা—লালের জায়গায়! এ-ধরনের আরো কত গল্প কাহিনী জনশ্রুতি—এর-ওর-তার চোখে দেখা অঘটন—যখনই পড়তাম বা শুনতাম কোথায় যেন একটা ব্যথা মতন বোধ করতাম ভাবতে যে—কী ক'রে বোঝাই কী ধরনের ব্যথা!—আমাদের একটা গান আছে—বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা? খানিকটা সেই ধরনের বিহ্বলতা!

"তবে এ-যাবৎ মনের কোথায় একটা সান্ত্বনার ভাবকে আঁকড়ে ছিলাম যে, এ-ধরনের অলৌকিক ব্যাপার হয়ত ভুতুড়ে ভেল্কি—চেতনার বিকাশের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধই নেই। কিন্তু এ তো সে-জাতের অঘটন নয়। সাধুজি স্বচক্ষে দেখলেন ঠাকুর এসে প্রসাদ দিয়ে গেলেন স্বহস্তে! তাছাড়া তিনি তো কোনো ভেল্কি দেখাতে চাননি—তিনি প্রায়ই বলতেন, ভেল্কি দেখিয়ে মানুষকে ভগবানে বিশ্বাস করাতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কারণ বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি আমাদের অন্তরাত্মার এজাহার—যেখানে ভেল্কির ভর ইন্দ্রিয়-সাক্ষ্যের'পরে। তিনি তাঁর

সরল্ ভাষায় প্রায়ই বলতেন যে, মনকে পেরিয়ে যেতে না পারলে ভাগবত সত্যের মণি-কোঠায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়—যেমন জলের উপর ঢেউ কাটিয়ে ডুব দিতে না পারলে অতলের মুক্তা মিলতে পারে না।"

বার্বারা বলল: "তারপর?"

অসিত বলল: "এই অঘটন নিয়ে সেদিন আমাদের অনেক রাত অবধি আলোচনা হ'ল! আর এ-সূত্রে একটা কথা যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম: যে, কানে-শোনা বা বইয়ে-পড়া এহাজার হাজার বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন, আমাদের মনকে কিছুতেই তেমন নাড়া দিতে পারে না যেমন পারে চোখে দেখা অভিজ্ঞতা—বিশেষ ক'রে অঘটনের রাজ্যে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে হ'ল—যে, আশ্চর্যেরো কমবেশি বা ডিগ্রি আছে।"

বার্বারা বলল: "যথা?"

অসিত বলল: "যথা? এই প্রসাদের দৃষ্টান্তই নেও না। পাটনায় অমলের মেসে প্রথম দেখি—তার সাজানো হালুয়া ভোগ থেকে ঠাকুরের খানিকটা উঠিয়ে নেওয়া। অঘটন হিসাবে একে আশ্চর্য ব'লে তো মেনে নিতেই হবে? আচ্ছা। তারপর এর পাশাপাশি রাখো এই হাওয়া থেকে প্রসাদ গজাতে দেখার অভিজ্ঞতা। প্রথমটা আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল খুবই, কিন্তু দ্বিতীয়টার মতন নয়। কারণ প্রথমটার বেলায় একটা জিনিস সামনে ছিল—যেন উবে গেল অমনি, হালুয়ায় ঠাকুরের আঙুলের দাগও রইল—অবাক্ কাণ্ড মানি, কিন্তু তার চেয়েও অবাক্ কাণ্ড নয় কি যে, যেখানে কিছুই ছিল না সেখানে গজিয়ে উঠল এক সেকেণ্ডে স্থূল প্রত্যক্ষ বস্তু, যাকে শুধু যে চোখে দেখা যায় তা-ই নয়, স্পর্শে ও স্বাদের ইন্দ্রিয়ও মঞ্জুর করতে বাধ্য হয় বাস্তব ব'লে? একে হিপনটিসম্ বা সাবজেক্‌টিভ অভিজ্ঞতা ব'লে উড়িয়ে দেওয়ারও পথ নেই, কারণ শুধু-যে আমরা পাঁচজন একে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাই নয়—সে-প্রসাদের খানিকটা আমি খামে মুড়ে রেখে দিয়েছিলাম—বহুদিন ছিল, মাঝে মাঝে তা থেকে একটু একটু সবাইকে দিতাম।

"সেদিন অনেক রাত অবধি ঘুম হ'ল না! আর কী জানি কেন, কেবলই একটা রোখালো আনন্দ জেগে উঠল ভাবতে যে আমার সে-তীক্ষ্ণধী ফরাসী বন্ধুটি, বুদ্ধিতে আমার জ্যেষ্ঠ হ'লেও, সৌভাগ্যে আমার কনিষ্ঠ। বুঝলাম অবশ্য যে, এ-ও আত্মাদরের একটি রূপ—কিন্তু তবু কেবলই মনে হ'তে লাগল—আহা তাকে, যদি থ ক'রে দিতে পারতাম এ অঘটনটিকে তার নাকের সামনে ঘটিয়ে।

"অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি—আমি যেন সতীর

বিগ্রহের সামনে ব'সে জপ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ আনন্দগিরির আবির্ভাব। তিনি যেন বললেন হেসে: 'করলে কী অসিত? বৃথাই ঠাকুর প্রসাদ দিলেন তোমাকে।' মনে হ'ল কে যেন আমাকে চাবুক মারল।

"ঘুম ভেঙেই গভীর আত্মগ্লানিতে আমার মন ছেয়ে গেল। সত্যিই তো, কী ভাবে গ্রহণ করলাম আমি এ-ঘটনাকে, ছি ছি! শুধুই অঘটন—ইন্দ্রজাল? ভুলেই গেলাম এর প্রসাদের দিকটার কথা। মন খারাপ হ'য়ে গেল: সাধে কি ঠাকুর আমাকে সব ছেড়ে ঝাঁপ দেবার বল দেন না? মনে পড়ল: Many are called but few are chosen—হায় হায়! তবে এই সূত্রে মাত্র লাভ হ'ল যে, দেখতে পেলাম স্বচক্ষে—কেন আমরা ডাক শোনা সত্ত্বেও উত্তীর্ণ হই না শুধু শ্রদ্ধার অভাবে। আমরা অবাক্ হ'তে উজিয়ে উঠি, কিন্তু নিজেকে শোধন করবার ডাক শুনলেই যাই পেছিয়ে, নৈলে কি আমি এভাবে বেমালুম ভুলে যেতে পারতাম যে, ঠাকুর আমাদের প্রসাদ দিয়েছিলেন চমকে দিতে নয়, শুদ্ধিদান করতে? শুধু তাই নয়, এত বড় একটা অঘটন দেখেও কেবল ভাবতে থাকলাম আমার বুদ্ধিমান বন্ধুরা এ-দৃশ্যকে কী ভাবে নিতেন? কেবলই প্রশ্রয় দিতে থাকলাম অবান্তর অমুক তমুকের কথা—যারা দেখেও দেখতে চায় না—মহত্তম সাধুর সম্বন্ধেও কিছুই না জেনেও বলতে পারে তারা সব মোহমুগ্ধ বা বুজরুক! সত্যিই কান্না এল ভাবতে যে, আমার আধার অশুদ্ধ তাই ঠাকুরের করুণা পেলেও তাকে করুণা ব'লে বরণ করতে না-পারার দরুণ হৃদয়ের শূন্যতা কাটে না, অথচ দোষ চাপাই ঠাকুরের ঘাড়েই যে, এত ডাকলাম—তিনি সাড়া দিলেন কই?

"তবে এও মনে হ'ল যে, এ-ধরনের সাধুও দুর্লভ। মনে প'ড়ে গেল ভাগবতে পড়েছিলাম—'নারায়ণ-পরায়ণ' সাধু কোটিতে গোটিক হয়। আধার আমার যতই অশুদ্ধ হোক না কেন, এমন অপরূপ কৃষ্ণৈকান্ত সিদ্ধের সিদ্ধ মহাপুরুষকে তো দেখেছি আমি, স্নেহ পেয়েছি তো এমন পরমভাগবতের—যিনি তুকতাক দেখিয়ে কাউকে হাত করবার কথা দূরে যাক—যিনি বলতে পারেন অকুণ্ঠে 'ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবম্—ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্'—যিনি ধন জন মান যশ দেহসুখ প্রতিষ্ঠা কিছুরই পরোয়া করেন না—যিনি সর্বস্ব কৃষ্ণচরণে নিবেদন ক'রে নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বাতীত সুখের অধিকারী—সবার উপরে, যিনি লাভ করেছেন 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি' যাকে কোটিজন্মের সুকৃতির দাম দিয়েও কেনা যায় না।' সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ সতীর 'পরে গভীর শ্রদ্ধা এল। চোখে পড়ল যেন নতুন ক'রে—সে এদিক দিয়ে কত এগিয়ে—শুধু গুরুর ডাক শুনে সব ছাড়তে পেরেছে ব'লেই নয়—তার

একবারও তো কই মনে হয়নি তার স্বামী বা নন্দাই বা স্কুলের ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট হেডমিস্ট্রেস এ-অঘটনকে বিশ্বাস করবেন কি না! এ-অলৌকিক কাণ্ডের অলৌকিকতায় সে আমারি মতন অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও একটিবারও ভোলেনি তো যে, গুরুদেবের মাধ্যমে ঠাকুর এ-অঘটন ঘটিয়েছিলেন আমাদের তাক লাগিয়ে দিতে নয়—শুদ্ধি দিয়ে ভক্তি জাগিয়ে তাঁর পায়ে টেনে আনতে!

"কিন্তু 'স্বভাবো দুরতিক্রমঃ' বলেছেন ব্যাসদেব। কাজেই অনুতাপের ফলে আমার জাগ্রত মন খানিকটা শুদ্ধ হ'লেও অবচেতন মন চলতেই থাকল তার নিজের খাতে। স্বপ্নে দেখলাম: আবার সেই নোবেল লরিয়েট ফরাসী বন্ধুর সঙ্গে বার্লিনে দেখা হয়েছে আর সে বলছে সদম্ভে: 'মিরাক্ল! ওসব মিডীভাল। সায়েন্স সব ধ'রে ফেলেছে! যাই ঘটুক না কেন, যদি একবার ঘটে তবে তার কার্য-কারণ খুঁজলে পাওয়া যাবেই যাবে—মানে, যদি বুদ্ধির দীপ্তি থাকে। তোমরা বলো: ভগবান অমেয়, অসীম, অচিন্ত্য, আরো কত কী গালভরা বিশেষণ! সায়েন্স শুনে হাসে, কারণ সে টের পেয়েছে যে এমন কিছুই ঘটতেই পারে না বুদ্ধি যার কাছে হার মানে তল না পেয়ে। তাছাড়া ভেবে দেখতে গেলে অজ্ঞেয় অঘটন জাতীয় কথাগুলো সবই অর্থহীন—a contradiction in terms—কেন না যাকে মূলে জানাই যায় না সে আছে কী ক'রে জানি? যা ঘটেছে তাকে অঘটন বলি কেমন ক'রে? বুদ্ধি তাই এ-ধরনের অসঙ্গত কথা শুনে বলে: এর নাম হ'ল হার মানা, অতএব নামঞ্জুর, কেন না জয়লাভ করতেই আমার জন্ম।' আমি রুখে উঠে তাকে বললাম, আনন্দগিরির হাওয়া থেকে প্রসাদ তলব করার কথা, সে হো হো ক'রে হেসে উঠল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

"উঠে দেখি ভোরের আলোয় নীল গঙ্গা গান গেয়ে চলেছে অশ্রান্ত আনন্দে। এক খণ্ড সোনার মেঘ নামিয়ে দিয়েছে রঙের ঝালর। সামনে একটি গাছে সবে-ফোটা গোলাপ ফুলেরা বাতাসে মাথা নেড়ে ওকে শাসাচ্ছে! ওদিকে গোলমোহর গাছে সবুজ পাতার মধ্যে লাল ফুল দুলছে তালে তালে। এমনি সময়ে চোখ পড়ল সামনে। মন ভ'রে উঠল: শান্তসৌম্য আনন্দগিরি আবক্ষ জলে দাঁড়িয়ে, নবারুণের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে গাইছেন গুরু নানকের গান:

"হরিকী রীত কোঈ নাহি জানে।
যোগী যতি মুনি সন্তন হারে অরু বহু লোগ সয়ানে॥
অপনী মায়া আপ পসারে, আপে দেখনহারা।
নানারূপ ধরে বহু রঙ্গী সবসে রহত নিয়ারা॥

অমিত অপার জো অলখ নিরঞ্জন জিন সব জগ ভরমায়া।
নানক সকল ভরম ত্যজি মন্ন তো তাহি চরণ চিত লায়া।।"

এর মানে হ'ল :

হরির লীলা কেউ জানে না ভবে।
হার মেনেছে যোগী ঋষি জ্ঞানী গুণী সবে।।
নিজের মায়ায় নিজেই ভোলে নিজের কাছেই হারে।
নানারূপ সে-রঙ্গনাথের—রয় যে রূপের পারে।।
অলখ নিরঞ্জন যে-অপার ভোলায় তিন ভুবন,
নানক নিখিল ভুল-বিদায়ে চায় তারি চরণ।।

অসিত বলল : "কিন্তু এই প্রসাদ পাবার পর থেকে শুরু হ'ল এক নতুন অধ্যায়—আমার অজান্তে। কী ভাবে বলি" ব'লে একটু থেমে : "প্রথম দিকে মন উঠল খুবই উজিয়ে কিন্তু তার পরেই পতন—ধূলোয় গড়াগড়ি—দিনের পর দিন চেতনা কেমন যেন আচ্ছন্ন মতন হ'য়েই রইল। সবই দেখছি শুনছি অথচ মনে হ'তে থাকে যেন কিছুই নয়। শেষে সইতে না পেরে ধর্না দিলাম আনন্দগিরির কাছে। তিনি শুনে হেসে বললেন : 'এ তো ঠিকই হয়েছে। ওষুধ ধরেছে। প্রসাদ পেয়েছ তাহ'লে সত্যিই—আর সন্দেহ নেই।' আমি অবাক্ হ'য়ে বললাম : 'কী বলছেন আপনি? আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো—কী যেন হারিয়ে ব'সে আছি—কোনো কিছুতেই যে আর তেমন রস পাচ্ছি না! তিনি বললেন : "বাবা, পেয়ালা ভরা ছিল সস্তা গুড়ে। মধু দিয়ে ভরাতে হ'লে আগে গুড় ফেলে দিতে হবে তো? তাই এ-শূন্যতা। সাংসারিক সুখ-স্বাদে যতদিন মন দিব্যি ভরপুর থাকে, ততদিন ঠাকুরও থাকেন দূরে। কারণ এ-সুখে যে মশগুল হ'য়ে আছে সে-তাঁকে চাইবেই বা কেন? তাই প্রথমে আসে সংসার বিতৃষ্ণা—যাকে বলছ কিছুই ভালো-না-লাগা। গোপীরা কৃষ্ণকে বলেছিল মনে নেই : 'নাথ, তোমার স্পর্শ পেয়ে অবধি আর স্বামী কি সন্তানের স্পর্শও ভালো লাগে না।" ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে : 'প্রসাদ মানে কী শুনবে? মানে—সেই স্পর্শ যা আমাদের আধারকে নির্মল করে—শুদ্ধি দেয়। শুদ্ধির কাজ কী? না, যে-সব হাজারো কামনা বাসনার মোহে আমরা তাঁকে ভুলে থাকি তা থেকে আমাদের চিত্তকে টেনে তোলা অনাসক্তির তীরে। সাধনার সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় হ'ল এই শুদ্ধির উদ্যোগপর্ব—যার পিঠপিঠ, আসে অন্তর্দ্বন্দ্বের ভীষ্মপর্ব। এ-অধ্যায়ে সময়ে সময়ে মনপ্রাণ এমনি

শুকিয়ে যায় বা হাঁপিয়ে ওঠে যে, মনে হয় ঠাকুর কী নিষ্ঠুর! কিন্তু তিনি-যে ক্রমে ক্রমে সব আসক্তি থেকে ছাড়িয়ে নিতে চান শূন্যতার মধ্যে ফেলতে নয়, পূর্ণ সার্থকতার কোলে গুটিয়ে নিতে—এইটেই আমরা ভুলে যাই আমাদের কামনা-বাসনার টানে, মোহের মায়ায়। শোনো বলি আমার জীবনের একটি ঘটনা—বহুদিন আগেকার কথা—তবু আজো মনে হয় যেন মাত্র সেদিন ঘটেছে।

আমরা পাঁচজনে মন্ত্রমুগ্ধের ম'ত শুনতে লাগলাম।

"আনন্দগিরি বললেন: 'আমার বাবা ছিলেন মস্ত জমিদার। মা সাদামাটা সেকেলে মেয়ে—ভক্তিমতী, পতিব্রতা ব্রতচারিণী। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, আদরের ছেলে। বাবা ছিলেন পুরোপুরি সংসারী, কিন্তু দিলদরিয়া, বিশ্বাস করতেন দানধ্যানে, জাঁকালো সামাজিকতায়, ধনে মানে—এককথায়, উদার ভোগী যাকে বলে। প্রায়ই বলতেন সাড়ম্বরে: বাঁচতে হবে বহুজন হিতায়, নিতে হবে বিষয় আশয়ের দায়িত্ব, করতে হবে ভোগ, কেবল দেখতে হবে সেটা ভোগের নামে দুর্ভোগ না হ'য়ে দাঁড়ায়। আমার বালক মন এসব শুনতে শুনতে রসিয়ে উঠল আত্মাভিমানে, পিতৃগৌরবে।

'স্কুলে কলেজে আমার মেধার সুনাম হ'ল, পাস-টাসও ভালো ক'রেই করলাম। তারপর অনেক কিছুই ঘটল সে-সব বাদ দিয়ে যাই। আমার কুড়ি বৎসর বয়সে, ঠিক যখন আমি বি. এ. ডিগ্রি নিয়েছি, আমার মা হঠাৎ গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ডুবে যান। মাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম, তাই মনকে শান্ত করতে নানা ধর্মের বই পড়া শুরু করলাম। কিন্তু তবু শোক কেটেও কাটতে চায় না। কয়েকটি সাধু সন্ন্যাসীর কাছেও গেলাম, কিন্তু কারুর কাছেই পেলাম না শান্তি। এমন সময়ে হঠাৎ কাশীতে দেখা হ'ল পরমহংসদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে। তাঁকে দেখেই মন কেমন যেন আবিষ্ট হ'য়ে গেল। তিনি একদল জিজ্ঞাসুর নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন তাঁর সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায়। খানিক বাদে আমাদের সবাইকে তাঁর সঙ্গে ধ্যানে বসতে বললেন। বসতে না বসতে আমার মন শান্তিতে ছেয়ে গেল। খানিক বাদে চোখ খুলে দেখি—স্বামীজী সমাধিস্থ। সমাধি সেই প্রথম দেখি। কী অপরূপ প্রশান্ত মূর্তি!

'সেদিন রাতে ঘুম হ'ল না। কেন জানি না, মনে হ'ল—আমার পথ সংসার নয়। অথচ বৈরাগ্য যাকে বলে তাও তো আসেনি। কী আমার কর্তব্য ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। পরদিন ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান ক'রেই স্বামীজির কাছে গেলাম। আমার কপাল-জোর ছিল—স্বামীজির ঘরে কেউ ছিল না। আমাকে তিনি সাদরে ডেকে বসালেন। তারপর তাঁকে ঘণ্টাখানেক ধ'রে নানান

প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, ভগবানের দেখা পাওয়া ও তাঁর বাহন হওয়াই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ। একথা অবশ্য নানান ধর্মগ্রন্থেই পড়েছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর মুখে এই পুঁথিপড়া বুলিই যেন এক নব স্পন্দনে জীবন্ত হ'য়ে উঠল! আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কী ক'রে ভগবানের দেখা পাওয়া যায়? তিনি বললেন: ঠাকুরকে ডাকো বাবা, তাঁকে একমনে ডাকলে তিনিই পথের নির্দেশ দেবেন। আমি বললাম: কিন্তু আমার সংসারে এখনো আসক্তি রয়েছে—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বাঁচতে হবে শুনে এসেছি। তিনি হেসে বললেন: শুনতে খাসা বাবা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—অপরের সুখের ব্যবস্থা তুমি করবে কেমন ক'রে? যে নিজে শান্তি পায়নি, সে কি অপরকে শান্তি দিতে পারে? আর সংসারের সুখ? আজ আছে কাল নেই। বহুজনকে যদি সুখী করতেই চাও, তবে পরম সুখকে আগে জানো! আর বহুজনের হিত? মানুষ মানুষের কতটুকু হিতসাধন করতে পারে বলো তো? প্রায় সবাই চলে অন্ধভাবে নিজের কামনা বাসনার টানে আর ভাবে—চলছে সমাজের সেবা করতে, সবার মঙ্গল করতে। মানুষের সেবা খুবই বড় কথা, কিন্তু সবচেয়ে বড় জনসেবা করে সে-ই যে ভগবানের সেবক হয়। তাই ঠাকুর কথায় কথায় একে ওকে তাকে ধম্‌কাতেন: অপরের উপকার করবে যে—ভগবানের চাপরাশ পেয়েছ কি? লোকশিক্ষা জনসেবা কিছুই ঠিকমতন হয় না বাবা, ভগবানের এই চাপরাশ বা আদেশ না পেলে। আমি বললাম: কিন্তু কর্মের মোহ যে কেটেও কাটে না! তিনি বললেন: কাটে—কেবল মুক্তি চাইলে তবেই, নৈলে নয়। আমি বললাম: মুক্তিসাধনার উপায় কি? তিনি বললেন: একটি বৈ দুটি উপায় নেই বাবা, ঠাকুরকে ডাকো। গীতায় বলছে:

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

মানে, আমার মায়ার জাল কাটতে পারে কেবল সে-ই যে আমার শরণ নেয়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, বাবা। তাই সাতপাঁচ প্রশ্ন ছেড়ে একবার তাঁর শরণ নিয়ে দেখ দেখি, ফল পাও কি না। পাবেই পাবে। ঠাকুর বলতেন, সাধনা একটু করলেই ভগবান্ এসে দেখিয়ে দেবেন—এই এই। আমি বললাম: ভগবান্‌কে কী ভাবে ডাকব? তিনি বললেন: যে-ভাবে তোমার মন সাড়া দেয়। আমি বললাম: পরমহংসদেবের একটি দাঁড়ানো সমাধিস্থ ছবি আছে, আমার বড় ভালো লাগে। মুহূর্তে তাঁর চোখ জলে ভ'রে এল, বললেন: এ তো পরম সুলক্ষণ বাবা! তাঁকে যদি ডাকতে পারো তাহ'লে সবচেয়ে

সহজেই পাবে পথের নির্দেশ। তিনি এসেছিলেন যে এ-যুগের কাণ্ডারী হ'য়েই— অথচ আমরা কজনই বা তাঁকে চিনতে পেরেছি? আর যাঁরা চিনেছেন ভাবেন তাঁরাই বা কতটুকু দিশা পেয়েছেন তাঁর স্বরূপের?

'স্বামীজির ব্যক্তিরূপ, সমাধি, সরলতা, কথার পিছনে উপলব্ধির জোর—সব জড়িয়ে এমন একটি ছবি দেখলাম যে, আমার মন উদাস হ'য়ে গেল। আমি সেদিন থেকে গোপনে ঘরে দোর দিয়ে পরমহংসদেবের ঐ দাঁড়ানো ছবিটির সামনেই ধ্যান ও প্রার্থনা শুরু ক'রে দিলাম। মাসছয়েক বাদে হঠাৎ একদিন স্বপ্নে দেখি—তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ছবির মতন নয়, ছবিতে তাঁর কোমরে ধুতি ছিল, স্বপ্নে দেখলাম দিগম্বর! সে কী মূর্তি! প্রতি অঙ্গ দিয়ে জ্যোতি যেন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে! এক হাত ঊর্ধ্ববাহু, মুখে অপার্থিব মৃদু মৃদু হাসি, চোখে জল! স্বপ্নেও কী যে বিপ্লব ঘটে গেল বলে বোঝাতে পারব না। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন: রোখ চাই বাবা, রোখ চাই! আর্ চাই ত্যাগ। বেরিয়ে পড়ো। আমি বললাম: কিন্তু পথ দেখাবে কে? গুরু কই? তিনি বললেন: গুরু মিলবেই মিলবে—যদি এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়তে পারো। ঘুম ভাঙতে দেখলাম—চোখের জলে বালিশ ভেজা!

'রোখ চাই, রোখ চাই—এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়ো, গুরু মিলবেই মিলবে—রাতদিন কানে বাজতে থাকে। তিনদিনের দিন আর পারলাম না, ঠাকুরের কথাম'ত এক কাপড়েই বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতেই কেন জানি না মনে হ'ল—যাই হরিদ্বারে। হাতে শ' দুই টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম নানা তীর্থে ঘুরব ব'লে। কিন্তু কেমন যেন একটা আবেগ আমাকে পেয়ে বসল—কেবল শুনতে লাগলাম—কে যেন কানে কানে বলছে: হরিদ্বার, হরিদ্বার, হরিদ্বার! ট্রেন থেকে একটা পোস্টকার্ড লিখে বর্ধমানে ডাকে দিলাম—তাতে বাবাকে লিখেছিলাম শুধু এই কয়টি কথা—আমি কিছুদিন তীর্থে ঘুরব, কোনো ভয় নেই, কেউ যেন আমার খোঁজ না করেন।

'হরিদ্বারে পৌঁছতেই পরমহংসদেবের দেখা পেলাম ফের স্বপ্নে। তিনি খুব খুশী, বললেন: এই তো চাই বাবা। ত্যাগ চাই। কোনো ভয় নেই। যাও বদরীনারায়ণ, যেখানে তোমার গুরু তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছেন। ব'লেই অন্তর্ধান।

'সে কী আনন্দ! গুরু মিলবে—গুরু মিলবে—আমার জন্যে তিনি পথ চেয়ে! বেরিয়ে পড়লাম পদব্রজে। তখন আমার পূর্ণ যৌবন—একুশ পেরিয়ে সবে বাইশে পা দিয়েছি—বলিষ্ঠ শরীর, মনে অভয়, হৃদয়ে শান্তি, প্রাণে উৎসাহ—

আমাকে রোখে কে? দিন পনের বাদে বদরীনারায়ণে পৌছলাম, মিলল দেখা পরম গুরুর যাঁর আশীর্বাদে আমার ভববন্ধন কাটল—কী আনন্দ! আমার গুরু—কৌপীনপরা মহাতেজস্বী উর্ধ্বরেতা ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী। তাঁর সঙ্গে ঘোরা শুরু হ'ল—পরিব্রাজক হ'য়ে তীর্থে তীর্থে।

'বৎসর খানেক এইভাবে ঘুরে শেষটায় গুরুদেব আমাকে বললেন: এবার বোসো স্থির হ'য়ে সাধন পীঠে। আনলেন আমাকে ফের হরিদ্বারে। গঙ্গাতীরে একটি ছোট কুটীরে বছর দুই থাকলাম—গুরুগৃহবাস যাকে বলে!

'কতরকমেরি যে অভিজ্ঞতা হ'ল—সে সব বলবার দরকার দেখি না, শুধু এইটুকু বলি যে, সাধনার শান্তি, আনন্দ ও অভয় পাওয়া সত্ত্বেও থেকে থেকেই বিপদ এসে ছেয়ে ধরত, মনে হ'ত বুঝি হবে না শেষরক্ষা, পারব না লক্ষ্যে পৌছতে। গুরুদেব বললেন হেসে: যার আধার যত বড় তার পরীক্ষাও তো হবে তেমনিই। ঠাকুর আমাদের চান বলীয়ান্ করতে, আর বল আসে ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়েই। সে-সব খুঁটিনাটির কথা বাদ দিয়ে যাই, কেবল একটি মহা পরীক্ষার কথা আজ বলব—শুধু দেখাতে গুরুকৃপা কিরকম প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে।

"আনন্দগিরি বললেন:

'বছর তিনেক বাদে আমার এক কাকা খোঁজ পেয়ে আমাকে চেপে ধরলেন: বাবার খুব অসুখ, আমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চান।

'আমি ভেবেছিলাম সংসারের সব মায়া মমতাই কাটিয়েছি, কিন্তু বাবা মৃত্যুশয্যায় শুনে আর থাকতে পারলাম না, গুরুদেবের কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি কিছু বললেন না, শুধু মৃদু হাসলেন। মৌনকে সম্মতির লক্ষণ ব'লে নিজের মনকে বুঝিয়ে কাকার সঙ্গে গেলাম ফিরে।

'বাবা আমার হাত ধরে কেঁদে বললেন: বাবা, তুই আমার একমাত্র সন্তান! আমার অন্তিম অনুরোধ—আমার মুখাগ্নি না ক'রে তোর গুরুর কাছে ফিরে যাস নে। তিনি এতে না করবেন না—এ যে পিতৃ-ঋণ!

'পিতৃ-ঋণ শুনতে না শুনতে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। আমি আচ্ছা ব'লে গুরুদেবকে সব লিখে জানিয়ে দিলাম। কোনো উত্তর এল না।

'মনের মধ্যে অশান্তি ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কী করছি? গুরুদেবের এতে সম্মতি আছে তো? কিন্তু দেখ পরীক্ষা—কথা দিয়েছি বাবাকে—তার উপর তিনি মৃত্যুশয্যায়, গুরুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে

আসাও সম্ভব নয়। তবে পিতৃ-ঋণ কথাটার ঝংকার বেড়ে উঠতে লাগল—আরো এইজন্যে যে, আমার মনে দৃঢ় ধারণা হ'ল পিতৃবিয়োগ আসন্ন।

"আনন্দগিরি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'কিন্তু দেখ মহামায়ার মায়া—বাবা মরতে মরতে সেরে উঠলেন। কিন্তু তখনো তিনি এতই দুর্বল যে, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়—বহু কষ্টে রক্ষা পেয়েছেন, আমি চ'লে গেলে হয়ত ফের পাল্‌টে পড়বেন। উভয়-সঙ্কট! ওদিকে গুরুদেবের ডাক, পরমার্থ—এদিকে পিতৃ-ঋণ, পুত্রের কর্তব্য। দিনের পর দিন সে যে কী বিষম মনঃকষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব! গুরুদেবকে লিখলে উত্তর নেই, এদিকে কী করা উচিত বুঝতে পারি না। শেষটায় কেমন যেন ক্ষোভ আমাকে পেয়ে বসল—মনকে বোঝালাম: গুরুদেব আমাকে তো চান না, কেন আর মিথ্যে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করা? আমি থাকি তাঁর কাছে যিনি আমাকে চান—অন্তত যতদিন না বাবা পুরোপুরি সেরে ওঠেন। এমনি ক'রে র'য়ে গেলাম গৃহে ছ-ছটি মাস: সন্ন্যাসী ফিরে এল সংসারে পুনর্মূষিক হ'য়ে! আত্মাদর আমাকে প্ররোচনা দিল—আমাকে গুরুদেব চান না, চান—পিতৃদেব। দুরত্যয়া মায়া—মনকে এম্‌নি ক'রেই পেয়ে বসে—দশচক্রে!

'বাবাকে তখনও লাঠি ধ'রে ধীরে ধীরে চলতে হয়। অতি কষ্টে বিকেলে একটু মোটরে ক'রে বেড়িয়ে আসেন। অমন সুস্থ সবল দেহের দুরবস্থা দেখে মাঝে মাঝে চোখের জল সামলাতে পারতাম না—বিশেষ ক'রে যখন শুরু হ'ত তাঁর কাশি—হাঁপানির কাশি। সে দেখাও যন্ত্রণা! মনে হ'ত: আহা, আমি থাকি এখন—কোথায় যাব? আমি চ'লে গেলে বাবা আবার শয্যা নেবেন—আর তাঁকে বাঁচানো যাবে না। এমনি ক'রেই মমতার যুক্তি আসে. ছিনিয়ে নিয়ে পরমার্থ থেকে, ভুলিয়ে দেয়—কে কাকে বাঁচায়!

'আমাদের শাস্ত্রে আছে প্রতি কর্ম গ'ড়ে তোলে একটা প্রবাহ যে শেষ পর্যন্ত না ঠেকে নিঃশেষ হয় না। যেমন জলে ঢিল ফেলা—বৃত্তগুলি বড় থেকে আরো বড় হ'তে হ'তে ক্রমে তীরে পৌঁছে তবে নিরস্ত। আমার গুরুগৃহ থেকে পিতৃগৃহে ফিরে-আসা-রূপ কর্মের প্রবাহ এই ভাবেই দীর্ঘায়িত হ'তে হ'তে শেষটায় ঠেকল গিয়ে—কিন্তু না, কী ভাবে ফাঁদে পড়লাম বলি।

'একদিন সকালবেলা বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর ঘরে

পৌঁছতেই দেখি তিনি একটি ফরাশে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুয়ে চোখ মুছছেন। আমি তাঁর পাশে বসতেই তিনি আমার পিঠে হাত বুলোতে শুরু করলেন। আমি একটু বাদে ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম! একটু স'রে বসতে যাব এমনি সময়ে তিনি আমার হাত দুটি ধ'রে কাতর স্বরে বললেন: আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বাবা, এখনো কি ফিরে চাইবি নি। আমি আশ্চর্য হ'য়ে তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন। আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম: কী হয়েছে বাবা? তিনি চোখ মুছে বললেন আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—বললাম না? এবার তুই ভার নে এ-সংসারের! এত কষ্ট ক'রে এ বিষয়-আশয় করেছি কার জন্যে বাবা? শুধু তোর জন্যেই তো। তুই আমার একমাত্র বংশধর। তুই এবার বোস্ গদিতে—আমি কাশীবাস করি।

'আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি বললাম: প্রথমে আপনি বলেছিলেন আমাকে মাত্র তিন চার মাস থাকতে। পরে আরো চার পাঁচ মাস—যতদিন না আপনি একটু উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন। কিন্তু সইয়ে সইয়ে শেষটায় এ কী প্রস্তাব করছেন বলুন তো? আমি গুরুর কাছে সন্ন্যাস নিয়েছি—শুধু আপনি মরণাপন্ন শুনে থাকতে পারিনি ব'লেই দু'দিনের জন্যে ঘরে ফিরেছি! কিন্তু এখন দেখছি না ফিরলেই ছিল ভালো।

'বাবা শুধু যে পণ্ডিত ও নিপুণ জমিদার ছিলেন তাই নয়, ছেলেবেলা থেকে তাঁর তার্কিক ব'লে নাম ছিল। আমার একথায় তিনি সুর একেবারে বদলে ফেললেন। শান্ত হয়ে বললেন: তবে শোনো বলি বাবা! এ-সংসার ভগবান গড়েছেন কি নিছক বনবাসের মহিমা প্রচার করতে? গৃহস্থাশ্রমকে কি বড় বড় মুনি ঋষিরাও শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলেন নি? ভগবান এত শত দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন কি শুধু একটা ছেলেমানুষি খামখেয়ালে? মহাভারত তো তোমার ভালো ক'রেই পড়া আছে বাবা, তাই নিশ্চয় তোমার মনে আছে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে কী বলেছিলেন: এ-সংসারে চার রকম মানুষ আছে: যাদের ইহলোক আছে পরলোক নেই—যেমন ঐহিকভোগী; যাদের পরলোক আছে ইহলোক নেই—যেমন যোগী, যাদের ইহলোকও নেই পরলোকও নেই—যেমন তামসিক মূঢ়ের দল, আর যাদের ইহলোকও আছে পরলোকও আছে—যেমন:

> যে ধর্মমেব প্রথমং চরন্তি ধর্মেণ লব্ধাচ ধনানি কালে
> দারানবাপ্য ক্রতুভির্বিজন্তে তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ।

মানে, উভয় লোক আছে তাদেরি যারা ধর্মভীরু হ'য়ে ধর্মপথে ধন অর্জন ক'রে

দারপরিগ্রহ ক'রে গৃহস্থাশ্রমে ব'সে স্বধর্ম পালন করে। এদেরই লাভ হয় চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। আর মনে রেখো বাবা একথা বলেছেন কিনি? স্বয়ং মুনি মার্কণ্ডেয়—চণ্ডী যাঁর রচনা। আর কাকে বলেছেন? না, সাক্ষাৎ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে—যিনি জানতে চেয়েছিলেন জ্ঞানের পথ। শেষ কথা: কেন বলছেন?—এই জন্যেই নয় কি যে অন্য সব আশ্রমই অপূর্ণ, এক ধার্মিক গৃহস্থই পূর্ণ সার্থক? অন্য ভাষায়, যেমন এ-জীবনের পরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়-ভোগ নয়, তেমনই এ-জীবন আমরা পেয়েছি সব কর্তব্য ছেড়ে আত্মসর্বস্ব নির্বাণে নিভে যেতেও নয়। ভাগবতে স্বয়ং প্রহ্লাদও কি এই কথাই বলেন নি দুঃখ ক'রে:

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠা?

অর্থাৎ মুনিরা প্রায়ই নিজের মুক্তি চেয়ে পরার্থনিষ্ঠা ত্যাগ ক'রে মৌনী বাবা হ'য়ে ব'সে থাকেন বনেজঙ্গলে। খতিয়ে, এ তর্কাতর্কির কথা নয় বাবা, এ হ'ল শুভবুদ্ধির কথা—উপনিষদে ঋষিরাও যার প্রার্থী হ'য়ে বলতেন: স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। ঈশোপনিষদেও দেখতে পাবে মহাঋষি বলেছেন, মানুষ শতায়ু হ'য়ে নিরন্তর কর্মশীল হবে—এই হ'ল সেরা পথ। তবে মানি—এ-হেন মহত্তম আদর্শ দুর্বলের বা বামনের জন্যে নয়—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তাই পূর্ণ সার্থকতার দুর্গম পথে চলতে যে অক্ষম সে যাক সন্ন্যাসের পথে। কিন্তু তোমার আধার তো ছোট আধার নয় বাবা! রূপ গুণ মেধা শক্তি চরিত্রবল ধনসম্পত্তি সবই তুমি পেয়েছ জন্মলব্ধ কবচকুণ্ডলের ম'ত। এ-হেন বলীয়ান্ পুরুষ সর্বার্থসিদ্ধির পথ ছেড়ে দিয়ে আংশিক সিদ্ধির পথ বেছে নেবে কী দুঃখে? তোমার বরণীয় হোক সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ—বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ। তোমার স্মরণীয় হোক—পরোপকারায় সতাং হি জীবনম্। মহাকবি চণ্ডীদাস কি সাধক ছিলেন না? তিনি কী বলেছিলেন?—না, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। জনকরাজার সমান জ্ঞানী কি যোগীঋষিদের মধ্যেও ছিল? শুকদেব যে শুকদেব, তিনিও অনাসক্তিতে তাঁর কাছে হার মানেন নি কি? সব ছাপিয়ে এ-যুগের বিরাট পুরুষ বিবেকানন্দ কি বলেন নি এই সেদিনও:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন—সেই জন সেবিছে ঈশ্বর!

"আনন্দগিরি বললেন: 'আমার বাবা ছিলেন যাকে বলে চতুর ডিপ্লোমাট। তাই সংসারীদের নজির একটিও না দিয়ে জড়ো করলেন শুধুই ত্যাগী তপস্বীদের

উক্তি, কেন না তিনি জানতেন যে, আমি মুনিঋষি যোগী যতি এদেরই ভক্ত, বৈষয়িক বিজ্ঞতার মানা মানবার পাত্র নই। তাছাড়া আমি তখন হাজার মেধাবী হই না কেন, অনভিজ্ঞ যুবক তো—বাবা হ'লেন বহুজ্ঞ প্রবীণ—দুনিয়াদারিতে পাকা। কাজেই এইভাবে দিনের পর দিন আমাকে নানা শাস্ত্রীয় নজির বিধান প্রভৃতি দেখাতে দেখাতে আমার মন দুর্বল ক'রে ফেললেন। আর মন দুর্বল হ'লে যা হয়—দুর্বলতার স্বপক্ষে খাসা খাসা যুক্তি এসে হাজিরি দেয়। মনে হ'ল : তাই তো, দু'তিন বৎসর তো নানা যোগীর ঘাটেরি জল খেয়ে এলাম—অমৃত পরিবেষণ করতে কজন ? গুরুদেবের কথা মনে এলেও ভাবা ছেড়ে দিলাম—বললাম তিনি তো আমাকে বরখাস্তই করেছেন—বার বার লিখলেও একটা জবাব পর্যন্ত দিতে চান না—কেনই বা এ-পরমুখাপেক্ষিতা—নিজের পায়ে দাঁড়ানোই ভালো সবচেয়ে। নৌকোয় একটিমাত্র ফুটো থাকলেও যেমন তাকে বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখা যায় না, তেমনি আমারও একটি মাত্র দুর্বলতার রন্ধ্র দিয়ে হাজারো যুক্তির বানে আমার বৈরাগ্যের হ'ল ভরাডুবি। শুধু একটি দুর্বলতার যুক্তি—যে, আমি মস্ত আধার, ছোট আদর্শের দিকে ধাওয়া করব কী দুঃখে ? হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের মহা ভক্ত হ'য়ে উঠলাম, নিজেকে দিলাশা দিয়ে বললাম : বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়! অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ···ইত্যাদি'। ব'লে বাঁকা হেসে : 'দেখছ ? সেই প্রথম একটিমাত্র কর্মের প্রবাহ ক্রমশই কী ভাবে বিস্ফারিত হ'তে থাকল ? এর পরের ঢেউয়ে এল—না, বলি যথাপর্যায়েই।

'একদিন বাবা বললেন : ওরে, আজ কাশী থেকে আমার একটি বাল্যবন্ধু আসবেন, বড় ভালো লোক। বিকেলে তুই থাকিস।

'আমি কিছু সন্দেহ করিনি। কিন্তু বিকেলে এই ভদ্রলোক এলেন তাঁর মেয়েকে সঙ্গে ক'রে। অষ্টাদশী পরমাসুন্দরী, নাম অনিন্দিতা। মনে হ'ল অনিন্দিতা বটে।

'ওরা চ'লে যাবার দু'চার দিন বাদে বাবা বললেন : মনোরঞ্জনের তোকে বড় পছন্দ হয়েছে। অনিন্দিতারও মত আছে। এবার শুধু তুই মত করলেই হয়। অনিন্দিতা এ-বছর সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করেছে বি, এ,। সংস্কৃতে ফার্স্ট হ'য়েছে। চমৎকার কবিতাও লেখে—মনোরঞ্জন আমাকে পাঠিয়েছে—এই দেখ্ না—ব'লে একটি সুন্দর মরোক্কো-বাঁধানো খাতা দিলেন আমার হাতে।

'আমার বুঝতে আর বাকি রইল না যে, এসব কোনো আকস্মিক যোগাযোগের দরুণ ঘটেনি—এর পিছনে ছিল দুই বন্ধুর যাকে বলে কূট অভিসন্ধি, ছক-কাটা।

কিন্তু তখন আমার মনের দুর্বলতার চরমাবস্থা। মনকে চোখ ঠারলাম: দূর, তা কখনো হয়?

'তবু মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ স্বরকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারি না: করছ কী? অন্তত তোমার গুরুদেবকে জানাও। আমি এ-স্বরকেও আমল দিলাম না, অনিন্দিতার কবিতার বই পড়তে লাগলাম! কী চমৎকার কবিতা। পড়তে পড়তে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

'সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ অপরূপ সংসার-চিত্র ফুটে উঠল চোখের সাম্‌নে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে যাচ্ছি ঠেলতে কোন্‌ মূঢ়তার ফেরে? সব ছাপিয়ে কেবল এই যুক্তি আমাকে শাসাতে লাগল—সন্ন্যাস অপূর্ণতার পথে ঠেলে—গৃহাস্থাশ্রমই হ'ল পূর্ণযোগ। পরদিন সকালে বাবাকে লিখে পাঠালাম—আচ্ছা।

'বাবার বাল্যবন্ধু কাশী ফিরে যাননি—ফের এলেন সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা। কী ব্যাপার? না, পাকা-দেখা—বললেন বাবা। এটুকু বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না যে, বাবা দীর্ঘসূত্রতায় বিশ্বাস করেন না।

'কিন্তু এই একটি কথায় আমার হঠাৎ কেমন যেন বিপর্যয় আতঙ্ক হ'ল: পাকাদেখা! এ যে অতি ঘরোয়া কথা!—হঠাৎ মনের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠল: হায় হায়, সবাই মিলে ফন্দি এঁটে অবোধকে ফেলল সংসারের মায়া-জালে! আমার যেন দমবন্ধ মতন হ'য়ে এল—কিন্তু নিয়তির চক্রান্ত: সেদিন রাতেই পুরুত দিন দিল—বিয়ে হবে সাম্‌নের মাসেই।

"আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'কিন্তু ঠাকুর যাকে কৃপা করেন তাকে জালে পড়তে দেখার সময়ে হাত গুটিয়ে থাকলেও জালে পড়ার পর বোধ হয় শেষ সুযোগ দেন মুক্তির। তাই হয়ত পাকা-দেখা কথাটা শুনতে না শুনতে আমার মন অশান্ত হ'য়ে উঠল। ও-কথাটার সঙ্গে সংসারিয়ানা, মেয়েলিয়ানা ও উলুধ্বনিয়ানা এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, আমার হরিষে বিষাদ এসে গেল হুশ্‌ ক'রে, একেবারে উল্টে গেল মনোভাব: যাকে প্রথম দেখে মন চঞ্চল হয়েছিল, হারাব ভাবতে মনে হয়েছিল হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, তাকে করায়ত্ত জানতে না-জানতে মনে হ'ল সদ্‌গুরুর দীক্ষা পেয়ে এ কী বদ্‌ শিষ্য ব'নে বসলাম! বৈরাগ্যের দৈনন্দিন চাপে যে-মন সংসার সুখের জন্যে লুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল—বিবাহের চিন্তাতাপে সেই মনই ফের বৈরাগ্যমুখী হ'য়ে উঠল সংসারবন্ধনের কথা ভাবতে ভাবতে। রাতে মন এমন অশান্ত হ'য়ে উঠল যে ভাবলাম—ছুটে পালিয়ে যাই যেদিকে দু'চক্ষু যায়। একবার বিছানায় শুই, একবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করি, একবার একটা বই নিয়ে বসি, কখনো বা নাম জপ করি—

কখনো বা ভাবি গুরুদেবকে একটা চিঠি লিখি—এই রকম করতে করতে বাইরে চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশল ভোরের আলো; তখন প্রার্থনায় বসলাম আসনে গুরুদেবের ছবির সামনে ধূপ জ্বালিয়ে। অন্তর মথিত ক'রে প্রার্থনা উঠল: গুরুদেব, বল দাও, আমি অসহায়, মনে জোর পাচ্ছি না জাল ছিঁড়ে বেরুতে।

'এমন সময়ে আমার জীবনে ঘটল একটি সেরা অঘটন—যাকে তোমরা বলো মিরাক্ল। প্রার্থনা করতে করতে কেমন যেন একটা ঘোর মতন এসে গেল—লোকে শুনলে নিশ্চয় বলবে স্বপ্ন, যদিও আমি জানি স্বপ্ন নয়—কিন্তু যাক গে সে-তর্ক কেন না যা ঘটল তাকে যদি স্বপ্নই বলো তাহ'লেও তাকে অঘটন সংজ্ঞা দিতেই হবে—কেন না স্বপ্ন কখনই এমন নিটোল, সুসংবদ্ধ হয় না। মরুক গে—শোনো।

'প্রার্থনায় ব'সে হঠাৎ মনে পড়ল একটি বিখ্যাত স্তবের ধুয়ো: সংসারদুঃখ গহনাৎ জগদীশ রক্ষ—এমন সময়ে দেখি সামনে গুরুদেবের মূর্তি—প্রত্যক্ষ গুরুদেব —কেবল মনে হ'ল তাঁর দেহ যেন রক্তমাংসে গড়া নয়—জ্যোতির নির্যাস দিয়ে তৈরি! যৌগিক পরিভাষায় একে বলে সূক্ষ্ম শরীর, কিন্তু আমার সে-সময় মনে হ'ল যেন গুরুদেব সশরীরে। তিনি বললেন: ভেবে চিন্তে যোগ ক'রে আত্মহত্যাকে যে বরণ করতে চায় তাকে রক্ষা করতে পারে কে?

'আমি বললাম: গুরুদেব, কিন্তু মহামুনি মার্কণ্ডেয়ও যে বলেছেন—গুরুদেব বাধা দিয়ে বললেন: কোনো আপ্তবাক্যকেই তার দেশকালপাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বিচার করা চলে না। দেখতে হবে কাকে বলা হচ্ছে, কোন্ পরিবেশে। কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন:

ত্বন্তু সর্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃগ্ বিচরস্ব গাম্।

তুমি প্রিয় পরিজনকে স্নেহমমতা সব ছেড়ে আমাতে মনোনিবেশ ক'রে পরিব্রাজক হও! আবার অর্জুনকে বললেন:

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

অর্থাৎ, তুমি যদি ধর্মযুদ্ধ-রূপ কর্তব্যসাধনে ব্রতী না হও তবে স্বধর্ম ও কীর্তি ছেড়ে ডুববে পাপের চোরাবালিতে। জ্ঞানীরা নানা লোককে নানা উপদেশ দেন তার স্বধর্ম-অনুসারে।

'আমি বললাম: কিন্তু পিতৃদেব বলছেন—আমার আধার বড়—বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়—গুরুদেব ব্যঙ্গ হেসে বললেন: তাই ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়েও

পুনর্মূষিক হ'তে হবে, এই না? যুক্তি চিরদিন আত্মাভিমানের ওকালতি করে এমনিই কূট চালে। শোন্ বলি: বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় এ-আদর্শ শুধু সংসারীর জন্যেই নয়, সন্ন্যাসীরও আদর্শ সর্বভূতহিতে আত্মনিয়োগ। কেবল তফাৎ এই যে, পরার্থনিষ্ঠার যে ছন্দ সংসারীর স্বধর্ম, সন্ন্যাসীর পক্ষে তা প্রায়ই হ'য়ে দাঁড়ায় বিধর্ম। তাছাড়া মায়াময় সংসারের ও কাব্যময়ী সুন্দরীর মোহে প'ড়ে তুই রাতারাতি ভুলে গেলি এই জাজ্বল্যমান সত্য যে, সংসারী পরহিত করে স্বার্থ বাঁচিয়ে তবে, আর সন্ন্যাসীরা করে সব খুইয়ে সর্বভূতে ভগবানের সেবা করতে! যুগে যুগে, দেশে দেশে জগতের সবচেয়ে বড় হিত কে করেছে?—সন্ন্যাসী। ত্যাগের শুদ্ধির অভয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল আদর্শের ঝাণ্ডা কে উড়িয়েছে?—সন্ন্যাসী! মিথ্যার সঙ্গে রফা ছেড়ে নির্ভেজাল ধর্মের সত্যের দীক্ষা কে দিয়েছে?—সন্ন্যাসী। আমাদের দেশে গৃহীদের মধ্যেও তাঁরাই মহত্তম ব'লে গণ্য হয়েছে যারা বাইরে ভোগী হ'য়েও অন্তরে সন্ন্যাসী, অনাসক্ত যোগী—যেমন জনক, অম্বরীষ, ঋষভ, পরীক্ষিৎ প্রমুখ মহাজন। তুই মহাভারতের কথা বলছিস, কিন্তু তাতে কি একথাও নেই যে কালকেয় দৈত্যরা যখন জগৎ ধ্বংস করবার মতলব আঁটছিল তখন তারা স্থির করেছিল খুঁজে খুঁজে সব আগে তপস্বীদের বধ করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা, যেহেতু তেষু প্রণষ্টেষু জগৎ প্রণষ্টম্—সাধুদের উচ্ছেদ হ'লেই জগতেরো উচ্ছেদ হবে? শোন্: আমি তোর ডাকে সাড়া না-দিয়ে থাকতে পারলাম না ব'লেই এসেছি ঠাকুরের নির্দেশে—তুই পেয়েছিস তাঁর বিশেষ কৃপা—তাই তিনি পাঠালেন আমাকে তোকে শেষবার জানাতে যে, সংসারীর স্বধর্ম তোর পরধর্ম, তোর স্বধর্ম হ'ল—সন্ন্যাস নিয়ে তাঁকে পেয়ে তবে পরার্থব্রতবরণ! তোর বাপের সংসারী-কুযুক্তি তোর কাছে এত বড় হ'ল যে, ভুলে গেলি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যাঁর মতন সত্যিকার মানবহিত এ-যুগে আর কেউ করেনি? তিনি কি বার বারই বলেননি যে, যার স্বধর্ম তার তাই-ই পালনীয়? ভুলে গেলি যে, তিনি যেমন শ্রীম বা গিরিশ ঘোষকে সংসারেই থাকতে বলেছিলেন, তেমনি বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন ত্যাগী হ'তে?

'তিরস্কারের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে আমি নিজের সাফাই গাওয়া শুরু করলাম, বললাম: কিন্তু বিবেকানন্দ কি বলেননি জীবসেবা করতে? গুরুদেব ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললেন: কিন্তু কাকে বলেছিলেন সেটাও কি চোখে পড়ল না তোর? বলেছিলেন তাঁর ব্রহ্মচারী শিষ্যদেরকে যারা সন্ন্যাস নিয়েছিল। তার Song of the Sannayasin কি তুই পড়িসনি? তিনি নিরন্তর গাইতেন

না কি বৈরাগ্যমেবাভয়ম্? সাধকদের কর্ম নিষ্কাম হ'তে পারে না যদি তারা খাঁটি সন্ন্যাসী না হয়—একথা তিনি অগুন্তিবার বলেন নি কি? তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে কিসের দীক্ষা দিতেন শুনি? বিবাহ ক'রে অল্প স্বল্প উদ্বৃত্ত দিয়ে পরোপকার করার, না সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ দেখে তার সেবা করার? তুই এত শত দেখে, শুনেও শেষটায় কুযুক্তির প্ররোচনায় ভুললি রে? তোর অবস্থা দেখে হাসব না কাঁদব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন নি কি যে, সন্ন্যাসীর সংসারে ঢোকা হ'ল নিজের থুথু খাওয়ারই সামিল? তিনি বা বিবেকানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ কবে কোথায় বলেছেন যে, সংসারীরা যে-ধরনের পরহিতসাধনকে বরণ করে, সাধুদেরো স্বধর্ম ঠিক সেই ধরনের পরহিতব্রত?

'আমি বললাম: কিন্তু গুরুদেব, সংসারীরাও কি পরহিত কিছুই করে না—ষোলো কড়াই কানা? তিনি হেসে বললেন: একথা আমি কখন বললাম? সংসারীরা যা ভালো বোঝে করছে, তার ফলাফল তারা পাবে তাদের নিজের নিজের নিয়তি ও কর্মের বিধান-অনুসারে। কিন্তু পরহিতেরো কি থাক নেই? অধিকারিভেদ কি আধ্যাত্মিকতার একটা গোড়ার কথা নয়? মানুষের সর্বোত্তম হিতসাধনের জন্মে ঠাকুর যাদের ডাকেন সর্বত্যাগী হ'তে, আর সংসারীর কানে তিনি যে-পরোপকারীর মন্ত্র দেন—এ-দুই পরার্থনিষ্ঠার মধ্যে তফাৎ কি আশমান জমিন নয়? আমি এতদিন কিছুই বলিনি, কারণ গুরু পারৎপক্ষে জোর করেন না। তোর চিঠিরো উত্তর দিইনি এইজন্যে যে, আমি ভেবেছিলাম তুই সত্যসন্ধানী—প্রথমটায় হাবুডুবু খেলেও শেষে বুঝবি কুযুক্তি কী ভাবে আমাদের চালনা করে কামনা বাসনার ঢালুপথে! কিন্তু যখন দেখলাম যে, মহতী বিনষ্টিকেই তুই পরম আদর্শ ব'লে বরণ করতে চলেছিস, তখন ঠাকুরের কাছে তোর সুমতির জন্যে সপ্তাহকাল প্রার্থনা করলাম। তিনি করুণাময়, তাই আমার প্রার্থনায় দিলেন সাড়া, আদেশ দিলেন—সাধ ক'রে অন্ধ হবার সর্বনাশা প্রবৃত্তি থেকে তোকে বাঁচাতে। মিথ্যার সাথে মিতালি ঢের হ'ল, বেলা যায়—চ'লে আয় এবার! সন্ন্যাসী হ'য়ে ফের সংসারের গোয়ালে মাথা মুড়িয়ে আর গুরুর মাথা হেঁট করিসনি।

'আমার খুব লজ্জা এল, কিন্তু তবু শেষবার একটু আপত্তি করলাম, বললাম: সবই বুঝলাম গুরুদেব, কিন্তু ধরুন যদি আমি চ'লে গেলে বাবা মনঃকষ্টে মারা যান? গুরুদেব বললেন: বাবা, কে কাকে বাঁচায়, কে কাকে মারে? গীতায় অর্জুনকে ঠাকুর কী বলেছিলেন? তবে শোন্—কারণ তোর মনে—এ-দুশ্চিন্তার উদয় হয়েছে কুযুক্তি থেকে নয়, ভালোবাসা থেকে, তাই বলছি—

তোর বাপের মৃত্যু হবে না, তিনি আবার বিবাহ করবেন ও সন্তানও হবে। তবে তোকে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন। তোর বাবা তোকে ভালোবাসেন সত্যি, কিন্তু তার চেয়েও ভালোবাসেন তাঁর বিষয়কে! তাই বংশধর না রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না নিশ্চয় জানিস।—ব'লেই অন্তর্ধান।

"আনন্দগিরি বললেন: 'হঠাৎ কে যেন বন্ধ ঘরের সব কটি জানালা খুলে দিল। আলোর শক্তিতে আমার মন প্লাবিত হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উৎসাহের ঢেউয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ঘরছাড়া ডাকে। ফের এককাপড়ে গৃহত্যাগ করলাম বাবাকে লিখে যে, একবার যে মাথা মুড়িয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে তার পক্ষে বিবাহ ক'রে সংসারাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ মহাপাপ।

"আমি বললাম: 'একটা কথা সাধুজি, আপনার পিতৃদেব কি সত্যই ফের বিবাহ করেছিলেন?"

"আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'হ্যাঁ বাবা—আর শুধু বিবাহ করা নয়—পর পর দুটি ছেলেও হ'ল! তাঁর হাঁপানি সত্ত্বেও আরো চার বৎসর বেঁচে ছিলেন—যদিও আমাকে আর চিঠি লেখেননি একটিও। প্রায় পাঁচ বৎসর বাদে কাকা একটি চিঠিতে লিখলেন—বাবা উইলে আমাকে ত্যাজ্যপুত্র ক'রে সব বিষয় আশয় আমার দুই সৎভাইকে দিয়ে গেছেন।' ব'লে একটু হেসে: 'তাই বলছিলাম বাবা, শুদ্ধি ও অনাসক্তির ব্রতপালন চাট্টিখানি কথা নয়। কত ছলে যে মহামায়া আমাদের বাঁধেন হাজারো অদৃশ্য তন্তু দিয়ে—চোখে দেখা যায় না তাদের, কিন্তু নড়তে চড়তে বেঁধে। আমাদের তনুমনপ্রাণের পরতে পরতে জড়িয়ে কামনা, বাসনা, আব্দার। আর সবচেয়ে মজা এই—যার যেখানে দুর্বলতা ঠিক কি সেইখানেই ফিরে ফিরে আঘাত আসে!—কিন্তু বাবা একটা কথা: এ-সব আঘাত তিরস্কারের বেশে এলেও এর দরুণ যে-বেদনা, জীবনে তার চেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছুই নেই—যার অন্য নাম ভগবৎ-প্রসাদ বা গুরুকৃপা—যাই বলো'।"

অসিত বলল: "আনন্দগিরির জীবনকাহিনী শুনবার সময় আমার মন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেও, তার পরেই দুশ্চিন্তা ও নানান ভয়ভাবনা আমাকে চেপে ধরল। আনন্দগিরি মহা বলীয়ান্ যোগী, জন্মশুদ্ধ, বালব্রহ্মচারী। তিনি না হয় পেরেছিলেন এককথায় সব ছাড়তে, কিন্তু আমার কোথায় সে-মনের-জোর? তবে? কী করব আমি? কোন্ পথ নেব আর কেমন ক'রে দিশা পাব কোন্টা আমার স্বধর্ম?

"তিনচার দিন দিনরাত ভাবলাম আথাল-পাথাল। শেষটায় দেখলাম যেন

সবই গোলকধাঁধা—যেখানে থেকে শুরু করেছিলাম ভাবতে—ভাবনার শেষে যেন ঘুরে ফিরে ঠিক সেইখানেই ফিরে এসেছি, একটুও এগোইনি! চারদিনের দিন রাতে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে মন আরো খারাপ হ'য়ে গেল। ভোর বেলা উঠেই গেলাম ফের আনন্দগিরির কাছে, বললাম: 'সাধুজি, আপনার কথা শুনে প্রথম মনে হয়েছিল—বল পেয়েছি, কিন্তু চিন্তাধারা থিতিয়ে যেতে রইল শুধু ভয়—কে জানে কখন কোন্ পাকে পড়ি? আমার তো আপনার মতন অমন মনের জোর নেই, তাছাড়া গুরুর কৃপাও এখনো পর্যন্ত পাই নি। তাই কী করব ভেবে পাচ্ছি না। কতদিন আর, আপনারি ভাষায়, তীরে ব'সে ঢেউ গুনব? অথচ ঝাঁপ দেবই বা কোন্ অচিন স্রোতে? তাই আমার কাতর অনুরোধ সাধুজি, আপনিই আমাকে ব'লে দিন—কী করতে হবে। আপনি যা বলবেন তাই করব—কথা দিচ্ছি। যদি বলেন আপনার কাছে দীক্ষা নিতে—তাই নেব, কিন্তু আর পারছি না কেবল আগু-পিছু ভাবনায় অনিশ্চিতের মধ্যে কাল কাটাতে। মনে হচ্ছে আমার সময় এসেছে—হোক একটা এসপার-ওসপার। অমলের ডাক এল, শ্যামঠাকুরের ডাক এল—সতীর ডাক এল—এমন কি রহমৎ যে রহমৎ সেও কৃষ্ণের ছবির সামনে গুরুমন্ত্র জপ করা শুরু ক'রে দিল—শুধু আমিই রইলাম যে-তিমিরে সেই তিমিরে? আপনি যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন, আপনার দুটি পায়ে পড়ি।'

"বলতে বলতে আমার চোখে জল এল। আনন্দগিরি আমার মাথায় হাত রেখে খানিক জপ ক'রে কোমল কণ্ঠে বললেন: 'বাবা, আমি তো তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমার গুরু নই—তাই কী ক'রে তোমায় দীক্ষা দিই বলো? গুরু কেউ করে না বাবা, গুরু তিনি করান, এ হ'ল একটি সনাতন সত্য—যার মার নেই জেনো। এইজন্যেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণকে মস্ত আধার জেনেও দীক্ষা দিতে চাননি, বলেছিলেন—ওর গুরু অন্যত্র ওর জন্যে অপেক্ষাও করছেন। গুরুবাদের গুহ্য তত্ত্ব খুব কম লোকই জানে। অনেক সময়ে এমনও হয় যে, গুরুশক্তি গুরুর নিজেরো অজ্ঞাতে শিষ্যকে শুধু দীক্ষা দেওয়া নয়—রক্ষা করে। এ আমি শুধু নিজের অভিজ্ঞতায় নয়—আরো অনেক সাধুর উপলব্ধি থেকে জানি। তাই আমি বলি কি—' ব'লে একটু ভেবে—'আচ্ছা, তুমি আর একবার তুমেলে গিয়ে স্বামী স্বয়মানন্দকে জিজ্ঞাসা করো না কেন? যদি তিনিই তোমার গুরু হন, তবে তিনি এখন নিশ্চয় বলবেন।'

"আমি বললাম: 'কিন্তু তা'হলে তিনি গতবার বললেন না কেন?'

"আনন্দগিরি বললেন: 'গতবার তোমার নিজের মনের মধ্যে হয়ত অনেক

রকম বাধা ছিল। গুরু অনেক সময়ই অপেক্ষা করেন খানিকটা—' ব'লে হেসে—'ঝোপ বুঝে কোপ মারতে—ঠিক সময়ে নিজমূর্তি প্রকাশ করতে।'

"আমি বললাম: 'কিন্তু আমার যে এখন সময় হয়েছে, আন্তর বাধা কেটে গেছে—তাই বা জানব কী ক'রে? না সাধুজি, আমি তুমেলে যেতে পারি—কিন্তু খানিকটা ভরসা পেলে তবেই, নৈলে নয়।'

"আনন্দগিরি খানিক চুপ ক'রে চোখ বুঁজে ব'সে থেকে বললেন: 'হয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা সতীর ঘরে নামকীর্তনের পর তোমাতে আমাতে একটু বসা যাবে।'

"আমি সকৌতূহলে শুধালাম: 'হয়েছে—বললেন কেন? ঠাকুর কি কিছু জানালেন?' আনন্দগিরি সরলভাবে উত্তর দিলেন: 'নৈলে আমি কী ক'রে জানব বাবা? আমি তোমাকে বলিনি কি—আমার নিজের জ্ঞান বা শক্তি বলতে কিছুই নেই, আমি নিতান্তই তাঁর চরণাশ্রিত—তিনি জানালে তবেই জানি, তিনি দেখালে তবেই দেখি!'

"আমি ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এলাম! সন্ধ্যাবেলা গঙ্গার উপর ছায়া নামতে আমার মন যেন আরো বিষণ্ণ হ'য়ে গেল, মনে পড়ল মীরার গান: 'পল পল গিনতে চল গয়া জীবন, সাঁঝকি বেলা আঈ।' অথচ তুমেল রওনা হবার মতন মনের জোরও পাই না: যদি কোনো আশ্রমে থাকতেই হয় তবে আনন্দগিরির আশ্রমই তো ভালো—কলকাতার ভিড় ছেড়ে তুমেলের ভিড়ের মধ্যে পড়তে যাওয়া কেন? তাছাড়া স্বয়মানন্দ স্বামীর জ্যোতির্ময় কান্তি আমার মন টানলেও তাঁর গাম্ভীর্যের কথা ভাবতেও ভয় করত। আমি চিরদিন হাসিখুশি মানুষ—বেশি গাম্ভীর্য দেখলে আমার কেমন যেন দমবন্ধ মতন হ'য়ে আসে। হয়ত এইজন্যেই স্বামী স্বয়মানন্দ আমাকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলেন আমার সময় হয়নি ব'লে—কে জানে? কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে ফুলে উঠতে থাকে—যদি স্বামিজিই আমার গুরু হন তবে সেকথা আমাকে তিনি খোলাখুলি বলেন না কেন? গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ তো সরল ও সহজ হওয়াই উচিত—এতে ঢাকাঢাকির কী আছে? তাছাড়া আমি এত আকুলিবিকুলি ক'রেও কেন মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ পাই না? অমল, শ্যামঠাকুর, সতী—সবাই প্রত্যক্ষ করল গুরুকৃপা—আনন্দগিরির কাছে তো তাঁর গুরুদেব স্বয়ং এসেছিলেন সূক্ষ্ম শরীরে—কেবল আমার বেলাই সব ফাঁকা। আনন্দগিরির একটা কথা মনে পড়ল, তিনি বলেছিলেন একবার যে, যারা আশৈশব বুদ্ধিবৃত্তির অত্যধিক অনুশীলন ক'রে এসেছে, গুরুশক্তি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে সক্রিয় হ'তে বাধা পায় ব'লেই আড়াল থেকে তীরন্দাজি করে। কিন্তু এ কি সান্ত্বনা, না

তিরস্কার? বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, যদি মন্দই হবে তবে এতে এত রস পাই-ই বা কেন? তাছাড়া যে মনঃশীলতা সংসারে প্রতি পদে আসে আলো হ'য়ে, সে আত্মসন্ধানের পথেই বা আঁধার বুনবে কেন? সবচেয়ে আক্ষেপ জাগল ভাবতে যে, আনন্দগিরির চলনবলন, হাসিঠাট্টা, সরলতা, জ্ঞান, দীনতা সবই আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছিল স্বয়মানন্দ স্বামীর ব্যক্তিরূপ দীপ্যমান্ হওয়া সত্বেও তিনি সেভাবে আমার মন টানতে পারলেন না কেন? তাঁর অত্যধিক গাম্ভীর্যের সামনে দাঁড়াতে আমার বুক কেঁপে ওঠে কেন? এইজন্যেই নয় কি যে, তিনি স্বধর্মে জ্ঞানমার্গী কঠোর তপস্বী, যেখানে আমি হলাম স্বধর্মে ভক্তিমার্গী বৈষ্ণব? আমার এ-বিশ্লেষণ যদি ভুল না হয়, তবে তিনিই আমার চিহ্নিত গুরু হ'য়ে আমার অপেক্ষায় আছেন—এ কি সম্ভব? অথচ আনন্দগিরি তো মুখের উপরই আমাকে ব'লে দিলেন যে, আমাকে দীক্ষা দিতে তিনি অক্ষম যেহেতু তিনি আমার নির্দিষ্ট গুরু নন! ভাবতে ভাবতে ছায়াধূসর সান্ধ্য গঙ্গার মতনই মন আমার কালো হ'য়ে এল। আমি উদাস হৃদয়ে একটি গান বাঁধলাম প্রার্থনার সুরে:

বহুদুর্লভ তুমি হে শ্যামল, আপনি না দিলে ধরা,
কে কোথায় কবে শুনেছে তোমার মুরলী মধুস্বরা?
'আয়, আয়' ব'লে ডাকে সে ভুবনে
অনলে অনিলে তারায় তপনে:
জানি—তবু কার কানে বাজে তার মূর্ছনা মনোহরা?
শুধু তার—যার হৃদয়ে আপনি এসে দাও নাথ, ধরা!

যে চায় তোমায় আপন সাধনে ধরিতে চপল সাথী,
মুঠিমাঝে জল সম তুমি দাও ফাঁকি তারে দিনরাতি।
যে চায় বিরহে তোমার চরণে
গভীর শরণ—সে-ই প্রাণে শোনে
তোমার অপার সুরঝংকার প্রেমশিহরণ-ভরা
অকিঞ্চনেরি বল্লভ তুমি—তারে শুধু দাও ধরা।

নয়নের নীরে তাই বঁধু গাই: 'করো মোরে দীনতম,
তনুমন প্রাণ হোক আজি তব চরণের ধূলিসম!
প্রতিভা শকতি গরব-বিভব
করো পদানত, প্রণতি নীরব,
হে ঘন-শ্যামল! অহেতু বরষা হ'য়ে এসো তাপহরা!'
দুর্লভ তুমি জানি—তাই ডাকি: 'করুণায় দাও ধরা!'

"সতী রহমৎকে বলেছিল রজতকে মোটরে নিয়ে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা দেখিয়ে আনতে। কারণ গুরুদেব তাকে ব'লে পাঠিয়েছিলেন—সেদিন সন্ধ্যায় তার পূজাঘরে শুধু আমরা তিনজন থাকব আর কেউ নয়। সতীর ঘরে যেতেই দেখি সে ঠাকুরের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাচ্ছে। বসলাম তার পাশেই।

"একটু বাদেই আনন্দগিরি এলেন। আমি গাইলাম আমার গানটি। গাইতে গাইতে মন আমার উঠল উজিয়ে, আমি আঁখরের পর আঁখর দিয়ে চললাম:

প্রভু জানি না ধর্ম জানি না জ্ঞান,
ভক্তি করেনি শীতল প্রাণ,
দিনে দিনে হায় বেলা ব'য়ে যায়, অন্ধকার ঘনায়.
জানি—আমি দীন, অনাথ মলিন—ঠাঁই দাও রাঙাপায়,
তোমারি চরণ করেছি বরণ, তোমারি তো ভরসায়।

"আঁখর দিতে না-দিতে মনের মধ্যে আমার ভক্তির যেন বান ডেকে গেল: কত তান কত আঁখরই যে সে-জোয়ারে হু হু ক'রে আমার মনের তটে উপচে পড়ল—সে কী বলব: বেদনায় এমন আকুল হ'য়ে বুঝি আর কখনো গাইনি।

"গান শেষ হ'লে, আনন্দগিরির মুখের পানে তাকাতেই দেখি তিনি সমাধিস্থ, মুখে অপরূপ হাসি, চোখ থেকে-গড়িয়ে-পড়া দুফোঁটা জল দুই গালে পঞ্চপ্রদীপের আলোয় চিকচিক করছে।

"কিছুক্ষণ পরে তিনি চোখ মেলতে আমি প্রণাম করলাম। তিনি বললেন: 'আহা! কী গানই গাইলে বাবা! এমন সুরধুনী যার বুকে জেগেছে অকূলমিলন থেকে তাকে ঠেকায় কে?

সতী ও আমি একদৃষ্টে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সব বিষাদ আনন্দে রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে···বুকের মধ্যে তখনো ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছি নিজেরি আত্ম-নিবেদনের।

"একটু পরে আনন্দগিরি আমার দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে শুধালেন: 'দেখতে পেলে না বাবা?—ঠিক তোমার সামনেই?'

"আমার বুকের স্পন্দন উচ্ছল হ'য়ে উঠল, বললাম: দেখতে ঠিক কিছু পাইনি···কেবল—কী বলব···মনে হ'ল যেন কোনো বৈদেহী আবির্ভাব··· তবে হয়ত কল্পনা সবই···'

"আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'এই জন্যেই সেদিন বলেছিলাম বাবা, যে বুদ্ধিবৃত্তির ঢের চর্চা করেছ—আর কেন?'

"আমি বললাম: 'কী ঠিক বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না...'

"আনন্দগিরি গম্ভীর হ'য়ে বললেন থেমে থেমে: 'তিনি এসেছিলেন—স্বয়মানন্দ স্বামী।... হ্যাঁ বাবা...তিনি স্বয়ং...আর তিনিই তোমার গুরু বটে...আজ ঠাকুর আমাকে প্রথম দেখিয়ে দিলেন।'

"যুগপৎ আনন্দ ও ভয়ের আলোছায়া খেলে গেল আমার মনের কূলে। বললাম: 'ঠাকুর দেখিয়ে দিলেন?'

"আনন্দগিরি বললেন: 'হ্যাঁ বাবা। আর তোমার গান শেষ হ'তেই স্বামীজি আমাকে বললেন তোমাকে বলতে যে তোমার সময় এল ব'লে, মা ভৈঃ।'

"আমি বিহ্বল কণ্ঠে বললাম: 'তিনি এসেছিলেন এই কথা বলতে! স্বয়মানন্দ স্বামী নিজে?'

"আনন্দগিরি হাসলেন: 'নৈলে কি আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি বাবা? তবে একটা প্রমাণ চাও, এই না? তিনি তাও দিয়ে গেলেন। বললেন আমাকে বলতে যে তোমার ডান দিকের তলপেটে যে-ব্যথাটা আছে তার জন্যে ভাবনা নেই—তোমার যোগের পথে সে-ব্যথা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তাই আর অপারেশন করাতে হবে না।'

"আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। কারণ এ-ব্যথার কথা আমি শুধু স্বয়মানন্দ স্বামীকে বলেছিলাম—আর কাউকে না। অনেকদিন আগে আমার তলপেটের একটা পেশী ছিঁড়ে যায় মুগুর ভাঁজতে ভাজতে। কেম্ব্রিজের এক সার্জন কাটাকুটি ক'রে সেটা জুড়ে দেন, কিন্তু সারেনি। সম্প্রতি ভাবছিলাম—আর একবার অপারেশন করাব কি না? তবে ব্যথা সামান্য ব'লে গা করিনি।

"আনন্দগিরি হাসলেন: 'উপকার? না বাবা, সাধুজিই বলো বা গুরুজিই বলো—সবাই নিমিত্তমাত্র। মানে, কেউই করবার ম'ত কিছু করতে পারে না—যদি না পিছনে থাকেন তিনি! সদ্গুরু মাত্রেই একথা জানেন।'

"আমি বললাম: 'সবই বুঝলাম সাধুজি, কেবল এই প্রশ্ন কিছুতেই নিরস্ত হ'তে চায় না যে—মাফ করবেন—যদি সদ্গুরু এ সবই জানেন, তবে মুখ ফুটে কিছু বলেন না কেন? এ কী এমন স্টেট-সীক্রেট যাকে ফাঁস করলেই আসবে অরাজকতা?'

"আনন্দগিরি বললেন: 'বাবা, সদ্গুরু যদি শিষ্যের চেয়ে কিছু অন্তত বেশি

না জানেন তবে তিনি দিশারি হবেন কোন্ অধিকারে বলো? তাই গুরুবাদের প্রথম কথা হ'ল মেনে নেওয়া যে গুরু বোঝেন—কোন্ পথে চললে শিষ্যের মঙ্গল হবে। শিষ্য একথা বোঝে না—তাই রাগ করে। কিন্তু সদ্গুরু হাসেন মুখ টিপে। কারণ তিনি জানেন—যে-কথা শিষ্যের অজানা—যে, সময় না এলে দীক্ষা দিতে গেলে দুঃখ বাড়েই, কমে না। তাই ফলটি পাকবার আগে তিনি তাকে বোঁটা থেকে ছিঁড়তে চান না। গুরু হলেন ইষ্টের প্রতিনিধি—যতটা পারেন দুর্গম পথকে সুগম করেন—কেন না এইই হ'ল সদ্গুরুর স্বধর্ম। তাই তিনি অপেক্ষা করেন সেই সুলগ্নের—যখন তিনি দোরে আঘাত করতে না করতে আমরা সাগ্রহে দোর খুলে দেব।' ব'লে একটু হেসে: 'কখনো কখনো অবশ্য এমনও হয়—যাকে ভাগবতে বলেছে, ক্রোধো হি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ, কি না তাঁর ক্রোধের অসহিষ্ণুতাও তাঁর কৃপারই একটা ছদ্মবেশ—তাই কখনো এমনও হয় যে, তাঁকে দোর ভেঙেই ঢুকতে হয় হুড়মুড় ক'রে—যখন তিনি আসেন যুক্তি দিয়ে তুতিয়ে পাতিয়ে লওয়াতে নয়—আসেন মুক্তিসেনানীর মতনই আমাদের ভববন্ধন থেকে ছিনিয়ে নিতে—যেমন—আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তাই তো বলছিলাম বাবা, ঠাকুরের লীলা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায় না—তিনি কখন যে কী করবেন আগে থাকতে কেউ পারে না আন্দাজ করতে। তবে মোটামুটি এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, তিনি পারৎপক্ষে জোর করেন না—যদিও— ব'লে ফের হেসে: 'তিনি কখনো কখনো ছেড়ে দেন তেড়ে ধরতে। আমার গুরুদেব একটা কথা আমাকে প্রায়ই বলতেন হেসে, মনে পড়ে: ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে, বুঝলি?'

বার্বারা বলল: "একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, দাদা! একদিন আপনি বলেছিলেন কথায় কথায় যে, ডুমেল আশ্রমে থাকতে স্বয়মানন্দ স্বামীর মধ্যে আপনি কোনো অলৌকিক শক্তির খেলা দেখেননি। কিন্তু তাহ'লে তিনি সেখান থেকে হরিদ্বারে সূক্ষ্মশরীরে আবির্ভূত হলেন কেমন ক'রে?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "তিনি আমাকে বলেছিলেন: যোগীরা পারৎপক্ষে অলৌকিক শক্তির খেলা বাইরে প্রকট করেন না। কেন-না করলে তার ফল প্রায়ই ভালো হয় না। একে বলে নেপথ্যতত্ত্ব—অর্থাৎ occult phenomena কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমি এখন কিছু বলতে চাই না।"

বার্বারা ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলল: "কেন দাদা? জিজ্ঞাসুর কাছেও কি বলা বারণ?"

অসিত বলল: "বলা ঠিক বারণ নয়। তবে বুঝে সুঝে বলাই ভালো।

কারণ সম্ভব-অসম্ভবের যে সব ধারণা আশৈশব আমাদের মনে গেঁথে গেছে, অলৌকিক শক্তির খেলা সে-সব ওলট-পালট ক'রে দেয়। ফলে হয় আসে অবিশ্বাস, নয় যা-তা বিশ্বাস। দুটোই খারাপ! আমার মধ্যে প্রায়ই আসত অবিশ্বাস! কিন্তু এসব অবিশ্বাস করলে হয় কি—আমাদের অনুভবশক্তির বিকাশ হয় না। অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া আমাদের কাছে প্রকট হয় আমাদের বিকাশের সহায়তা করতেই বটে—কিন্তু সহায়তা করতে পারে তখনই যখন এসব ক্রিয়াকে আমরা ঠিক চোখে দেখতে শিখি। আমার আজন্ম অবিশ্বাসের প্রবৃত্তির দরুণ আমি অনেক দিন পর্যন্ত এই যথার্থ দৃষ্টিশক্তি অর্জন করিনি। তাই, তপতীকে দেখিয়ে, "ও আমার শিষ্যা হ'য়ে আসার পর যখন নানান্ অলৌকিক শক্তির খেলা আমার অনুভব-পরিধির মধ্যে ঢেউ তুলে এল, তখন আমি প্রথমটায় বিহ্বল মতন হ'য়ে পড়েছিলাম। সে-বিহ্বলতা এখন কেটে গেছে বটে, কিন্তু এসব শক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমার এখনো কোনো স্পষ্ট ধারণা গ'ড়ে ওঠেনি! এটুকু বুঝেছি অবশ্য যে, ভাগবতী করুণা আমাদের উপর এসব শক্তির প্রয়োগ করেন আমাদের চোখ খুলে দিতে—এগিয়ে দিতে, কিন্তু আমি এখনো ভালো বুঝতে পারি না কিসে কী হয়। এটুকু বোঝা দরকার আরো এইজন্যে যে, অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান একটু গভীর হ'লে বোঝা যায় বেশি ক'রে—ভাগবতী করুণা কীভাবে আমাদের মধ্যে এসব শক্তির উদ্বোধন ক'রে আমাদের চেতনাকে ঠেলে দেয় ভগবানের পথে। কিন্তু বাইরে এসব শক্তির কথা বেশি বললে কুফল ফলে এইজন্যে যে, বেশির ভাগ শ্রোতাই এসব শক্তিকে ভেল্কি ভেবে পড়ে ফাঁপরে। কেউ বা ভাবে ঠিক উল্টো—অর্থাৎ, অলৌকিক শক্তি বা বিভূতি যাদের নেই তারা আদৌ যোগী নয়! এইজন্যেই নেপথ্যশক্তির সম্বন্ধে যোগীরা প্রায়ই বেশী কিছু বলতে চান না—বুঝলে?"

বার্বারা বলল: "খানিকটা হয়ত আভাস পেয়েছি কিন্তু—"

অসিত বলল: "না, এসব পুরোপুরি বুঝবে কেমন ক'রে? আমাদের একটি বাংলা প্রবচন আছে: যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী! মানে, অচিনকে চিনতে হ'লে তার সঙ্গে বসবাস করতে হয়। তবে আমার কাহিনীর শেষটুকু এবার বলি, তা'হলে হয়ত এ-রহস্য তোমার কাছে খানিকটা পরিষ্কার হ'তেও পারে।"

অসিত বলল: "আনন্দগিরি তাঁর কুটীরে ফিরে যেতে সতীতে আমাতে এ-আবির্ভাব নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। শেষে আমি তাকে বললাম: 'জানো সতী, গুরুদেব আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ভাবতে প্রথম দিকে আমার একটু আনন্দ এসেছিল বটে, কিন্তু এখন যেন হরিষে-বিষাদ!"

"সতী আশ্চর্য হ'য়ে বলল: 'সে কি মামাবাবু? তোমার নির্দিষ্ট গুরুদেবকে জানতে পারলে—তবু বিষাদ?'

"আমি বললাম: 'না, ঠিক বিষাদ নয়। তবে কি জানো? আমার মন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারছে না। এই জাতের আবছা আবির্ভাবকে মঞ্জুর করতে কোথায় বাধছে। মন বলছে মুখভার ক'রে—এই জাতের কুয়াশার ভৌতিক এজাহার কি সত্যিই আমাদের বিশ্বাসকে পাকা করতে পারে? আমি চাই কুয়াশার নয়—কিরণের এজাহার! অতীন্দ্রিয় নানা শক্তি আছে এ যে আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি—তুমি জানো। কিন্তু তবু মনে হয়—যতক্ষণ এ-সব শক্তির খেলা আমার মনের মধ্যে খানিকটা আলো হ'য়ে না নামছে ততক্ষণ আমি—কী ব'লে বোঝাব—মানে, আমি যেন হালে পানি পাচ্ছি না। এক কথায়, মনে হয় এ-ধরণের শক্তি হয়ত চাক্ষুষ না করাই আমার পক্ষে ছিল ভালো।'

"সতী আরও আশ্চর্য হ'য়ে বলল: 'কেন মামাবাবু? গুরুদেব তোমাকে বললেন—তোমার গুরু যে স্বয়মানন্দ স্বামী এ তাঁকে ঠাকুর দেখিয়ে দিয়েছেন। এর পরেও এত শত কিন্তু আসে কোত্থেকে?

"আমার মন আরও খারাপ হ'য়ে গেল। বললাম: 'সতী, তোমার মন সরল, ঋজু। আমার মন—কী বলব?—বাঁকা হয়ত নয়—তবে sophisticated, উল্টোপাল্টায় ভরা। তাই ভাবনা হয় যে, এই ধরণের ধোঁয়াটে আবির্ভাবের উপর নির্ভর ক'রে আমি কি পারব গুরুচরণে আশ্রয় নিতে? আর যদি না-ই পারি তবে বেচারী আমাকে নিয়ে কেনই বা এত টানাছেঁড়া।

"সতী ব্যথিত কণ্ঠে বলল: 'অমন কথা বলে না মামাবাবু। তোমার কিসের অভাব বলো? বিদ্যা জ্ঞান বুদ্ধি রূপ প্রতিভা জনপ্রিয় হবার ক্ষমতা—সবার উপরে তোমার আশ্চর্য আন্তরিকতা—যাকে তোমার শত্রুরাও স্বীকার করে—কী নেই তোমার? বিধাতা তোমাকে এত দিয়েছেন কি তোমাকে শেষমেশ ব্যর্থতার পথে টানতে? তোমার সহচর্যে কত লোক প্রেরণা পায়, তোমার গানে সাধুরাও আনন্দ পান, সমাজ তোমার কাছে কত আশা করে—সব জড়িয়ে, তোমার চেনা ও অচেনা কত লোকের তুমি যে কত বড় আশ্রয় তুমি নিজে হয়ত টের পাও না, কিন্তু তারা তো জানে।' ব'লে একটু থেমে: 'আমার কেবল একটা দুঃখ জাগে মামাবাবু—তোমার এখনো নিজের 'পরে বিশ্বাস এল না কেন? কেন চিনতে পারলে না নিজেকে? তবে এবার নিশ্চয় পারবে—গুরুলাভ যখন হ'য়ে গেল, তখন আর ভয়ের কী আছে?'

"আমি হাসলাম: 'ভয়ের কী আছে? বলো কী, সতী? গুরু এলেন, কাছে এসে দাঁড়ালেন, অথচ আমি তাঁকে দেখতে পেলাম না—অপরের কথায় মেনে নিতে হচ্ছে যে, তিনি এসেছিলেন—এ কি ভরসার কথা? আমার মনে কেবলই আক্ষেপ জাগে, তিনি যদি আমার কাছে আসতেই পারলেন, তবে প্রকাশ হ'তে পারলেন না কেন? মানুষের একটি চিরন্তন প্রার্থনা, আবিরাবীর্ম এধি—কি না—হে চির-স্বপ্রকাশ, আমার কাছে গোপন থেকো না আর! গুরু-বাদের সত্যকে আমি বিশ্বাস করি ব'লেই তো মনে হয়। কিন্তু আমার এ-বিশ্বাসের মূল্য কতটুকু যতক্ষণ না সে-সত্য আমার মনের কাছে প্রকাশ হচ্ছে? সেই গানটি আজ আমার কেবলই মনে পড়ছে: সে যে কাছে এসে বসেছিল তবু জাগিনি—কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী! তিনি এলেন অথচ আমি চিনতে পারলাম না! কেন পারলাম না? আমি জাগিনি ব'লেই তো। পাব কবে? জাগব যবে! অর্থ্যাৎ যখন সময় হবে। তা'হলে? কী করব এখন? বিশ্বাসের উপর ভর ক'রে জাগার মাহেন্দ্রলগ্নের জন্য চেয়ে ব'সে থাকব? না সতী, অতটা পারব না। বিশ্বাসকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু অন্ধভাবে নয়—খানিকটা অন্তত প্রমাণ চাই! এ-মনোভাব আমি কাটিয়ে উঠতে শুধু যে পারি না তাই নয়—চাইও না। তাই চেষ্টা করতেই হবে যাতে অপ্রকাশ আমার কাছে প্রকাশ হন। অথচ কী ভাবে চেষ্টা করব—সাধুজি বলছেন কই? বলছেন—গুরু আমাকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেটা তো সবচেয়ে বড় কথা নয়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল আমি তাঁকে বরণ করতে পারব কবে? হাজার নেশা, কামনা, বাসনা, আত্মাভিমানের ঘুমে আমি নেতিয়ে। তিনি কাছে এসে বসলেও এ-কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে না, তবু বলছ—ভয়ের কী আছে? সময় যে চ'লে যাচ্ছে। একজন জ্ঞানী বলেছেন সময় হ'ল ক্ষেত, তাতে যদি বীজ বুনি ফসল ফলবেই, কিন্তু যদি না বুনি? তা'হলে রামপ্রসাদের সুরে সুর মিলিয়ে কান্নাই সার হবে নাকি—

মন তুমি কৃষিকাজ জানো না:

(এমন) মানব জমি রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।

এ হেন সোনামুখী জমি হাতে পেয়েও আবাদ করতে পারছি না—তবু বলছ ভরসায় বুক বাঁধতে?'

"সতী আমার মুখে এ-ধরণের অবসাদের কথা শুনে দুঃখ পেত আরো এইজন্যে যে, ওর নিজের অবসাদ সম্পূর্ণ কেটে গিয়েছিল। তাই ও চাইত আমাকে ভরসা দিতে। কিন্তু—যেকথা আনন্দগিরি প্রায়ই বলতেন—ধর্মের পথে একজনের পাসপোর্ট আর একজনের কাজে আসে না—সে আর একজন তার যতই প্রিয়

হোক না কেন। শুধু তাই নয়, ওর মনঃকষ্টের রাত পোহাল, অথচ আমি রইলাম যে-তিমিরে সে-তিমিরে—ভাবতে স্নেহময়ী মেয়ে মাঝে মাঝেই চোখের জল ফেলত, প্রার্থনা করত ঠাকুরের কাছে যেন আমার বিশ্বাস আসে, পথের দিশা মেলে।

"মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায় এলো দিশা—কিন্তু অভাবনীয় রূপে। শুধু ঘটনার দিকে থেকে অঘটন ব'লেই নয়,—আমার মনে তার ছাপ' পড়লও এমন বিচিত্র ভাবে—কিন্তু বিষ্কম্ভক রেখে এবার নাট্যলোকে নামি।"

অসিত বলল: "সেদিন ভোরবেলা আমি গঙ্গাস্নান করতে সবে বেরিয়েছি—এমন সময় একটি মোটর এসে থামল ঘাটের সামনেই! নামল অরুণ! কিন্তু এ কী চেহারা? চুল উস্কখুস্ক, তিনচার দিন ক্ষৌরি হয়নি, সে-ফিটফাট সাহেবি বেশও নেই। পরনে শুধু ধুতি পাঞ্জাবি, আর গায়ে একটি ধোসা। চমকে উঠলাম বৈকি!

"ও মোটর থেকে নেমেই আমাকে প্রণাম করল। বলল: 'আর পারলাম না মামাবাবু, সতীকে নিতে এসেছি।' আমি অবাক্ হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও বলল ম্লান হেসে: 'ভাবছেন আমি পাগল হ'য়ে গেছি? না মামাবাবু, পাগল হ'তে পারিনি এখনো—যদিও হ'লেই হয়ত ছিল ভালো, কারণ কে বলবে সংসারে পাগলই একমাত্র সুখী নয়—সে ছাড়া আর কে পেরেছে দায়িত্ববোধ থেকে মুক্তি পেতে?' আমি বললাম: 'ব্যাপার কী অরুণ? কী হ'ল হঠাৎ?' ও বলল: 'হঠাৎ হয়নি মামাবাবু, হয়েছে অনেকদিনই, কেবল আমি খবর পেলাম হঠাৎ। আমার এক ইংরেজ বণিক্ বন্ধু রাওলপিণ্ডিতে আছেন আজ দশ বৎসর। আমার পক্ষে রাওলপিণ্ডি যাওয়া নিষ্ফল ব'লে মাসতিনেক আগে তাঁকে লিখেছিলাম আমার মা, বোন ভগিনীপতির খবর নিতে। বহু খোঁজাখুঁজির পর তিনি আমার মরণাপন্ন বোনের খোঁজ পেয়ে তাকে গুণ্ডাদের কাছ থেকে অতিকষ্টে উদ্ধার ক'রে এনে আমাকে তার করেন—তাকে অমৃতসরে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি অমৃতসরে যাই ছুটে। গিয়ে দেখি আমার বোন শয্যাশায়ী—রক্তস্রাবে। মুসলমানেরা ওর উপর পাশবিক অত্যাচার ক'রে উরুতে জলন্ত আংটা দিয়ে দেগে দেয়। ও রাওলপিণ্ডিতেই মারা যেত যদি আমার ইংরেজ বন্ধু ওকে উদ্ধার ক'রে অমৃতসরে না আনতেন নিজের মোটরে। আমি অমৃতসরে পৌঁছবার পর দিনই সে একটি মরা শিশুর জন্ম দিয়ে এজগৎ থেকে বিদায় নেয়। তার মুখে শুনলাম—আমার মা ও ভগিনীপতি দুজনকে ওরা আমার বোনের চোখের সামনেই মেরে ফেলে।'

ব'লে চোখের জল মুছে: 'আমি তাই সতীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি—ভগবানকে নিয়ে ভাববিলাস ঢের হয়েছে।'

"আমি বললাম: 'তুমি উত্তেজিত হয়েছ অরুণ—আগে আশ্রমে জিরিয়ে একটু সুস্থির হও—' ও চেঁচিয়ে ব'লে উঠল: 'না মামাবাবু, কোনো আশ্রমে আমি তিষ্ঠুতে পারব না। আমি এখুনি সতী আর রজতকে নিয়ে যাব আমার মোটরে। বলতে বলতে ওর সুর উঠল আরো চড়া পর্দায়: 'ভগবান! ভগবান! ভগবান! ভগবান যদি থাকতেন তবে আমার অমন সোনার প্রতিমা বোনের—' বলেই থেমে—'না, তর্কাতর্কির সময় আর নেই। ধর্ম ধর্ম ক'রে চোরাগলিতে ঘোরাঘুরির যুগ কেটে গেছে! মানুষের মুক্তি তার নিজের কীর্তিতে—আকাশ-পারের কোনো নাস্তি-দেবতার কাছে কাকুতি মিনতিতে নয়! আমি সতীকে আর রজতকে নিয়ে যাবই যাব—এ পাপ আশ্রম থেকে—যেখানে মিথ্যার উপাসনা হয়।

"এমনি সময়ে একটা ছোট্ট ফুটবল দম্ ক'রে আমাদের মধ্যে এসে পড়ল। আমরা একযোগে ফিরে তাকাতেই দেখি আনন্দগিরি রজতের সঙ্গে ছুটছেন হাসতে হাসতে। দুজনে দেখতে দেখতে আমাদের কাছে আসতেই রজত অরুণকে দেখে লাফিয়ে উঠে চিৎকার: 'বাবা! বাবা!—ও মা! মা গো! দেখ কে এসেছে! বাবা!!'

"চিৎকার শুনে সতী সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অরুণের সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'তেই সে 'দাঁড়াও আসছি' ব'লেই অদৃশ্য। আনন্দগিরির উপরে চোখ পড়তেই অরুণ মুখ ফিরিয়ে নিল। আনন্দগিরিকে বললাম: 'অরুণ।' আনন্দগিরি বললেন: 'বেশ বেশ। তা—চলো ভিতরে একটু জিরিয়ে—'

অরুণ রুক্ষ সুরে বলল: 'না, আমি এখানে জিরুতে আসিনি। আমি এসেছি আমার স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে যেতে। ঢের সয়েছি—আর—'বলতে বলতে সতী।

"সতী কাছ থেকে অরুণকে দেখেই সভয়ে ব'লে উঠল: 'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার? কী হয়েছে?' রজত বাধা দিয়ে অরুণের হাত ধ'রে চেঁচিয়ে উঠল: 'এ কী বাবা? দাড়ি কামাওনি কেন? তোমার স্যুট কই? সাহেব কখনো ধুতি পরে?'

"অরুণের মুখ কোমল হ'য়ে উঠল, সে নিচু হয়ে রজতকে জড়িয়ে ধরে বলল: 'তোর বাবা কি সাহেব, না ভেতো বাঙালী?'

"আনন্দগিরি কোমল কণ্ঠে বললেন: 'এসো বাবা, ঘরে এসো! বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।'

"অরুণ ওঁর মধুর কণ্ঠস্বরে যেন চমকে উঠল। কিন্তু তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সতীর দিকে তাকিয়ে বলল: 'চলো আমার সঙ্গে ফিরে—এক্ষুনি।' আমি সতীকে বললাম: 'বড় দারুণ খবর, সতী! তোমার শাশুড়ী, ননদ, নন্দাই সবাইকে মুসলমানেরা মেরে ফেলেছে।'

অরুণ তপ্ত সুরে বলল: 'সবটা বলুন মামাবাবু। শুধু মেরে ফেলা? যা ঘটেছে তা কি ঘটতে পারত যদি দয়াময় ভগবান্ ব'লে কেউ থাকতেন এজগতের কর্ণধার হ'য়ে? না সতী, আমার দুর্গাপ্রতিমার মতন অমন বোন পশুর অত্যাচারে মরা ছেলের জন্ম দিয়ে অকালে মরেছে—আর তোমার করুণাময় ভগবান্ আকাশ থেকে চুপ ক'রে চেয়ে দেখেছেন—হয়ত হেসেছেনও—কে বলতে পারে? লীলাময়ের কোন্‌টাই বা লীলা নয় বলো?'

"আনন্দগিরি অরুণের কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন: 'বাবা, আগে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে—'বলতে না বলতে চক্ষের নিমেষে অরুণ তাঁর হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল: 'যাও—যাও, ঢের হয়েছে সাধুপনা!'

"মুহূর্তে সতীর মুখ টকটকে লাল হ'য়ে উঠল, বলল: 'কী বলছ পাগলের মতন?' চেঁচামেচি শুনে রহমৎ ছুটে এল। অরুণ উত্তপ্ত সুরে বলল: 'এ কী! এখানেও মুসলমান?' আনন্দগিরি স্নিগ্ধ হেসে বললেন: 'এখানে হিন্দু মুসলমান কেউ নেই বাবা, শুধু আছে একজাতের লোক—যারা ঠাকুরের ছোঁওয়ায় জাত খুইয়েছে।

"অরুণ পা দাপিয়ে বলল: 'তুই থাম্ ভণ্ড বুড়ো! যত নষ্টের গোড়া!'

"সতী আর থাকতে পারল না, বলল চেঁচিয়ে: 'রহমৎ! হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কী দেখছ গুরুদেবের অপমান? এখুনি ওকে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দাও। দাও—এই মুহূর্তে—না গুরুদেব, আমি কোনো কথা শুনব না। ও আমার কেউ নয়—যে আপনার অপমান করে।' অরুণ রুখে বলল: 'কেউ না? আমি তোমার স্বামী, তোমাকে নিতে এসেছি।' সতীর মুখ আরো রাঙা হয়ে উঠল, বলল: 'নিতে এসেছ? মানে? আমি কি তোমার বাঁদী নাকি? আমি কারুর দাসী নই—এক গুরুদেবের ছাড়া। তুমি যদি ভালো চাও তো এখুনি বেরিয়ে যাও বলছি মানে মানে!'

"অরুণ ক্ষেপে উঠল: 'বেরিয়ে যাবো? আমি—আমি—'

"আমি ওকে বললাম: 'অরুণ! বাইরে দাঁড়িয়ে এ কী কেলেঙ্কারী করছ বলো তো? তুমি স্বভাবে ভদ্র—যদি সতীকে নিয়ে যেতেই চাও—'

"সতী বাধা দিয়ে বলল: 'কী বলছ মামাবাবু? আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে কে শুনি? ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ তো বহুদিনই চুকিয়ে দিয়েছি।'

"অরুণ সব্যঙ্গে বলল: 'সতী নাম সার্থক হয়েছে বটে! কিন্তু তুমি যেতে না চাও থাকো অন্ধ হ'য়ে—কিন্তু আমার ছেলেকে—'

"সতী বলল: 'ছেলের অধিকার কে পাবে সে আদালতে ঠিক হবে। আমি দেখব আদালত কী বলে—ছেলের অধিকার কার—যে মা ভগবানের দাসী তার, না, যে বাপ সাধুর অপমান করে তার।' ব'লেই রহমৎকে: 'কী দেখছ রহমৎ? আমি বলছি—তুমি ওকে ঘাড় ধ'রে বের করে দাও—না গুরুদেব, আপনি কোনো কথা কইবেন না—এ-পাঁকের মধ্যে আপনি নামবেন না। আপনি যান—আমি ওর ব্যবস্থা করছি।'

"এতক্ষণে রহমতের সাড় এল, সে কাছে এসে অরুণের বাহুমূল ধ'রে বলল: 'আসুন বাবুজি, আপনাকে মোটরে তুলে দিই।' অরুণ ওর হাত ধরে এক ঝটকা দিতেই রহমৎ ওর দুই কব্জি নিজের বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধ'রে চক্ষের নিমেষে পিছমোড়া ক'রে ঠেলতে ঠেলতে মোটরের দিকে নিয়ে চলল।

"রঞ্জিত এতক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, এখন ওর বাবার অবস্থা দেখে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। সতী ওকে কোলে তুলে নিয়ে বলল: 'চলো মণি, ঘরে চলো!' এসব ঘটনা বলতে সময় যাচ্ছে কিন্তু ঘটতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগেনি। অরুণ যন্ত্রণায় চিৎকার ক'রে উঠতেই আনন্দগিরি শান্ত দৃঢ়স্বরে বললেন: 'ওকে ছেড়ে দাও।' রহমৎ ওকে মুক্তি দিতেই তিনি দু'পা এগিয়ে ওর দু'কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: 'চলো বাবা, আগে ভিতরে গিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বোসো—একটু জিরোও—তার পরে যদি সতীকে নিয়ে যেতে চাও তো নিয়ে যেও—যদি ও যেতে চায়। এতে রাগারাগির কী আছে বলো তো? তুমি তো শিশু নও, বাবা! তবে আঘাতটা হঠাৎ এসেছে কিনা তাই এত বেজেছে—বুঝতে পারছ না কী করছ, কী বলছ।' ব'লেই ওর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কোমল কণ্ঠে বললেন: 'মা লক্ষ্মীর কথায়ও কিছু মনে কোরো না বাবা। গুরু তো তুমি এখনো করোনি, তাই জানো না গুরুকে অপমান করলে শিষ্যদের মনে কতখানি লাগে!'

"অরুণের মুখ চোখ যেন কেমন হয়ে গেল! ও খানিকক্ষণ বিহ্বলের মতন আনন্দগিরির মুখের দিকে চেয়ে রইল? তার পরই ওর চোখে নামল ধারা। গুরুদেব ওর মাথায় হাত রাখতেই ও দুহাতে মুখ ঢাকল। সঙ্গে সঙ্গে ওর গলা থেকে কি একরকম ঘড় ঘড় শব্দ বেরুল, দেহ এলিয়ে পড়ল। আমরা ওকে ধরতেই

আনন্দগিরি বললেন: 'আহা! বড় দুঃখ পেয়েছে! ওকে নিয়ে তোলো সতীর নিচের ঘরে।'

"বলতেই রহমৎ আমাকে বলল: 'আপনি ছেড়ে দিন মামাবাবু, ব'লেই মূর্ছিত অতিথিকে অবলীলাক্রমে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে ঢুকল সতীর বাড়ির নিচের তলায়। বলেছি রহমতের পাশের ঘরটা সতী সাজিয়ে রেখেছিল অতিথিদের জন্যে। সেই ঘরে পাতা বিছানার উপরেই রহমৎ ওকে শুইয়ে দিল। আনন্দগিরি সতীকে বললেন: 'তুমি ওর শিয়রে বসে ওকে হাওয়া করো মা, আমি হরদয়ালকে নিয়ে এলাম ব'লে।' রহমৎ বিহ্বল রজতকে নিয়ে বাইরে চ'লে গেল।

'হরদাল ছিল বিলেতের পাশ-করা ডাক্তার, বলেছি। একটু বাদে তাকে সঙ্গে ক'রে আনন্দগিরি ঘরে ঢুকলেন। সে অরুণকে পরীক্ষা ক'রে গম্ভীর মুখে বলল: 'ভয়ের কারণ আছে! অ্যাপোপ্লেক্সি। এই যদি প্রথম স্ট্রোক হয় তাহলে এযাত্রা বেঁচে যেতেও পারে। এর কোনো ওষুধই নেই কেবল ওকে শান্ত রাখা—মানে যতক্ষণ জ্ঞান না ফিরে আসে। হয়ত আসবে ঘণ্টাখানেক পরে।' ব'লে শুধু মাথায় বরফ দেবার ব্যবস্থা করে সে চ'লে গেল!

"ঘণ্টা দুই বাদে অরুণের জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু দেখা গেল—ওর বাঁ দিকের মুখ ঈষৎ বেঁকে গেছে, বাঁ হাত বাঁ পা অচল! সতী কেঁদে বলল: 'কী হবে গুরুদেব?'

"আনন্দগিরি সতীর মাথায় হাত রেখে বললেন: 'ছি মা! তুমিও অধীর হচ্ছ?'

"সতী চোখ মুছে ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: 'না গুরুদেব, অধীর হব না। কিন্তু এ কী হল ওঁর?'

"আনন্দগিরি উপরের দিকে হাত তুলে বললেন: 'সবই তাঁর ইচ্ছা মা—আমরা কি জানি কিসে কী হয়?—কিন্তু এসব সাত পাঁচ দুভাবনা ছেড়ে তুমি কেবল প্রার্থনা করো তাঁর কাছে—যিনি অগতির গতি। আমরা কী-ই বা পারি বলো—তিনি না পারালে?'

"অসিত বলল: 'সে-রোগযন্ত্রণার খুঁটিনাটি বর্ণনার দরকার নেই। শুধু বলা—সতী, আমি ও রহমৎ মিলে ওর পাশে রইলাম—সারাদিন সারারাত! পরদিন অরুণ প্রথম কথা কইল বেলা বারোটার সময়ে। আমি আর সতী তখন ওর বিছানার দুপাশে ব'সে! অরুণ ঘোলাটে চোখে সতীর পানে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল: 'সতী!' সতী ওর মুখের 'পরে ঝুঁকে বলল: 'এই যে

আমি।···কিছু খাবে?' ও মাথা নাড়ল: 'বড় কষ্ট সতী···মাথার মধ্যে।' একটু পরে থেমে থেমে: 'আমাকে···ক্ষমা···সতী···আমি···সাধুর অপমান করেছি···তাই···এ-শাস্তি।' সতী আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি আনন্দগিরিকে খবর দিলাম। তিনি তাঁর কমণ্ডলুটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে এসে বসলেন ওর শিয়রে। অরুণ খানিক পরে চোখ মেলে বলল: 'একটু জল!' আনন্দগিরি তাঁর কমণ্ডলু থেকে এক চামচে গঙ্গাজল ওর মুখে দিয়ে বললেন: 'এবার একটু কমলালেবুর রস খাবে বাবা? কাল থেকে কিছু খাওনি তো।' অরুণ ক্ষীণকণ্ঠে 'দিন'—ব'লেই চোখ বুঁজল।

"পরদিন সকালে অরুণ যখন চোখ মেলল তখন চোখের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গেছে। দুপুরবেলা অরুণ ক্ষীণ কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল: 'সাধুজিকে একবার ডাকবে সতী?'

"আমি গিয়ে আনন্দগিরিকে নিয়ে এলাম সঙ্গে ক'রে। অরুণ বলল: 'সাধুজি, আমার অপরাধের কথা আর কী বলব? আমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম।···ক্ষমা করবেন কি পাপিষ্ঠকে?'

"আনন্দগিরি ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন: 'ক্ষমা কে কাকে করে বাবা? শুধু ঠাকুরকে ডাকো।' অরুণ ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: 'আমার কি ভগবানে বিশ্বাস আছে যে ডাকব?'

"আনন্দগিরি বললেন: 'আছে বাবা: আমাদের জন্মের সঙ্গে যেমন তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা কৌতূহল স্নেহ প্রীতি দিয়েছেন, তেমনি বিশ্বাসও দিয়েছেন বীজরূপে—তাকে একটু লালন করলেই দেখবে তার চারাগাছ দেখা দেবে শ্রদ্ধা হ'য়ে—এই শ্রদ্ধাকে লালন করলে যে ভক্তিফুল হ'য়ে ফোটে—ভক্তিকে লালন করলে সে প্রেমফল হ'য়ে ফলে।'

"অরুণ বলল ম্লান হেসে: 'আমি যে জানি না সাধুজি, কী ক'রে এসবকে লালন করতে হয়?'

"আনন্দগিরি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিশফিশ ক'রে একটি মন্ত্র বললেন। তারপর বললেন: 'এই নামটি জপ করো। এরি নাম লালন। মানুষ সবই পেতে পারে বাবা—এই নামকল্পতরুর কাছে চাইলে!'

"অরুণ বলল: 'একথা শুনেছি অনেকবারই সাধুজি, কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে! মনে হয়—শুধু নাম জপ ক'রে সব মিলবে—বস্তুলাভ কি এতই সহজ? দাম না দিয়ে পাবার মতন কিছু পাওয়া?'

"আনন্দগিরি হাসলেন, বললেন: 'নামজপকে যতটা সহজ ভাবছ বাবা,

সে ঠিক ততটা সহজ নয়। কারণ যতদিন নাম হৃদয়ে না জেগে ওঠে—জপে মন বসতে চায় না—আর যাতে মন বসেনি তাকে নিয়ে ঘর করা যে কত কঠিন বুঝতে পারো না কি? আসলে নামজপকে কেন তপস্যা বলা হয়—শুনবে? জপ যখন দিনের পর দিন নীরসই থেকে যায় তখন অবিশ্বাস হু হু ক'রে বাড়তে থাকে। তাই জপ হ'য়ে দাঁড়ায়—যেন অবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াই। আর নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের চেয়ে বড় দাম মানুষ কী দিতে পারে? আমরা বাইরের জগতেও যেমন যা কিছু পাই লড়াই ক'রেই পাই—তেমনি অন্তর-জগতে। নাম বলো, ধ্যান বলো, প্রার্থনা বলো, আসন প্রাণায়াম শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন—সবই এক আন্তর যুদ্ধের রূপভেদ। তবে এইখানে হয়ত বেচারি অকেজো সাধুরা একটু কাজে আসেন, কেন না ঠাকুর তাঁদের একটু আধটু শক্তি দিয়ে থাকেন এই আন্তর জগতে শ্রদ্ধা জাগাবার—পরম সার্থকতার দিশা দেবার। তাই তোমাকে এ-মন্ত্র দিলাম—জপ ক'রে দেখই না, ফল পাও কি না।'

এর পর থেকে অরুণের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন সবারই চোখে পড়ল। চুপ ক'রে শুয়ে থাকে, বেশি কথা বলে না—শুধু দেখি ওর ঠোঁট নড়ছে। বুঝি জপ করছে। এই ভাবে দিন দশ পনের যেতে না যেতেই ওর মুখের মেঘ অনেকটা কেটে গেল—শরীরেও বল এল একটু! কেবল বাঁদিকের পক্ষাঘাত ঘুচল না—শয্যাশায়ী হ'য়েই রইল। ও মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দুমাসের ছুটি নিয়েছিল আগেই।

"প্রায় তিন সপ্তাহ পরে অরুণ আমাদের সাহায্যে উঠে বসল বালিশে হেলান দিয়ে। বলল: 'মাথার মধ্যে বেশ সহজ বোধ করছি।' আনন্দগিরি খবর পেয়ে পাশে এসে বসলেন। অরুণ ওর ডান হাত দিয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে বলল: 'যে-অপরাধ করেছি গুরুদেব—তার শাস্তি ঠিকই হয়েছে··· কেবল আশীর্বাদ করুন যেন এই অনুতাপ স্থায়ী হয়।' এই প্রথম ও আনন্দগিরিকে 'গুরুদেব' বলে ডাকল। সতীর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল: 'গুরুদেব, ওকে আশীর্বাদ করুন শুধু। তাহলেই সব আপদ কেটে যাবে।' আনন্দগিরি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন: 'আশীর্বাদ কে করতে পারে মা···শুধু সেই একজন ছাড়া? আমরা শুধু আশীর্বাদ পাবার পথের খেইটি ধরিয়ে দিই বৈ তো নয়।' অরুণ গাঢ়কণ্ঠে বললেন: 'না গুরুদেব পাপীকে দিন আপনার পুণ্য হাতের স্পর্শ—আর আশীর্বাদ করুন যেন আমার ভগবানে বিশ্বাস আসে। নৈলে এখন আর কী নিয়ে থাকব বলুন? কুতর্কের শূন্যতার মধ্যে বহুদিন কাটিয়েছি···যদি আর সেরে না-ও উঠি

দুঃখ নেই—কারণ বাঁচার সাধ এখনো থাকলেও লোভ নেই। যদি দিন আমার ফুরিয়েই এসে থাকে তবে খেদ নেই, কেবল কিছু পারানি না নিয়ে অজানা পথে পাড়ি দিতে এখনো ভয় করে।'

"আনন্দগিরি বললেন: 'তুমি সেরে উঠবে বাবা! কেবল নামটি ছেড়ো না। যা যা চাইছ সবই পাবে যদি শুধু ঐ নামটিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পারো।'

"অরুণ ফের ম্লান হাসল: 'সবই পাব কি না জানি না গুরুদেব, তবে এই নামের মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস পেয়েছি এটুকু এখনই বলতে পারি—পেয়েছি এই উপলব্ধি যে, সংসারে যে-সব রঙিন আশা আকাঙ্খার নেশায় আমরা অন্ধভাবে চলি—সে কাটেই কাটে—কেবল দুদিন আগে, নয় দুদিন পরে। আমার আজকের প্রার্থনা—এ-নেশা যেন একটু তাড়াতাড়ি কাটে—আর···যদি সম্ভব হয় গুরুদেব—তবে এ-জগত থেকে বিদায় নেবার আগে যেন পাই সেই বস্তুর একটুখানি দিশা যা···যা সতী পেয়েছে বহুভাগ্যে।'

"আনন্দগিরি প্রসন্ন হেসে বললেন: 'বাবা, তোমার নেশা কেটেছে—এবার দিশাও পাবে যদি ঐ নামটি না ভোলো।'

অসিত বলল: "আরো দশ পনেরো দিন যেতে অরুণ বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠল, কেবল বাঁদিকে পক্ষাঘাত ছাড়া। উঠে বসতে পারে আপনা আপনি, ডান হাত ডান পা ব্যবহারও করতে পারে, কেবল বাঁ দিকটা অসাড়ই রয়ে গেল। একদিন সতী আনন্দগিরির পায়ে মাথা রেখে খুব কাঁদল: 'আহা, এ কী হ'ল গুরুদেব? বাকি জীবনটা কি তাহ'লে মানুষটার এমনি পঙ্গু হয়েই কাটবে! এর চেয়ে যে সব শেষ হয়ে যাওয়াই ছিল ভালো।'

"আনন্দগিরি বললেন: 'অমন কথা বলে না মা! ঠাকুরের কাছ থেকে যা-ই আসে বরণ করে নিতে হবে—এইই হল আত্ম-সমর্পণের গোড়াকার কথা।'

"সতী মাথা তুলে চোখ মুছে বলল: 'আশীর্বাদ করুন গুরুদেব—যেন এ পারি। কিন্তু ওঁকে যখন দেখি অসহায়ের ম'ত বিছানায় শুয়ে আর ভাবি যে, হয়ত আর কোনোদিন উঠে হেঁটে বেড়াতে পারবেন না—তখন মনে যে কী অবসাদ ছেয়ে যায়···ব'লে আবার চোখ মুছে: 'আচ্ছা গুরুদেব, আপনি তো ঠাকুরের কাছে শক্তি পেয়েছেন। তবে কেন ওঁকে তাঁর নামে আশীর্বাদ করতে পারবেন না—যেন উনি পঙ্গু হ'য়ে না থাকেন?'

"আনন্দগিরি বললেন: 'সদ্‌গুরু অমন আশীর্বাদ করে না মা। সে ঠাকুরের উপরই সবকিছু ছেড়ে দেয়।'

"আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম: 'কিন্তু কত সাধু তো কঠিন রোগও আরাম করতে পারেন আশীর্বাদের জোরে?'

"আনন্দগিরি বললেন: 'পারেন—কেবল যখন ঠাকুর পারান তখন! আমরা চর্মচক্ষে দেখি অবশ্য যে, সাধুরা পারলেন—কিন্তু সাধুরা জানেন এ-পারার কৃতিত্ব কার। মনে নেই—অর্জুনের কী অবস্থা হয়েছিল কৃষ্ণের দেহরক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে?—গাণ্ডীব তুলতে পর্যন্ত পারলেন না, তাতে টঙ্কার দেওয়া তো দূরের কথা।' ব'লে সতীর দিকে চেয়ে: 'তাই তো তোমাকে বলি শুধু এই একটি প্রার্থনা করতে—যা-ই আসুক না কেন, যেন তাঁর বিধান ব'লে অকুণ্ঠে বরণ ক'রে নিতে পারো।' ব'লে আমার দিকে চেয়ে: 'সেই গানটি গাও তো বাবা:

ওহে জীবনবল্লভ!
ওহে সাধনদুর্লভ!
তুমি নিজহাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লব!
এই জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব।'

অসিত বলল: "অরুণ তখনো শয্যাশায়ী—মাস দুই বাদের কথা বলছি। আমাদের সান্ধ্য নামকীর্তন ওর ঘরেই হ'ত রোজ। সেদিন রজতও ছিল। অরুণ খানিকটা সুস্থ হবার পর থেকে ও প্রায় রোজই যোগ দিত নামকীর্তনে। বাঁশির মতনই মিষ্টি ও সুরেলা ছিল ওর কণ্ঠস্বর। সতী মাঝে মাঝে বলত: 'মামাবাবু, রজতকে তোমার চেলা ক'রে নিতে হবে কিন্তু!' রজত আহত হ'য়ে রুখে উঠে বলত: 'ই-শ্‌! আমি শুধু গুরুজির চেলা—আর কারুর নই।' আমরা সবাই হাসতাম ওর মুখে এ-ধরণের জাঁকালো কথা শুনে। কিন্তু এম্‌নি ক'রে কিছুদিন যেতে না যেতে ওর মধ্যে হঠাৎ কী একটা ঢাকা যেন খুলে গেল। ও মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে বলতে আরম্ভ করল ও ঠাকুরকে দেখেছে—আজ বাঁশি বাজাচ্ছিলেন মা, আজ কী সুন্দর নাচছিলেন মা, আজ একটা নীল নদীতে স্নান করছিলেন মা—এম্‌নি কত কী! আমরা প্রথম প্রথম ওর কথায় কান দিই নি, ভাবতাম ছেলেমানুষের স্বপ্ন—আমাদের কাছে যা কিছু শোনে, স্বপ্নে দেখে। কিন্তু ক্রমশ অরুণের ওখানে নামকীর্তন গাইতে গাইতেও ও মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠত, বলত: 'ঠাকুর, ঠাকুর! ঐ যে হাসছেন, দেখতে পাচ্ছ না?' শুধু কৃষ্ণকেই নয়, কখনো বা দেখত শিব ঠাকুরকে—মাথায় জটা, কখনো বা মা দুর্গাকে সিংহের উপর দাঁড়িয়ে, কখনো বা চতুর্ভুজ মূর্তি। আমরা ভাবতাম

ছেলেমানুষি কল্পনা। কিন্তু একদিন আনন্দগিরি বললেন—কল্পনা নয়, ও সত্যিই দেখে। তবু আমার মনের সন্দেহ কাটেনি—পাঁচছয় বৎসরের শিশু দিনের পর দিন শিব দুর্গা নারায়ণ কৃষ্ণদর্শন—এ হয় কখনো? কিন্তু সেদিনকার কথা ভুলব না—কেন না মা ও ছেলে দুইজনেই দেখল একসঙ্গে—শুধু দেখা নয়—কিন্তু না, যেমন ঘটেছিল বলি।

"কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করতাম নামকীর্তনের সময় সতীর আবেশ মতন হ'ত। অরুণের অসুখের পর থেকে মনোদুঃখে এ-আবেশ আরো গাঢ় হ'য়ে উঠল। মাঝে মাঝে ও দেখত ঠাকুরকে—কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। সেদিন হঠাৎ ওর ভাবসমাধি কাটতে না কাটতে রজত ব'লে উঠল: 'মাগো! দেখলাম কী জানো? এইটুকু ঠাকুর—ঠিক আমার মতন মা—কিন্তু কী দৌড়চ্ছেন—আর পিছনে ছুটছেন তাঁর মা-ই হবেন—খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু মোটা—দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাচ্ছেন মা, কিন্তু ঠাকুরকে কিছুতেই ধরতে পারছেন না। খানিক বাদে ঠাকুর থমকে গেলেন, অমনি তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন'—ব'লেই খিল খিল করে হেসে—'কী মজার খেলা, না মা? একদিন তুমি আমাকে এই রকম বেঁধো তো।'

"সতী চমকে উঠল, বলল: সেও অবিকল ঐ একই দৃশ্য দেখেছে—যশোদার কৃষ্ণকে বাঁধা উদুখল দিয়ে। আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'তোমাকে কী বলেছিলাম প্রথমেই—মনে আছে? অরুণ সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল: 'কী গুরুদেব?' সতী হেসে বলল: 'কী আর? তোমার এই এক রত্তি ছেলে সামান্যি নয়—যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ—যাকে তোমরা মিডীভাল ব'লে দূর ছাই করো গো!' অরুণ বলল হেসে: 'আজকাল কিন্তু আর করি না—করি?' রজত বলল: 'না বাবা, আজকাল তুমি ভারি লক্ষ্মী হয়েছ।' অরুণ হেসে ওর গাল টিপে বলল: 'জানিস রজত, আমাদের শাস্ত্রে আছে যে ছেলে আমাদের পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করে—এর মানে কী তোর মাকে জিজ্ঞাসা করিস—আমি অত বকতে পারি না—তবে তোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার আশার বাড় বাড়ছে—কে জানে হয়ত কোন্‌দিন তুই বলবি: 'বাবা, ওঠো, তুমি একদম সেরে গেছ—হাঃ হাঃ হাঃ। কী বলিস্—বলতে পারবি না, যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ?'

"আমারা ওর হাসিতে যোগ দিতে না দিতে থেমে গেলেন আনন্দগিরি মুখ গম্ভীর দেখে। ওঁর শরীর যেন শিউরে উঠল— তারপরেই চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ।

"হঠাৎ আমার মনে হ'ল ঘরের মধ্যে হাওয়া যেন বদলে গেছে···কেমন এক থমথমে ভাব! আমরা একদৃষ্টে চেয়ে আছি আনন্দগিরির ধ্যানসুন্দর মুখের পানে, এমন সময়ে রজত চেঁচিয়ে উঠল: বাবা, দেখ দেখ! ছোট্ট ঠাকুর তোমার বাঁ

হাতে বাঁ কোমরে হাত বুলুচ্ছেন—ঐ যে! দেখতে পাচ্ছ না?' আনন্দগিরি ঠিক এই সময়ে চোখ মেলেই হাতজোড় ক'রে রইলেন—দু-চক্ষে ধারা! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। রজত একটু চেয়ে থেকে বলল: 'ঠাকুর হাসছেন আমার দিকে চেয়ে—মা গো, কী বলছেন যেন—না, থেমে গেলেন—শুধুই হাসছেন—কী মিষ্টি হাসি মা! বাবা, দেখতে পাচ্ছ না? তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন যে!' ব'লেই ঝুঁকে দুহাত বাড়াল, তার পরেই—'যাঃ ঠাকুর—হাওয়া আর নেই। আহা, বাবা! কী যে সুন্দর ছেলে—দেখতে পেলে না? দুয়ো!'

"আমরা চুপ ক'রে রইলাম। অরুণ হেসে বলল: 'কী পাগল ছেলে—কবি হবি বোধ হয় বড় হ'লে, না?' আনন্দগিরি বললেন গম্ভীর হ'য়ে: 'কবি নয় বাবা, যোগী। না না—ওর কল্পনা নয়। ঠাকুর তোমার বাঁ-দিকে সত্যিই হাত বুলুচ্ছিলেন। এবার তুমি সেরে উঠবে।' অরুণ চমকে উঠল: 'সেরে? সে কি?' আনন্দগিরি মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে গাঢ়কণ্ঠে বললেন: 'ঠাকুর কৃপা করেছেন বাবা! এসেছিলেন বর দিতে তোমাকে।'

"আমাদের দেহের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অরুণ ন'ড়ে বসল, বলল: 'এ কী! আমার বাঁ হাতে বাঁ পায়ে যেন সাড় ফিরে এসেছে মনে হচ্ছে!' ব'লে ডান হাত দিয়ে বাঁ কনুইয়ে চিমটি কেটে: 'তাইতো!' ব'লেই আনন্দগিরির হাত নিজের মাথায় উঠিয়ে সে কী কান্না!"

বার্বারা বিস্ফারিত নেত্রে বলল: "সত্যি সেরে গেল?"

অসিত বলল: "পুরোপুরি সারতে দিন পনেরো লেগেছিল, কিন্তু দুদিন পরেই আমাকে ধ'রে দাঁড়াতে পারল। তিন দিনের দিন চলতে পারল ঘরের মধ্যে—সতীকে ধ'রে।"

বার্বারা বলল: "বলেন কি দাদা? পক্ষাঘাত রোগী..."

অসিত বলল হেসে: "আর বলি কী?—তবে এর চেয়েও আশ্চর্য ভাবে—শুধু রোগ সারা নয়—আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচতে দেখেছি ওপারের যাত্রীকে।" ব'লে তপতীর দিকে চেয়ে: "বলব না কি?"

তপতী বলল: "ফের? না না—সে হবে না। আমার কথা থাক। তোমার গল্পটা শেষ করো।"

বার্বারা সাগ্রহে বলল: "কেন দিদি? আমি বিশ্বাস করব—কথা দিচ্ছি।"

তপতী বলল: "না ভাই, এখনো পারবে না। আমরা অনেক কিছু কল্পনায় পারব ভাবি, কিন্তু কাজের বেলা ঠেকে যাই। তবে কথা দিচ্ছি—যেদিন

আমাদের দেশে আমাদের আশ্রমে আসবে, সেদিন বলব। সে-কথা এ-দেশের পরিবেশে বলা চলে না।"

বার্বারা বলল: "পরিবেশ?"

তপতী বলল: "ফুলকে ঠিক দেখা হয় কখন? যখন তারা খোলা আকাশের নিচে গাছে ফুটে হাওয়ায় দোলে—না, যখন তাদের ফুলদানিতে ভিজিয়ে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে রাখো? সত্যি বলতে কি, সম্প্রতি আমার এমনও মনে হয়েছে যে, এদেশে এসে আমাদের সাধুসন্তদের প্রাণের কথাটি বলতে যাওয়া হয়ত পণ্ডশ্রম—এ দেশের আবহাওয়ায় তার ধ্বনি বেজে উঠতে না উঠতে রেশ যায় নিভে। তুমি কি ভাবতে পারো আনন্দগিরি তোমাদের কোন চার্চে কি ধর্মসভায় এসে সাশ্রুনেত্রে বর্ণনা করছেন—বালগোপাল কীভাবে অরুণের গায়ে হাত বুলিয়ে তার পক্ষাঘাত সারিয়ে দিয়েছিলেন?"

বার্বারা বলল: "তবে আমাকে কেন বললেন?"

তপতী ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: "সেকথা ফাঁস করব—যেদিন আমাদের আশ্রমে আসবে—গঙ্গাতীরে।"

ব'লে অসিতের দিকে চেয়ে: "এবার বাকিটুকু বলো দাদা—ঐ শোনো টং টং টং···বারোটা।"

অসিত বলল: "সেদিন রাতে আমার মনকে যেন নীরন্ধ্র আঁধার চেপে ধরল! সতীরও দর্শন হ'ল রহমতেরও মিলল পারের পারানি, রঞ্জত—একরত্তি ছেলে—তাকেও ঠাকুর দর্শন দিলেন, নাস্তিক অরুণ পর্যন্ত ঠাকুরের স্পর্শ পেয়ে সাধক হ'তে চলল—শুধু আমিই র'য়ে গেলাম একঘরে—উপবাসী? সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা স্বর উঠল ফুটে: 'তীরে ব'সে ঢেউ গোনার উপমা কি মনে পড়ে না যে? যে কিছুই ছাড়তে রাজি নয়—সে কি কোথাও কিছু পেতে পারে কখনো?' সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও ফের তুলল শিরপা: 'ছাড়ব কার জন্যে, কোন্ ভরসায়? যাবই বা কোথায়? দুমেলে—চার পাঁচশো গুরুভাইয়ের ভিড়ে—যাদের মধ্যে সাড়ে পনের আনাই অচেনা—যে-দুচার জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাদের গোঁড়ামির বাগাড়ম্বর দেখে মনে হয়—না চিনলেই ছিল ভালো!···তাছাড়া স্বয়মানন্দ স্বামীর সময়ই নেই কোনো শিষ্যের সঙ্গে দুচার মিনিটের বেশি কথাবার্তা কইবার—আমি কি আর তাঁর নাগাল পাব! সবার উপর, আশ্রমের দিকপালরা কি আমাকে টিঁকতে দেবেন যদি আমি গুরুদেবকে অবতার ব'লে মেনে নিতে না পারি? এমনি আবোল-তাবোল সে কত গুঞ্জনা কল্পনা. বিলাপ প্রলাপ! দিন সাতেকের মধ্যে মন যেন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল—নামকীর্তন ধ্যান জপ প্রার্থনা—

কিছুতেই মন বসে না—এমন কি, অমন যে গঙ্গা তাঁর পুণ্য সলিলেও যেন দেহ-মনের তাপ জুড়োতে চায় না।...এমনি ক'রে আরো তিন চারদিন কাটল! শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন গঙ্গাস্নানের পর ভোরবেলাই সাধুজির কাছে গিয়ে হাজির। বললাম: 'আমাকে একটু সময় দেবেন? একটু কথা আছে!'

"আনন্দগিরি হাসিমুখে বললেন: 'সে কি কথা বাবা! আমার তো সব সময়ই সময়। বোসো বোসো।'

"তাঁর স্নিগ্ধ সম্ভাষণে মন একটু ঠাণ্ডা হ'ল। বললাম: 'এত শত দেখে শুনেও যার সংশয় কাটে না, তার গতি কী হবে বলুন তো'?"

"আনন্দগিরি হাসলেন: 'বাবা, মনের ধর্মই হল সংশয়। ভাগবতে পড়োনি কি অক্রূরের কথা? তিনি ভক্তচূড়ামণি হ'য়েও কী ফাঁপরেই পড়েছিলেন বলো তো। কৃষ্ণবলরামকে নিয়ে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় আসছেন এমন সময় মাঝপথে যমুনা। তাঁদের রথে বসিয়ে অক্রূর যমুনায় ডুব দিয়েই দেখেন—কৃষ্ণবলরাম। অবাক লাগল: এ কি কাণ্ড? তবে কি তাঁরা রথে নেই? ব'লেই তাড়াতাড়ি রথে উঠে দেখেন তাঁরা ঠিক সেইভাবেই রথে ব'সে! এতেও তাঁর সংশয় গেল না, ভাবলেন: তবে কি জলের মধ্যে ভুল দেখলাম? ব'লে ফের ডুব দিতেই দেখলেন আদিদেব নারায়ণকে। রোমাঞ্চিত কলেবরে জল থেকে ফের উঠতেই কৃষ্ণঠাকুর ভালোমানুষের পো-র মতন মুখ ক'রে বললেন: পিতৃব্য, ব্যাপারখানা কী? আপনার কি ভাব, লেগে গেল নাকি? না, জলের মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখে এই অবস্থা? কিন্তু তখন অক্রূরের চৈতন্য হয়েছে, তাই বললেন মৃদু হেসে: ঠাকুর, জলে স্থলে আকাশে যিনি সব অদ্ভুতের উৎস, সেই আপনাকে দেখার পরে আর অদ্ভুত দেখার বাকি রইল কী?

'যত্রাদ্ভুতানি সর্বাণি ভূমৌ বা বিয়তি জলে
তং ত্বা নু পশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মেঽদৃষ্টমিহাদ্ভুতম্?'

"আমি করুণ হেসে বললাম: 'তবে আর আমার আশা কোথায় বলুন—যখন পরম ভাগবত অক্রূরেরি এই অবস্থা।'

"আনন্দগিরি বললেন: 'তোমার নিরাশাকে উস্কে দিতে এ-দৃষ্টান্ত দিইনি বাবা। বরং উল্টো: আমি বলতে চেয়েছিলাম—মনের রাজ্যে আমরা যতক্ষণ বাস করতে চাইব ততক্ষণ সংশয়, দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, অবিশ্বাস থাকবেই থাকবে—শুধু বিচার ক'রে ওকে নস্যাৎ করবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।,

"আমি বললাম : 'কিন্তু আর কোনো উপায়েও যে মনের এলাকা পেরুতে পারছি না সাধুজি ! অতএব—উপায় কী ?—নিরুপায় !"

"আনন্দগিরি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : 'না বাবা, উপায় আছে বৈ কি—নানা সাধক নানা উপায়ে, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে পৌঁচেছেন। তবে আমি শুধু একটি উপায়ের কথা বলতে পারি—যাকে জানি—সে হ'ল ভক্তি ! ঠাকুরকে ভালোবাসতে পারলে সব সংশয়ই কেটে যায়।'

"আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম : 'কিন্তু আমার কই কাটছে সাধুজি ? ভালো-বাসতে তো চাই—পারছি কই ?'

"আনন্দগিরি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন : 'নিশ্চয় পারবে বাবা, যদি সাধনা করো একান্ত মনে। তবে কি জানো ? সব পারা—কিনা সিদ্ধিই মেলে সাধনার শেষে, আগে তো নয় ! ভালোবাসা-প্রেম-ভক্তি-সাধনার বেলায়ও ঐ কথা। কোনো সাধনাই সহজ নয়—সহজ হবে শুধু প্রেমের সাধনা—যে-প্রেম দেবতাদেরও বাঞ্ছিত ? অতবড় সাধক যে চণ্ডীদাস তাঁকেও কি চোখের জলের সঙ্গে গাইতে হয়নি :

'পিরীতি পিরীতি সব জন কহে পিরীতি সহজ কথা !
বিরিখের ফল নহে তো পিরীতি—নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে, পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন লভিল যে-জন বড় ভাগ্যবান সে !'

ব'লে একটু থেমে : 'কিন্তু তুমি এত ভাবো কেন ?—যে এমন গান গাইতে পারে সে কেমন ক'রে বলে যে তাঁকে ভালোবাসতে পারেনি ?'

"আমি একটু অসহিষ্ণু মুখেই ব'লে বসলাম : 'ও সব সান্ত্বনা ঢের শুনেছি, সাধুজি। যতই দিন যাচ্ছে ততই যেন আমার হৃদয় শুকিয়ে আসছে—মনে হয় আজকাল—শুধু যে ঠাকুরকেই ভালোবাসিনি তাই নয়—কাউকেই বুঝি পারিনি ভালোবাসতে।'

"আনন্দগিরি বললেন : 'বৈরাগ্য যখন গভীর হ'তে থাকে তখন এম্‌নিই হয় সব সাধকেরই। এ-শুষ্কতাও কেটে যাবে ঐ ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতেই।'

"আমি বললাম : 'কিন্তু কবে—সাধুজি—কবে ? এত ডাকি দিনের পর দিন—তিনি যে একটুও সাড়া দেন না। আমর তো আজকাল প্রায়ই মনে হয়—ঠাকুর আমাকে একটুও চান না।'

"আনন্দগিরি আমার কাঁধে হাত রেখে কোমলকণ্ঠে বললেন : 'তিনি না চাইলে কি আ মরা তার দিকে এক পা-ও এগুতে পারতাম বাবা ? তিনি আমাদের নিরন্তর

চান, ডাকেন—আয় আয় আয়! আমরা যে তাঁকে চাই সে তো তাঁর এই চাওয়ারি প্রতিধ্বনি!'

"আমি বললাম: 'বুঝলাম। কিন্তু খতিয়ে দাঁড়ালো কী? না, শোনা কথা—সাধুর মুখেই হোক বা শাস্ত্রের শ্লোকেই হোক। কিন্তু জনশ্রুতিতে কি মন ভরে সাধুজি—চোখের দেখার কোঠায় উত্তীর্ণ হব কী ক'রে?

"আনন্দগিরি তেমনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন: 'এই ব্যাকুলতাকে লালন করতে করতে। ব্যাকুলতা হ'ল আলোর সেই অশ্রান্ত ঢেউ—যার ঘায়ে অন্ধকারের বাঁধ একদিন না একদিন ধ্বসে পড়েই পড়ে।'

"আমি বললাম: 'শুধু ব্যাকুলতা ঢেউয়ে? আমার তো আজকাল প্রায়ই মনে হয় যে 'শুধু উচ্ছ্বাসে তাঁকে মিলতে পারে না। ব্যাকুলতা তো উচ্ছ্বাস বৈ আর কিছুই নয়—ভাববিলাস।'

"আনন্দগিরি বললেন: 'না বাবা! সত্যিকার ব্যাকুলতা হ'ল শূন্যতার টান—যেমন গুমট টেনে আনে ঝড়কে, তাপ বৃষ্টিকে। শোনো তবে বলি আমার জীবনের একটি পরম দিনের কাহিনী: এতদিন একথা বলিনি—কারণ ব্যাকুলতা যার নিবিড় হয়নি সে বুঝতে পারে না ব্যাকুলতার মর্ম। তোমার সময় এসেছে তাই বলছি।'

'গুরুদেবের কাছে ফিরে এসে দশ বৎসর সাধনার পরে মন কেমন যেন শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল—ঠিক যেমন তোমার হয়েছে। চোখে-দেখার কথা বলছিলে না বাবা? আমি তোমাকে বলছি যে, চাক্ষুষ করলেই কিছু বস্তুলাভ হয় না। অবশ্য আমি সে-পরম দর্শনের কথা বলছি না যার অন্য নাম মিলনমুক্তি। কিন্তু সাধকেরা অনেক সময় অনেক কিছুই দেখেন সাধনার পথে—মূর্তি, আলো, নানা স্বর্গীয় দৃশ্য—কিন্তু এসব আসতেও যেমন যেতেও তেমনি—আর চ'লে যেতে না যেতে সাধক যে-তিমিরে সেই তিমিরে। এসব ক্ষণদর্শনের উপমা দেওয়া যায় বিদ্যুৎঝলকের সঙ্গে! যখন আসে—কী উল্লাস! মনে হয় বুঝি আর ঝাপসা কিছুই রইল না! কিন্তু তারপর যেই বিদ্যুৎ নিভে যায়—অম্‌নি অন্ধকার আসে যেন আরো নীরন্ধ্র হ'য়ে—ফলে মনে হয়—যেন যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাও গেছে ঢেকে! যখন সাধক সেই শূন্যতার, শুষ্কতার, অন্ধতার অন্ধকূপে পড়ে তখন তার মন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়, আটুবাটু করে—দমবন্ধ হ'য়ে আসে যেন। এ-অবস্থার মধ্যে দিয়ে সব সাধককেই যেতে হয় একদিন-না-একদিন—মরু পার না হ'লে সরোবরের দেখা মেলে না! এই দারুণ অবস্থাকেই খৃষ্টান সাধকেরা নাম দিয়েছেন dark night of the soul: এ-অবস্থায় একদিকে যেমন সংসারের,

ইন্দ্রিয়সুখের রসকষ শুকিয়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি যা কিছু দেখেছি শুনেছি সে-সবের স্মৃতিও আসে ঝাপসা হ'য়ে—আর মনে হ'তে থাকে বুঝি কিছুই পাইনি—শুধু একটা মিথ্যা আত্মবঞ্চনাকে আঁকড়ে ছিলাম এতদিন। কিন্তু মজা এই যে, এ-দারুণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়রা যোগবিমুখ হ'লেও ভোগের চিন্তায় বেশ একটু রস পায়—তাই হায় হায় করে : যা ছিল সব হারালাম অথচ যা পাব ভেবেছিলাম তা পেলাম না। গীতায় একটি শ্লোকে ঠাকুর সাধনার এই অবস্থার কথা বলেছেন আভাষে :

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জগতের হাজারো ছোটবড় সুখভোগ থেকে ইন্দ্রিয়দের নিবৃত্ত ক'রে উপবাসী রাখা যায় বটে, কিন্তু তবু তৃষ্ণা থাকেই সেসব খেদিয়ে-দেওয়া ভোগের। এই তৃষ্ণার জ্বালা নেভে কেবল—যখন মেলে তাঁর পরম দর্শন, অন্তিম মিলন। উপনিষদেও এই কথাই বলেছে অন্যভাবে—যে, হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় ও সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হয় তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে—কিনা যখন তিনি দর্শন দেন চিরদিনের জন্যে।

'কিন্তু হাজার কেন এসব কথা নিয়ে বিচার করো না, শুধু বিতর্কে বস্তুলাভ হয় না। তার জন্যে চাই সাধনা। শ্রবণের পর মনন, তারপরে নিদিধ্যাসন—কি না যা শুনেছি বুঝেছি তাকে ধারণা করা, উপলব্ধির জারকে আত্মসাৎ করা। কিন্তু এর জন্যে চাই—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—রোখ—প্রবল রোখ যে, ভগবানের পথে যা-ই কেন না আসুক বাধা হ'য়ে, তাকে নির্মম হ'য়ে ত্যাগ করব। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা দানা বাঁধার পথেও আবার হাজারো অন্তরায় : নির্ভরসা, অবিশ্বাস, কুতর্ক, গড়িমসি, সন্দেহ, ক্লান্তি, শুষ্কতা—কত কী! সময়ে সময়ে এদের কোন-না-কোন চর বাধা হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়ায়ই দাঁড়ায় পাষাণ-প্রাচীর হ'য়ে—মনে হয় পেরুনো অসম্ভব। তখন কী হয়? না, আসে নিঃসহায় ব্যাকুলতা—ঠাকুর! দাও দাও, আমি পারছিনে আর! একমাত্র এই ব্যাকুলতার বানের মুখেই যত বাধার বাঁধ যায় ভেসে। কিন্তু প্রথম দিকে এ-ব্যাকুলতা আসে শূন্যতারই ছদ্মবেশে। আমারো এল : কী ভাবে বলি শোনো। আহা, ঠাকুর আমার কত লীলাই জানেন!'

"আনন্দগিরির চোখ চিকচিক ক'রে উঠল :

'গুরুদেব দেহরক্ষা করলেন আমার পূর্ণ সন্ন্যাস নেওয়ার ঠিক এগারো বৎসর পরে। যাবার সময় ব'লে গেলেন : তোমার সুদিন আসন্ন, কেবল নাম

ছেড়ো না, সব পাবে যদি নামকল্পতরুর কাছে চাইতে পারো ভক্তিফল। ব্যস্, আর একটি কথাও নয়।

'কিন্তু তাঁর ভরসা পেয়েও পড়লাম আমি অকূল পাথারে! আমার সুদিন আসন্ন? অশ্বডিম্ব! চারিদিকে তো শুধুই অন্ধকার! এক সম্বল—নাম। কিন্তু গুরুদেবের দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে শোকে এমনই হ'ল যে নামও হ'য়ে উঠল বিষ। ফের সংশয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠল: পরম সম্বল হারিয়ে যন্ত্রবৎ এইভাবে শুষ্ক নাম জপ ক'রে লুটব সুধাসিন্ধু—এ কখনো হয়? তবু প্রাণপণে জপ করতে লাগলাম—কিন্তু যতই জপ করি ততই চারিদিকে নিরাশা কালো ঢেউ তুলে আসে। সে যে কী গভীর অবসাদ বাবা, কী বলব? সংসারের দুঃখকষ্ট যতই কেন না দারুণ হোক—এ-ধরণের নিরাশা আনে না—কারণ সংসারে একটা খুঁটি গেলেও আর পাঁচটা থাকে যাকে ধ'রে দাঁড়ানো যায়। কিন্তু ধর্মের পথে যখন অবসাদ আসে—মনে হয় বাঁচার মতন বিড়ম্বনা বুঝি আর কিছুই নেই—কেননা তখন সাধক একেবারে নিরবলম্ব।

'এমনি নির্ভরসার অমাবস্যায় এল আমার জন্মদিন। মনে অমাবস্যা কিন্তু আকাশে রাসপূর্ণিমা। মনে হ'ল এমন শুভদিনে যার জন্ম তার অদৃষ্টে কিনা রাহুই হ'য়ে উঠল সর্বেসর্বা? সারাদিন শুষ্কমনে নাম জপ করলাম। সূর্য অস্ত গেল, একটি দুটি তারা···পরে আকাশে চাঁদ উঠল সোনার থালা হ'য়ে। কী অপরূপ সে-ছবি—গঙ্গায় পড়েছে তার কিরণের আশীর্বাদ আর নীলাঞ্চলা চলেছেন গান গেয়ে অকূল-অভিসারে! কিন্তু আমার মনে হ'তে থাকে—সবই পরিহাস—জীবন পরিহাস, সংসার পরিহাস, সূর্যের আলো, চাঁদের কিরণ, তারার দ্যুতি, ফুলের হাসি, বনের শ্যামলতা, বুকের নিশ্বাস, আশার আনন্দ—কিছুই কিছু নয়—শুধু যে এজীবনে কিছু নেই তাই নয়, এর পরেও কিছু নেই—এক নিস্তরঙ্গ নাস্তির হাহাকার! গভীর রাতে বুকের মধ্যে সে কী যন্ত্রণা! আর পারি না ঠাকুর! না হল ভক্তি, না হল জ্ঞান—এমন কি নামে রুচি ছিল শেষ সম্বল, তাও কেড়ে নিলে তুমি! হঠাৎ মনে হ'ল—কী বিড়ম্বনা—এক পাষাণ বিগ্রহকে ডাকছি ঠাকুর ব'লে! কোথায় ঠাকুর! কেউ কোথাও নেই—তবে আর কি? এ-জীবনের শেষ হোক্—একতাল মাটির বুকে জেগে উঠেছিল যে-ক্ষণিক চেতনা, সে মিশে যাক মাটিতেই। বলতেই হৃদয়ে জেগে উঠল প্রেমের জোয়ার? কেউ কোথাও নেই! তবে কোথা জাগল এই অনাদি অশেষ আনন্দের মেলা? কে বুকে বুনে দিল ঠাকুরের নাম? সব ছাপিয়ে জেগে উঠল গুরুদেবের স্নিগ্ধ দৃষ্টি! অমনি আমার চোখে

নামল শ্রাবণের ধারা! বললাম: 'না ঠাকুর, তুমি আছ আছ আছ। বাইরের সব কিছুই তোমাকে অস্বীকার করুক—কিন্তু আমার অন্তর জানে—তুমি আছ। তোমাকে এ-জীবনে পেলাম না, তবু তুমি আছ, তুমি আছ ব'লেই বিশ্বভুবন আছে। তাই আমাকে গ্রহণ করো ঠাকুর—আমি আজ গঙ্গায় এ-জীবন বিসর্জন দেব! জীবনে তুমি এসে না, কিন্তু মরণে ফাঁকি দিও না, মনে রেখো—তুমি গীতায় কথা দিয়েছ যে, অন্তিম দিনে এপারে যে যা চাইবে ওপারে সে তাই পাবে। আমি চাই শুধু একটি আশ্রয়—তোমার রাঙা চরণ!

'ব'লে বাইরে এসে গঙ্গার ঘাটে এসে নামতে জলে পা দিতে যাব এমন সময়ে দেখি সেখানে একটি জলপদ্ম! ভাবলাম আশ্চর্য হ'য়ে: হরিদ্বারের গঙ্গার খরস্রোতে জলপদ্ম, তা আবার স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে—এ কী ব্যাপার! একটু স'রে ফের জলে নামতে যাব—অমনি সেখানেও পায়ের কাছে ফের একটি জলপদ্ম! আমি অবাক হ'য়ে সামনের দিকে তাকাতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, দেখি—রাশি রাশি জলপদ্ম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বৃত্তাকারে—আর মাঝের পদ্মটির উপর, দাঁড়িয়ে স্বয়ং ঠাকুর—কিশোর কৃষ্ণ—ত্রিভঙ্গ সুঠাম—হাতে বাঁশি।

"আমি শিউরে উঠলাম: 'ঠাকুর!!'

"আনন্দগিরির শরীরও কেঁপে উঠল: 'শুধু ঠাকুর না বাবা, তাঁর পাশে দেখতে দেখতে ফুটে উঠলেন কৃষ্ণময়ী সর্বকান্তি শ্রীরাধা, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদ্মে ফুটে উঠল এক একটি গোপীমূর্তি। অসহ আনন্দে বিস্ময়ে অন্তর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল, মনে হ'ল যেন আমার দেহের প্রতি অণু বর পেয়েছে দিব্যদৃষ্টির, প্রতি রক্তবিন্দু কান পেতে শুনছে ঠাকুরের বাঁশির আয় আয় ডাক। আর যেই এই ডাক বেজে উঠল—বৃত্তাকারে ভাসমান পদ্মগুলি নাচতে নাচতে এক হয়ে মিশে গিয়ে রচনা করল একটি যেন পদ্মদ্বীপ—যুগলমূর্তিকে বেড়ে শুরু হল গোপীদের রাসনৃত্য—আকাশে চাঁদ ও সূর্যের নয়নতলে। সে যে কী অপরূপ নূপুর-ঝঙ্কার বাবা, কী বলব···সমস্ত সৃষ্টি যেন গ'লে গেল সে-ঝঙ্কারে···সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম অগণ্য গোপীকণ্ঠের অপার্থিব কীর্তন:

নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

"আমার বুকের রক্ত উচ্ছল হ'য়ে উঠল, বললাম: 'তারপর?'

"আনন্দগিরি উদ্ভাসিত মুখে বললেন: 'তারপর আর কী! সেদিন থেকে আর ঠাকুর আমাকে ছেড়ে যান নি—মুহূর্তের জন্যেও!'

"আমার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে এল, বললাম: 'তাঁকে সর্বদাই দেখতে পান?'

"আনন্দগিরি হেসে বললেন: 'শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয় বাবা, প্রতিরোম দিয়ে দেখি। সে যে কী প্রাপ্তি—ভাষায় কেমন ক'রে বোঝাবো? ভাষা প্রকাশ করে এক একটি চরণের এক একটি ভাব—কিন্তু যাকে প্রকাশ করে তার উপর আলো পড়তে না পড়তে যা না-বলা রইল তার উপরে পড়ে ছায়া। শুধু কি তাই? আমাদের ইন্দ্রিয় মন দিয়ে আমরা যা-ই কেন না পাই, তার যেমন আরম্ভ আছে তেমনি আছে শেষ। কিন্তু তাঁর রূপ, তাঁর রস, তাঁর মাধুরী নাগাল পাবে কে বলো—সে-নির্দিশার দিশা পেয়েছিলেন এক শ্রীরাধা, ব'লেই ধ'রে দিলেন:

'জনম অবধি হাম ও-রূপ নিহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন ন গেল!'

অসিত বলল: "উপনিষদে পড়েছিলাম ভগবানের পথ দুর্গম। কিন্তু এসব বচন বইয়ে প'ড়ে একরকম মনে হয়, আবার সাধুর মুখে শুনলে মনে হয় আর একরকম। আনন্দগিরির মুখ থেকে তাঁর অন্তরঙ্গ সাধনার ইতিহাস শুনতে শুনতে আমার কী হ'ল ব'লে বোঝাতে পারব না—তাই কেবল এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হই যে, আমার যেন চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা স'রে গেল।

"কিন্তু এসব শোনার আনন্দের উল্টোপিঠেই থাকে বিষাদ, ভরসার সঙ্গে সঙ্গেই নিরাশা। তাই এর পর থেকে একদিকে যেমন কেবলই মনে প্রশ্ন জাগে—কবে আমার এমন অবস্থা হবে—কবে আমি শুধু কণ্ঠের তানে নয়, উপলব্ধির গভীর গমকে গাইতে পারব—ঠাকুর আমার চোখের আলো, গলার হার, প্রাণের ধন, বুকের নিশ্বাস—তেমনি অন্য দিকে মনে হ'তে থাকে—এসব হয়ত আমার থেকেই যাবে অধরা স্বপন। সে-সব খুঁটিয়ে বলার দরকার নেই, তাছাড়া হাজার বললেও

বোঝাতে পারব না। তাই সে-চেষ্টা রেখে বলি আমার জীবনের এ-পরম পাওয়ার অধ্যায়ের শেষটুকু।'

"অরুণ সেরে উঠবার পরে একেবারে অন্য মানুষ। চাকরি তো ছেড়ে দিলই, নিয়মিত জপ ধ্যান শুরু করল। দেখতে দেখতে তার মুখের চেহারাই যেন বদ্‌লে গেল। সময়ে সময়ে সতী আমাকে নিরালায় বলত: 'দেখ মামাবাবু, একটিবার শুধু চোখ চেয়ে দেখ। অবসাদের পাতাল থেকে সাধু মহাপুরুষ ছাড়া আর কেউ কি ছন্নছাড়া মানুষকে তুলতে পারে আনন্দের শিখরে? সংসারী মানুষ বড় গলা ক'রে বলে—তারা মানুষের কতই উপকার করে, কত হাসপাতাল ডাক্তারখানা রাস্তাঘাট ধুমধাম লোকলস্করের শোভাযাত্রা! কিন্তু আমাদের অন্তরের তৃষ্ণা কি মেটে এসবে? সাধু মহাপুরুষ ছাড়া আর কেউ কি পারে আমাদের স্বভাব বদ্‌লে দিতে?—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে কি—কোন্ পথে পারের পারানি জুটবে—মিলবে সেই পরম লাভ যার পরে আর কোনো লাভকেই লাভ মনে হয় না?'

"কিন্তু এসব যত শুনি ততই আমার আশাকে নামঞ্জুর করে এক গভীরায়মান নিরাশা, আনন্দ হ'য়ে দাঁড়ায় নিরানন্দ।

"সবাই চলল পাওয়ার পথে এগিয়ে—শুধু আমিই রইলাম পেছিয়ে দোমনার দোটানায়? এক একবার মনে হয়—যাই চ'লে তুমেলে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আসে সে যে কী বিপর্যয় ভয়: যদি সেখানে কিছু না পাই? যদি সব ছেড়ে সেখানে গিয়ে শেষে পরিতাপই হ'য়ে ওঠে কণ্ঠমালা—বস্তুলাভ না হয়? যদি…যদি…যদি …আগুপাছু ভাবনা…সংসারের শাসানি…হাজারো বিজ্ঞ যুক্তির মানা।

"কিছুদিন বাদে সবে-জাগা ভরসা ফের বিদায় নিল—আনন্দের লেশও রইল না! গান করতেও ভালো লাগে না—মনে হয় বুকের মধ্যে আবেগের উৎস গেছে শুকিয়ে…এমন কি সৎকথা শুনতেও ইচ্ছা করে না—মনে হয়: কথা কথা কথা…শেষে এমন হ'ল যে, কারুর প্রতি স্নেহের টান পর্যন্ত বোধ করতে পারি না—মনে হয় সবাই পর। অথচ ভগবানকে আপন জানার আভাসও আর পাইনে। প্রার্থনাও জাগে না বুকে, জলও আসে না চোখে, ভরসাও পাই না প্রাণে। সব অন্ধকার। নিটোল তামসিক অবস্থা। শেষে একদিন রাত দশটার সময় আর থাকতে পারলাম না—বুকের মধ্যে সে কী অসহ্য কষ্ট!—আনন্দগিরির কাছে গিয়ে ফের ধর্না দিলাম, বললাম: 'সাধুজি, দুঃখে আমার আপত্তি নেই, কারণ দুঃখ বিনা ভগবানকে কে পেয়েছে? কিন্তু ভয় হয়—শেষটায় কি বিশ্বাসও হারিয়ে ফেলব?'

"আনন্দগিরি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে—কোনো কথা নেই। আমি আর পারলাম না, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর পায়ে মাথা রেখে বললাম: 'আমাকে সোজাসুজি বলুন কী করতে হবে—আমি নিজের ভার আর বইতে পারছি না।'

"তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: 'সোজাসুজি বলতে তো আমি পারি বাবা—অনেক দিন আগেই পারতাম। কিন্তু তুমি শুনলে তবে তো!'

"আমাকে কে যেন চাবুক মারল। আমি বললাম: 'আমি শুনব—কথা দিচ্ছি। বলুন আপনি—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।'

"আনন্দগিরি শান্ত কণ্ঠে বললেন: 'তুমি কালই রওনা হও দুমেল—তোমার গুরুর শরণ নাও।'

"আমি ঠিক এই ভয়ই করেছিলাম। বললাম শুষ্ককণ্ঠে: 'কিন্তু যদি না পারি সেখানে টি'কতে? শুনুন, সাধুজি! আপনি আপনার গুরুদেবের কাছে অনেক কিছু পেয়েছিলেন প্রথমে যেতেই। কিন্তু আমি স্বয়মানন্দ স্বামীর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেও—যখন নিজের অন্তরে খোঁজ করি দেখি যে, সত্যি কিছুই পাই নি তাঁর কাছ থেকে। পাবার মধ্যে শুধু পেয়েছি দ্বন্দ্বের তাপ, সংশয়ের অন্ধকার, সবকিছুতে বিতৃষ্ণা। কিন্তু একে তো লাভ বলে না—তাই ভয় করে। যদি কিছু হাতে পাই—যাকে লাভ ব'লে চিনতে পারি—তাহ'লে সব ছাড়তে আমি রাজি। কিন্তু কিছুই পেলাম না পাবার ম'ত—অথচ যা আছে সব খুইয়ে বসব, এ কেমন কথা?

"আনন্দগিরির মুখে কেমন যেন একরকমের হাসি ফুটে উঠল, বললেন: 'বাবা, এ-পথে পাওয়া যায় না। কারণ এর নাম দরদস্তুর করা: আমি ত্যাগের দাম দেব, তুমি প্রাপ্তির মাল সরবরাহ করো—যেন একটা বোঝাপড়ার ভাব—চুক্তির বন্দোবস্ত। আর এই-যে দরদস্তুর এ বড় কুশ্রী—সংসারীদের দরদস্তুরের চেয়েও খারাপ। কারণ তাদের মূলমন্ত্র—আমি ও আমার, সাধকের জপমন্ত্র—তুমি ও তোমার। তাই এ-পথের প্রধান পাথেয় সঞ্চয় নয়—ত্যাগ: যে-ছাড়তে ভয় পায় সে-দুর্ভাগা পায় না কিছুই! যে জমায় সে-ই হারায়। আজ প্রথম আমার মনে একটু দুঃখ হয়েছে বাবা! অমল, শ্যামঠাকুর, সতী কেউই দরদস্তুর করেন নি—এমন কি অরুণ যে অরুণ—সেও না। কেবল তুমি বাবা, এত জেনে-শুনে, এত বুঝেসুঝেও শেষে কিনা…' তিনি কথাটা অসমাপ্ত রেখেই হঠাৎ উঠে চ'লে গেলেন।

"আমার মনে সত্যি কান্না জেগে উঠল: 'ধরণী! দ্বিধা হও।' এলাম নিজের ঘরে। তখন রাত এগারটা। মহাষ্টমীর চাঁদের আলো পড়েছে গঙ্গাজলে।

চারিদিকে নিস্তব্ধ··কেবল সতীর ঘর থেকে ভেসে আসছে গুন্‌গুনিয়ে ওর মন্ত্র-জপ —ধূপের গন্ধের সঙ্গে।

"হঠাৎ আমি ভেঙে পড়লাম শিশুর মতন। বালিশে মুখ লুকিয়ে সে কী কান্না! অমন কান্না আমি জীবনে কোনোদিন কাঁদি নি: মুখে বড় বড় কথা ব'লে আমি কিনা ভগবানের সঙ্গে এত দিন শুধু দরদস্তুর ক'রে এসেছি দরদস্তুর··· দরদস্তুর···দরদস্তুর।

"এই চোখের জলের মধ্যে দিয়েই পেলাম শক্তি। সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব যেন মুহূর্তে ঘুচে গেল। আমি সেই নিশুত রাতে কাগজ কলম নিয়ে গুরুদেবকে লিখলাম দুমেলে: আমি সব ছাড়ব, আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে আপনার পায়ে সমর্পণ করলাম—আমাকে নিঃস্ব হ'তেই হবে—কেবল এ-নিঃসম্বলকে ঠাই দিন আপনার চরণে। যদি আমাকে গ্রহণ না করেন—গঙ্গাজলে আমার দেহ বিসর্জন দেব।'

"দুদিন বাদে তাঁর তার এল: তুমি আসতে পারো—স্বাগতম্! আশীর্বাদ।"

বার্বারার চোখে জল চিকচিক ক'রে উঠল, বলল: "তারপর?"

অসিত বলল: "তারপর সে যে কী হ'ল—ব'লে বোঝাতে পারব না। এ-পর্যন্ত যত অঘটন—মিরাক্ল—দেখেছি সবই মনে হ'ল নগণ্য তারপর যা ঘটল তার কাছে। যেখানে ছিল যুগের আঁধার—গ'লে গিয়ে হ'ল আলোর পাথার ···যেখানে ছিল অশান্তির মেঘ—দেখা দিল শান্তির নীলিমা...আর সবার উপরে আশা আনন্দের শিহরণ শুধু জাগ্রত অবস্থায়ই নয়, স্বপ্নের মাঝেও—যে আমি নিঃস্ব, নিঃস্ব, নিঃস্ব!

"সতীকে গুরুদেবের তার দেখিয়ে সব বললাম। এ-দুদিন আমি ঘর থেকে বেরুই নি বললেই হয়, সন্ধ্যায় নামকীর্তনে পর্যন্ত যোগ দেই নি। কেউ আমাকে ডাকে নি—শুধু সতী সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় আমার ঘরে আমার খাবার দিয়ে যেত কোনো কথা না ব'লে। পরে শুনলাম আনন্দগিরি সবাইকে ব'লে দিয়েছিলেন আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করতে। সতীকে বলেছিলেন চুপি চুপি: 'অগ্নিপরীক্ষা যাচ্ছে মা—আগুনের মধ্যে দিয়ে না গেলে কেউ কি শুদ্ধ হয়?'

"সতী আমার মুখে সব শুনে ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেলল, আমাকে প্রণাম ক'রে বলল: 'তুমি যাও মামাবাবু। গুরুচরণে শরণ নিয়ে সার্থক হও। তুমি জানো না তুমি আমার কত বড় ভরসা।' ব'লে একটু থেমে: 'মামাবাবু! একটা কথা আজ বলি—যা মুখ ফুটে বলি নি কোনোদিন। এক দিক দিয়ে বলতে গেলেই তুমিই আমার আদি গুরু—কেন না আমার মনকে ভগবানের

দিকে প্রথম টানো তুমিই—যেমন গুরুদেবের মনকে টেনেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু এরও পরে আর একটু পুনশ্চ আছে। আমরা সবাই চলেছি সেই একই মোহানার পানে—আমাদের পরস্পরের টান হোক সেই টানেরই অনুবাদ—তাহ'লেই আমরা থাকব পরস্পরের অন্তরঙ্গ। মামাবাবু, কী বলব তোমাকে? তোমাকে ছেড়ে দিতে আনন্দে আমার চোখে জল আসছে—এই তো আমরা আশা করেছিলাম তোমার কাছে।'

"আনন্দগিরির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "এই তো চাই বাবা! এই হ'ল পাওয়ার মন্ত্র। শুধু দেওয়া শুধু দেওয়া —কিছু চেয়ো না ঠাকুরের কাছে কি গুরুর কাছে—শুধু শরণ ছাড়া।

"রহমৎ আমাকে সতীর মোটরে নিয়ে রওনা হ'ল ড্রমেলে পৌঁছে দিতে। সারাটা পথ কেবলই চোখ ফেটে ঝরে আনন্দাশ্রু। সে যে কী পুলক…একটি গানের চরণ কেবলই ফিরে ফিরে মনে পড়ে: 'স্বর্গ নামিয়া আসিল মর্ত্যে স্বর্গে উঠিল ধরণী!' সে-পুলক, সে-শিহরণ, সে-অনুভূতি বলবার কাহিনী নয়—শুধু জপবার স্মৃতি। আর একটি কথা শুধু বলা বাকি।

"সারা রাস্তা মনে হ'তে লাগল আমি যেন এক নেশার রাজ্যের বাসিন্দা… সামনে যা কিছু দেখি যা কিছু শুনি—সবই সে রাজ্যের আলোর পাশে, ধ্বনির পাশে ছায়াভ, স্তিমিত মনে হয়। মনে যেন বিশ্বাস হয় না যে এত আনন্দ আমি ধারণ করতে পারি…চোখের জলের সঙ্গতে গাই বিদ্যাপতির গানটি আমার এ-বিচিত্র অনুভবের সুরে মিলিয়ে:

কী পুছসি অনুভব মোয়?
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে—তিলে তিলে নৌতুন হোয়!

"খানিক বাদে—ও কি? স্পষ্ট শুনলাম আমার বুকের মধ্যে একটি স্বর: 'আচ্ছা বল্ তো—এই যে আনন্দ—যদি তোর কোন অন্তরঙ্গকে বোঝাতে হয় তবে কী ব'লে বোঝাবি? সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য—আর একটি স্বর—অথচ এ-দুটিই আমার নিজেরই স্বর—প্রতি-প্রশ্ন করল: 'তুই আগে বল্ এই যে জগতে আমরা জন্মেছি—এখানে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় কী? উত্তরে প্রথম স্বর বলল: 'আলো আর হাওয়া।' দ্বিতীয় স্বর পিঠপিঠ বলল: 'তবে শোন্। আমার এ আনন্দ কেমন জানিস? যদি আমরণ কেউ আমাকে ভূগর্ভে একটি অন্ধকার ঘরে বন্দী ক'রে রাখে তাহ'লেও আমি বে-পরোয়া।'

"কোথাও পড়িনি এ-উপমা। কেবল সর্বাঙ্গ আমার রোমাঞ্চিত হ'য়ে

উঠল মুক্তির এই পূর্বরাগে—গান উঠল জেগে…'আর কেন বঁধু, লহ লহ তবে এ-জীবন বলিদান।'

দুদিন পরে তপতী অসিতের হাতে একটি চিঠি দিয়ে চোখ মুছল। অসিত ওর দিকে আশ্চর্য হ'য়ে তাকালো।

তপতী বলল: "পড়ো।"

দুজনে পড়ল একসঙ্গে:

"দাদা,

জাহাজ থেকে লিখছি—ইংলণ্ড হ'য়ে রোম—রোমের কনভেণ্টের ঠিকানায় যেন আর একটিবার দেখা পাই।

আপনাকে শুধু একটি কথা বলব আজ মনে মনে প্রণাম ক'রে: আমি কৃষ্ণ ও খৃষ্টকে অভিন্ন ব'লে বিশ্বাস করি। কিন্তু এ যথেষ্ট নয়! চাই আপনার আশীর্বাদ যেন এ সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। আর যেদিন উপলব্ধি করব—যাব আপনাদের পুণ্যভূমির ধন্য মাটিতে যেখানে ধর্মের ফসল আজও জীবন্ত, আমাদের দেশের মতন নিভন্ত নয়। আমার মন বলে—আপনাদের দেশ এই জন্যেই আজো বেঁচে আছে—সারা জগতে অন্তরাত্মার এক নবজাগরণ আনতে। যদি কোনোদিন আপনাদের দেশে যাই—যাব শুধু এই লোভেই আপনাদের কৃষ্ণাশ্রমে। সেখানে আমার 'নির্দিষ্ট' গুরু কে হবে বলুন তো? যদি না পারেন, তবে দিদিকে জিজ্ঞাসা করবেন—তিনি টের পেয়েছেন।

ইতি—

আপনার

স্নেহকৃতজ্ঞ

ছোট বোন

বার্বারা।"

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২৫	এই বলেছিলেন	কাল বলছিলেন
২০	২৮	নিজে	যে-বস্তু নিজে
২৬	উনশেষ	ভাবগত	ভাগবত
৩০	২৮	পায়ে দীন এ ঠিক	পা দিয়ে দীন এ কি ঠিক
৪৬	৪	কর্তে	ব'র্তে
৫০	১	উঠল	শুনল
৫৩	৫	এর	এর পরে
৬০	৬	এখন	এখন কথা
৬৬	২	ওই	এই
৯৮	শেষের দিকে	কারণ আমার মনে এ-প্রশ্ন উঠেছে।	কারণ তৃষ্ণা
১৩৮	২৪	তবু	শুধু
১৫৯	১৬	শিষ্য বাধলে	শিষ্য হয়ে বাধবে,
১৭৪	২৬	বরধূম্	বরবধূম্

মুদ্রাপ্রমাদকে শুদ্ধিপত্র দিয়ে কিছুটা শোধন করা বাঞ্ছনীয়—যদিও সচরাচর কেউই বড় একটা শুদ্ধিপত্রের দিকে তাকান না। এ-গুলি ছাড়া মুদ্রাপ্রমাদ আরো আছে তবে সেগুলি পাঠক নিজে সহজেই ছাপার ভুল ব'লে চিনতে পারবেন।